# জীবাণুতত্ত্ব

**এবনে গোলাম সামাদ**
পি. জি. ডিপ. (লিডস), ইংলন্ড;
ডক্টর দ্য ল্যুনিভার্সিতে (পোয়াতিয়ে), ফ্রান্স;
অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৯২
অক্টোবর, ১৯৮৫

---

JIBANUTATTVA (Elementary microbiology in Bengali) by Dr. Ibne Gholam Samad. Published by Bangla Academy, Dhaka, Second edition October 1985. Price taka 60·00.

# সূচীপত্র


| বিষয় | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| প্রথম | অধ্যায় ঃ | জীবাণুতত্ত্বের উপজীব্য ... | ১ |
| দ্বিতীয় | ,, | নীল-সবুজ শৈবাল ও ব্যাকটিরিয়া ... | ৬ |
| তৃতীয় | ,, | শৈবাল ... | ১০ |
| চতুর্থ | ,, | প্রকৃত ব্যাকটিরিয়া ... | ১৪ |
| পঞ্চম | ,, | ব্যাকটিরিয়ার প্রজনন, অস্তিত্ব রক্ষা ও মৃত্যু ... | ১৯ |
| ষষ্ঠ | ,, | ব্যাকটিরিয়ার যৌন-প্রজনন ... | ২৪ |
| সপ্তম | ,, | ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধিতে পরিবেশের প্রভাব ... | ২৮ |
| অষ্টম | ,, | জীবাণু নিধন ও অপসারণের উপায় ... | ৩৩ |
| নবম | ,, | অনুসন্ধান প্রণালী ... | ৪০ |
| দশম | ,, | ব্যাকটিরিয়ার পুষ্টি ... | ৫১ |
| একাদশ | ,, | ব্যাকটিরিয়ার শ্রেণীবিন্ধন ... | ৫৮ |
| দ্বাদশ | ,, | এনজাইম বা জৈব প্রভাবক ... | ৭১ |
| ত্রয়োদশ | ,, | জৈব শক্তির উৎপাদন ও স্থানান্তর ... | ৭৮ |
| চতুর্দশ | ,, | সালোক সংশ্লেষণ ও রাসায়নিক সংশ্লেষক ব্যাকটিরিয়া ... | ৮৫ |
| পঞ্চদশ | ,, | নাইট্রোজেন বিপাক ... | ৮৮ |
| ষষ্ঠদশ | ,, | নিউক্লিক অ্যাসিড ও বংশগতি ... | ৯৩ |
| সপ্তদশ | ,, | ভাইরাস ঃ ব্যাকটিরিয়া থেকে ছোট রোগ উৎপাদক বস্তু ... | ৯৬ |
| অষ্টাদশ | ,, | সংক্রামক ব্যাধি ... | ১০৯ |
| ঊনবিংশ | ,, | প্রাণীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ... | ১২৫ |
| বিংশ | ,, | ক্ষুদ্র মৃতজীবী ছত্রাক বা চিতি ... | ১৩২ |
| একবিংশ | ,, | ঈস্ট বা খামির ... | ১৪১ |
| দ্বাবিংশ | ,, | কিমোথেরাপী ... | ১৪৬ |
| ত্রয়োবিংশ | ,, | খাদ্যের জীবাণুতত্ত্ব ... | ১৫৭ |
| চতুর্বিংশ | ,, | দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের জীবাণুতত্ত্ব ... | ১৬৩ |
| পঞ্চবিংশ | ,, | জনস্বাস্থ্য ... | ১৬৯ |
| ষড়বিংশ | ,, | মৃত্তিকা ও জীবাণু ... | ১৭৫ |
| সপ্তবিংশ | ,, | সামুদ্রিক জীবাণু ... | ১৮৮ |
| অষ্টাবিংশ | ,, | শিল্প-জীবাণুতত্ত্ব ... | ১৯১ |
| গ্রন্থপঞ্জী | ,, | ... | ২০২ |
| নির্ঘণ্ট | ,, | ... | ২০৩ |
| পরিভাষা | ,, | ... | ২০৭ |

readNshare

প্রথম অধ্যায়

# জীবাণুতত্ত্বের উপজীব্য

জীবাণু (Microbe) শব্দটা প্রথম চয়ন করেন ফরাসী শল্য চিকিৎসক সেদিল্ল (Sedillot), ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে। জীবাণু বলতে তিনি বোঝান, এমন সব ছোট উদ্ভিদ ও প্রাণীদের, যাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে দেখবার জন্য প্রয়োজন হয় মাইক্রোসকোপের। অনেকে জীবাণুকে বলেন অণুজীব (micro-organism)। জীবাণু (Microbe) ও অণু-জীব সমার্থক। জীবাণুতত্ত্বে সেই সব জীবাণুদের কথা অধিক আলোচনা করা হয়, যাদের সাধারণত স্থাপন করা হয় উদ্ভিদ রাজ্যে (Plant kingdom)। এককোষী প্রাণীদের কথা প্রধানত আলোচনা করেন প্রোটো জোলজিস্টরা (Proto Zoologists)।

## উদ্ভিদ ও প্রাণী

সেই সব জীবাণুকে সাধারণত উদ্ভিদ রাজ্যে স্থাপন করা হয়, যাদের কোষে শক্ত কোষপ্রাচীর থাকে। শক্ত কোষপ্রাচীর থাকবার জন্য এরা কণিকা-আকারে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে পারে না। গ্রহণ করে গাছের শিকড়ের মত পানিতে দ্রবীভূত (dissolved) অবস্থায়। কিছু জীবাণু আছে, যাদের দেহে ঠিক শক্ত কোষপ্রাচীর ( cell wall) নেই। কিন্তু তাদের কোষে থাকে ক্লোরোফিল। এরা অনেকেই পানিতে সাঁতার কেটে চলতে পারে। আর কণিকা-আকারেও খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের জীবকে উদ্ভিদবিদরা স্থাপন করেন উদ্ভিদ রাজ্যে ও প্রাণীবিদরা স্থাপন করেন প্রাণী রাজ্যে (Animal kingdom)। অনেকে মনে করেন এরা হলো খুবই আদিম ঐতিহ্যবাহী জীব। এদের থেকেই উদ্ভব হয়েছে উন্নত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ।

## প্রোক্যারিওটা ও ইউক্যারিওটা

কোষের সংগঠন অনুসারে উদ্ভিদ জাতিকে দুটি উপ-রাজ্যে (Sub-kingdoms) ভাগ করা চলে। একটি উপ-রাজ্যকে বলে প্রোক্যারিওটা (Procaryota) আর অন্য উপ-রাজ্যটিকে বলা হয় (Eucaryota)। প্রোক্যারিয়টদের কোষের গঠন, ইউক্যারিওটদের চাইতে অনেক সরল। প্রোক্যারিয়টদের কোষ কেন্দ্রের কোন কোষ-আবরণ থাকে না। কোষ-কেন্দ্রের মধ্যে কোন নিউক্লিওলাস

(nucleolus) থাকে না। এদের কোষে মাইটোকনড্রিয়া (mitochondria) এবং উন্নত উদ্ভিদের মত প্লাসটিড থাকে না। অন্যদিকে ইউক্যারিয়টদের কোষে প্রকৃত সুগঠিত কোষকেন্দ্র (true nucleus) থাকে। কোষ-কেন্দ্রে নিউক্লিওলাস থাকে। সাইটোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়া ও প্লাসটিড থাকতে পারে। প্রোক্যারিওটা ও ইউক্যারিওটা শব্দ দুটি চয়ন করেন স্যাটন (Chatton), ১৯৩০ সালে।

প্রোক্যারিয়টদের দলে পড়ে ব্যাকটিরিয়া (bacteria) ও নীল-সবুজ শৈবাল (Blue-Green Alage)। আর অন্যান্য সর্বপ্রকার উদ্ভিদ ইউক্যারিওটা উপ-রাজ্যভুক্ত। প্রোক্যারিয়ট উদ্ভিদ জীবাণুতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য। এর মধ্যে ব্যাকটিরিয়া প্রায় সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব। যে সব ইউক্যারিয়ট উদ্ভিদের কথা জীবাণুতত্ত্বে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়, তাদের পাঁচটি বড় বিভাগে (divisions) বিভক্ত করা চলে। এরা হলো ঃ

(১) ক্লোরোফাইটা (Chlorophyta) বা সবুজ শৈবাল ;
(২) ক্রাইসোফাইটা (Chrysophyta) বা সোনালী হলুদ শৈবাল ;
(৩) ইউগ্লেনোফাইটা (Euglenophyta) বা ইউগ্লেনা ;
(৪) পাইরোফাইটা (Pyrophyta) বা ডাইনোফ্লাজেলেট। এবং
(৫) ইউমাইকোফাইটা (Eumycophyta) বা ছত্রক।

## ভাইরাস ও ভাইরয়েড

ভাইরাস বলতে বোঝায় এমন জিনিসকে, যারা কেবল প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের সমবায়ে গঠিত। ভাইরাস এর নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে প্রোটিন আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। ভাইরাসদের দেহে কেবল মাত্র এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। হয়, RNA থাকে, নতুবা DNA থাকে। DNA ও RNA একত্রে থাকে না। অধিকাংশ ভাইরাস খুব ছোট। সাধারণ আলোক-মাইক্রোসকোপের সাহায্যে এদের দেখা যায় না। এদের অনেক আবরণ জীবন্ত বস্তুর মত, আবার অনেক আবরণ বিরাট এনজাইম (enzyme) অণুদের মত। ভাইরাসেরা কেবল মাত্র উপযুক্ত প্রাণী অথবা উদ্ভিদকোষের মধ্যেই সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে পারে।

ভাইরয়েডরা (Viroid) আকারে ভাইরাসদের চাইতে অনেক ছোট। এরা কেবলমাত্র নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা গঠিত। এই নিউক্লিক অ্যাসিড কোন বিশেষ প্রোটিন আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে না।

banglainternet.com



ভাইরাসদের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করে ভাইরোলজি (Virology)। কিন্তু জীবাণুতত্ত্বেও এদের সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়। বিশেষত ব্যাকটিরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাসদের সম্বন্ধে। যে সব ভাইরাস ব্যাকটিরিয়াদের আক্রমণ করে, তাদের বলে ব্যাকটিওরিও ফাজ (Bacterio phage) বা সংক্ষেপে শুধু ফাজ (Phage)।

## জীবাণুতত্ত্বের জন্ম

প্রথম জীবাণু দেখেন ও জীবাণুদের পরিষ্কার করে ছবি আঁকেন ডাচ বিজ্ঞানী লিউভেন হুক (Van Leewen hock), ১৬৭৬ খৃীস্টাব্দে। তিনি জীবাণু দেখে ছবি আঁকেন একটি মাত্র বীক্ষণ (lens) সাহায্যে তৈরী মাইক্রোসকোপের সাহায্যে। জীবাণু জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাড়তে আরম্ভ করে কম্পাউন্ড মাইক্রোসকোপের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। প্রধানত দুজন বিজ্ঞানীর দানকে নির্ভর করে রচিত হয়েছে জীবাণুতত্ত্বের মূল ভিত্তি। এদের মধ্যে একজন হলেন ফরাসী রসায়নবিদ লুই পাস্তুর (Lous Pasteur, ১৮২২–১৮৯৫) এবং অপর জন হলেন জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কক্ (Robert Koch, ১৮৪৩—১৯১০)।

প্রাচ্যদেশেও জীবাণু সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা সম্ভবত ছিল। ইবনে সিনা (৯৮০—১০৩৭) বলেছেন, ছোঁয়াচে রোগের কারণ হলো খালি চোখে দেখা যায় না এরকম খুব ছোট জীবন্ত জিনিস। এরা প্রধানত বাতাস ও পানির মাধ্যমে ছড়ায়।*

অনেক জীবাণু মানুষের মারাত্মক রোগের কারণ। প্রথমে রোগজীবাণু সম্পর্কে গবেষণা করতে যেয়েই আরম্ভ হয় প্রকৃত জীবাণুতত্ত্বের। তারপর মানুষ ধীরে ধীরে জ্ঞাত হতে আরম্ভ করে প্রকৃতিতে জীবাণুদের বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্ম সম্বন্ধে। আরম্ভ হয় জীবাণুদের কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অর্থকরী দ্রব্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন।

## কোষতত্ত্ব ও জীবাণু

কোষতত্ত্ব বা সেল থিওরী (Cell Theory) জীব বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক রবার্ট হুক (Robert Hook) তাঁর নিজের তৈরী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম কর্কের মধ্যেকার মৃত কোষ

* K. Pyatkin (1969) : Microbiology. P. 15. Mir publication, Moscow.

পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি পাতলা করে কাটা কর্কের (cork) পাতের মধ্যে অসংখ্য চোকো চোকো বাকসের মত অঞ্চল দেখেন। তিনি এই সব অঞ্চলের নাম দেন সেল (cell)। সেল কথাটার শব্দগত অর্থ হচ্ছে দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট কুঠুরী। সেল শব্দটার বাংলা আমরা সাধারণত করি কোষ। হুকের পর ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী রানে দুত্রোসে (Rene dutrochet), প্রথম বিশেষভাবে প্রচার করেন, উদ্ভিদের দেহ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত। দুত্রোসের পরে বৃটিশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) প্রথম ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা কোষকেন্দ্র লক্ষ্য করেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে জার্মানিতে স্লাইডেন (Schleiden) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ও ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সহকর্মী স্কোয়ান (Schwan) মিলে সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠা করেন কোষতত্ত্ব। এই মতবাদ অনুসারে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহ অসংখ্য কোষ অথবা কোষ জাত দ্রব্যের দ্বারা গঠিত। কোষই হলো জীবদেহের আসল একক (unit) যার অনুশীলনের মাধ্যমে জীবদেহের সংগঠন (organization) ও দেহক্রিয়া (physiology) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ সম্ভব।

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে পারকিনজি (Purkinje) নামক একজন চেক বৈজ্ঞানিক প্রথম প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) শব্দটা ব্যবহার করেন। প্রোটোপ্লাজম বলতে বোঝান হতে থাকে কোষের মধ্যেকার সমস্ত জীবজ বস্তুর সমষ্টিকে। এর পর থেকে কোষ ও তার মধ্যেকার প্রোটোপ্লাজমের সাহায্যে জীবদেহের সংগঠন ও দেহক্রিয়াকে বর্ণনা করা আরম্ভ হয়। এখন কোষ সম্পর্কে আমাদের ধারণা বহুভাবে পরিবর্তিত হলেও কোষতত্ত্বের মূল ধারণা এখন হয়ে আছে জীব-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

কোষতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর, জীবাণুদের, যাদের মধ্যে বহু কোষের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি, তাদের এককোষী জীব (unicellular organisms) হিসেবে বর্ণনা দেওয়া আরম্ভ হয়।

যে সব জীবাণুর কোষের চারধারে শক্ত-প্রাচীর বা আবরণ থাকে তাদের বলা হতে থাকে উদ্ভিদ আর যাদের ক্ষেত্রে তা থাকে না, তাদের বলা হতে থাকে এককোষী প্রাণী বা প্রোটোজোয়া (Protozoa)। এভাবে পার্থক্য করলে একটা সুবিধা আছে। যে সব জীবাণুর কোষ শক্ত কোষপ্রাচীর দিয়ে ঢাকা থাকে, তারা প্রাণীদের মত বাইরে থেকে খাদ্যবস্তু কঠিন টুকরার আকারে গ্রহণ করতে পারে না। গ্রহণ করে উদ্ভিদের মত পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায়। তাই কোন জীবাণুকে যদি উদ্ভিদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তবে তার এই বৈশিষ্ট্যের কথা

banglainternet.com



সহজেই মনে আসে। যে সব জীবাণুকে সাধারণত উদ্ভিদ হিসেবে গণ্য করা হয়, তারা প্রথমে তাদের বিভিন্ন এনজাইম (engymes)-এর সাহায্যে বাইরের জটিল জৈব খাদ্যবস্তুকে ভেঙ্গে পানিতে দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করে। এবং পরে সেই দ্রবীভূত খাদ্যবস্তু কোষের ভিতরে শোষণ করে। এ ধরনের পুষ্টি প্রণালীকে সাধারণত বলা হয় অভিস্রাবীয় বা অসমোট্রফিক (Osmotrophic)।

যাদের সাধারণত বলা হয় জীবাণু, তারা প্রধানত এককোষী এবং আণুবীক্ষণিক (Microscopic)। অনেক জীবাণু একাধিক কোষের দ্বারা গঠিত হলেও, তাদের ক্ষেত্রে কোষগুলি থাকে প্রায় স্বাধীন। কোষগুলির মধ্যে উন্নত প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেমন কর্মবিভাগ (division of labour) সৃষ্টি হতে দেখা যায়, তা পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ কোষগুলি একত্রিত হয়ে বিভিন্ন কলা বা টিস্যু (tissue) গঠন করে না। জীবাণুতত্ত্বে (Microbiology) কোষ-তত্ত্বের (Cytology) অনেক পরিভাষা ও ধারণা ব্যবহার করা হয়। যদিও এরকম ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে ঠিক যুক্তিসংগত নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

# নীল-সবুজ শৈবাল ও ব্যাকটিরিয়া

নীল-সবুজ শৈবাল ও ব্যাকটিরিয়া উভয়েই প্রোক্যারিয়ট। কিন্তু এদের মধ্যে বিরাট দেহক্রিয়াগত পার্থক্য বিদ্যমান। নীল-সবুজ শৈবালদের কোষে ক্লোরোফিল 'a' থাকে। এরা সবুজ উদ্ভিদের মত সালোক সংশ্লেষণে (photo synthesis) সক্ষম। সালোক সংশ্লেষণের সময় এরা পানির অণু ভেঙ্গে অক্সিজেন উৎপাদন করে। এই অক্সিজেন এদের দেহ থেকে নির্গত হয়। পানির হাইড্রোজেন ও বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড একত্রিত করে এরা উন্নত উদ্ভিদের মত কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে। এরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ (autotrophic)। এরা এদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জৈব বস্তু অজৈব বস্তু থেকে উৎপাদন করতে সক্ষম। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়াকে খাদ্যবস্তুর জন্য নির্ভর করতে হয় জৈব বস্তুর উপর। বিশেষ করে উদ্ভিদের তৈরী করা কার্বো হাইড্রেটের উপর। কয়েক প্রকার ব্যাকটিরিয়া কোষে এক প্রকার ক্লোরোফিল থাকে, যা ক্লোরোফিল 'a' থেকে বিশেষভাবে আলাদা। যেসব ব্যাকটিরিয়ার ক্লোরোফিল আছে তারা পানির হাইড্রোজেনের সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে না। তাদের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আসে অন্য যৌগ যেমন হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$) থেকে। তাই তাদের সালোক সংশ্লেষণের সময় কোন অক্সিজেন নির্গত হয় না। কয়েক প্রকার ব্যাকটিরিয়া আছে, যারা তাদের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার জৈব বস্তু, অজৈব বস্তু থেকে উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু তারা এই কাজে আলোক শক্তিকে কাজে লাগায় না। তারা কাজে লাগায় অ্যামোনিয়া প্রভৃতি অজৈব বস্তুকে জারিত (oxidize) করে যে শক্তি উৎপাদিত হয়, তাকে। এসব ব্যাকটিরিয়াকে তাই আর এক কথায় বলা হয় কিমোসিনথেটিক (Chemosynthetic)। সাধারণভাবে, যেসব প্রোক্যারেয়টদের কোষে ক্লোরোফিল থাকে না, তাকেই এখন উল্লেখ করা হয় ব্যাকটিরিয়া বলে। ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে।

## বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া

১। **প্রকৃত ব্যাকটিরিয়া** (Eubacteriae): এদের কথা আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করবো।

২। **মিকসো ব্যাকটিরিয়া** (Myxobacteriae): এরা এককোষী। কোষ-

banglainternet.com



প্রাচীর স্থিতিস্থাপক (flexible) ও খুব পাতলা। এরা শক্ত অথবা তরল জিনিসের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে গড়িয়ে চলে (gliding movement)। অনেকে একত্রে আঠার মত হড়হড়ে বস্তু উৎপাদন করে। একে বলা হয় নকল প্লাজমোডিয়াম (pseudoplasmodium)। বিশেষ অবস্থায় মাইক্রোসিস্ট উৎপাদন করে।

৩। **স্পাইরোকিটি** (Spirochaetae): এককোষী এবং পাতলা কোষ-প্রাচীরযুক্ত। কোষগুলি হয় খুব লম্বা ও বিশেষভাবে পেঁচান। কোষপ্রাচীরের নীচে খুব সূক্ষ্ম সূতার মত আঁশ (axil filament) পাক খেয়ে থাকে। এই আঁশের সংকোচন ও প্রসারণের সাহায্যে এরা এঁকে বেঁকে চলাফেরা করে। স্পাইরোকিটরা সাধারণতঃ স্বাধীনভাবে বসবাস করে। আর কিছু স্পাইরোকিট পরজীবী। মানুষের সিফিলিস রোগের কারণ এক প্রকার পরজীবী স্পাইরোকিট। অনেকে স্পাইরোকিটসদের শ্রেণীবদ্ধ করতে চান প্রোটোজোয়াদের সঙ্গে।

৪। **রিকেটসিয়া** (Rickettsiae): এ সাধারণ ব্যাকটিরিয়া থেকে অনেক ছোট। দণ্ডাকৃতি অথবা গোল। এরা সন্ধিপদ প্রাণীর (arthropods) ও মানুষের দেহে পরজীবী হিসাবে বাস করে। এরা কেবল পরজীবী হিসাবেই জীবনধারণ করতে পারে। আগে এদের ভাইরাসদের সঙ্গে একত্রে শ্রেণীবদ্ধ করা হতো। কিন্তু এখন ইলেকট্রনমাইক্রোসকোপের সাহায্যে ছবি তুলে বোঝা যায়, এরা কোষপ্রাচীরযুক্ত এবং প্রোক্যারিয়ট। ব্যাকটিরিয়ার মত মধ্যে থেকে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বংশবিস্তার করে। মানুষের টাইফাস রোগের কারণ হলো এক প্রকার রিকেটসিয়া। এরা কীটপতঙ্গের কামড়ের ফলে মানব ও প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে রোগ ঘটায়। কিন্তু সন্ধিপদ প্রাণীদের কোন ক্ষতি করে বলে মনে হয় না।

৫। **মাইকোপ্লাজমা** (Molliceteae): এক ধরনের খুব ছোট ব্যাকটিরিয়া। তবে রিকেটসিয়াদের মত তত ছোট নয়। এরা কোন নির্দিষ্ট আকৃতির হয় না। এদের কোষ আবরণ দ্বারা ঢাকা থাকে। এই আবরণ তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত। এদের কৃত্রিম-আবাদ মাধ্যমে আবাদ করা যায়। এই জাতীয় জীবাণু প্রথম পৃথক করা হয় গবাদি পশুর ফুসফুস থেকে নির্গত পদার্থ থেকে। একধরনের মাইকোপ্লাজমা গবাদি পশুর নিউমনিয়ার কারণ। তাই মাইকোপ্লাজমাদের আগে বলা হতো প্লুরোনিউমনিয়া জাতীয় জীবাণু। (Pleuropneumonia-like organisms, সংক্ষেপে, PPLO)। এরা ভাইরাসের মত খুব ছোট ছিদ্রযুক্ত চিনামাটির ফিল্টারের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে।

কারণ, এই সব সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে এই সব জীবাণু লম্বা অতি সূক্ষ্ম সুতোর আকার ধারণ করে চলে যেতে পারে। গাছের অনেক রোগের কারণ মাইকোপ্লাজমা। যেমন বেগুন গাছের ক্ষুদে-পত্র রোগ (little leaf disease of Bringal), তিলের ফাইলোডি (Phylody)। আগে এসব রোগকে ভাইরাস-জনিত বলে মনে করা হতো।

## নীল-সবুজ শৈবাল

নীলসবুজ শৈবালদের উদ্ভিদবিদরা বিশেষভাবেই মনে করেন উদ্ভিদ হিসাবে এবং এদের স্থাপন করেন উদ্ভিদ রাজ্যের একটি স্বতন্ত্র বিভাগে (division)। এই বিভাগকে উদ্ভিদবিদরা উল্লেখ করেন সায়ানোফাইটা (Cyanophyta) হিসাবে। নীল-সবুজ শৈবালরা অনেকে সত্যকার এককোষী। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোষগুলি বিভক্ত হয়ে মালার আকারে লেগে থাকে, আলাদা হয়ে যায় না। এদের সবাইকে সাধারণ কথায় নীল-সবুজ শৈবাল বলে। কারণ এদের দেহে এক ধরনের নীলাভ রঞ্জক বস্তু (Phycocyamin) থাকে। অধিকাংশ নীল-সবুজ শৈবাল মিষ্টি পানিতে, বিশেষ করে বদ্ধ পানিতে থাকে। এরা অনেকে এক রকম পিচ্ছিল বস্তু উৎপাদন করে। বর্ষাকালে যে পিচ্ছিল বস্তু অনেক সময় মানুষের পা পিছলে পড়ে যাবার কারণ হয়, তা হলো সবুজ শৈবালের দেহ নিঃসৃত পিচ্ছিল আঠালো বস্তু।

নীল-সবুজ শৈবালদের সাধারণতঃ দুটি বর্গে (order) ভাগ করা হয় ঃ

(১) করোকক্কালেস (Chroococcales) এবং

(২) হরমোগোনালেস (Hormogonales)।

করোকক্কালেস বা নীল-সবুজ গোলাকৃতি কোষবিশিষ্ট। এদের দৃষ্টান্ত করোকক্কাস (Chroococcus) ও গ্লিওক্যাপসা (Gloeocapsa)।

হরমোগোমানেসদের কোষরা পরস্পরের সঙ্গে লেগে থেকে ট্রাইকোম গঠন করে। এদের উপর থাকে বিশেষ ধরনের আবরণ। এই আবরণ ও কোষদের একত্রে বলা হয় ফিলামেন্ট (filament)। এদের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের পুরু কোষপ্রাচীরযুক্ত কোষ থাকতে দেখা যায়। যাকে বলা হয় হেটেরোসিস্ট (heterocysts)। এরা স্বচ্ছ উজ্জ্বল পদার্থে পূর্ণ থাকে।

এককোষী সায়ানোফাইটারা মাঝামাঝি বিভক্ত হয়ে (fisson) বংশ বিস্তার করে। কিন্তু হরমোগোনালিসদের ক্ষেত্রে হেটেরোসিস্ট-এর কাছ থেকে কিছুটা

banglainternet.com



অংশ ভেঙ্গে পৃথক হয়ে যায়। এই পৃথক হয়ে যাওয়া অংশ কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ফিলামেন্ট গঠন করে। বিচ্ছিন্ন অংশকে বলা হয় হরমোগোনিয়া (hormogonia)। এর বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো অসিলাটোরিয়া (Oscillatoria), নস্টক (Nostoc), রিভুলারিয়া (Rivularia), গ্লিও ট্রিসিয়া (Gyloeo trichia), অ্যানাবিনা (Anabaena)।

ব্যাকটিরিয়া ও নীল-সবুজ শৈবালের সম্পর্ক মনে হয় খুব কাছের। নীল-সবুজ শৈবালে ক্লোরোফিল a থাকে, আর ব্যাকটিরিয়াতে থাকে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নীল-সবুজ শৈবাল ও ব্যাকটিরিয়ার বিভাগ নিয়ে দেখা দেয় যথেষ্ট মতভেদ। বেগিয়াটোয়া (Beggiatoa)কে কেউ ফেলতে চান নীল-সবুজ শৈবালের দলে। আবার কেউবা ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে। এরা পচা পানিতে থাকে এবং $H_2S$-কে জারিত করে শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করে। এরা দেখতে অসিলাটোরিয়ার (Oscillatoria) মত। কিন্তু এদের কোন ক্লোরোফিল নেই। অনেকে এখনও নীল-সবুজ শৈবালদের সায়ানোফাইট (Cyanophyta) না বলে সায়ানোব্যাকটিরিয়া (Cyanobacteria) বলার পক্ষে।

তৃতীয় অধ্যায়

# শৈবাল

থ্যালোফাইটা (Thallophyta) শব্দটা চয়ন করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৮৩৬)। থ্যালোফাইটা বলতে বোঝাত সেই সব উদ্ভিদদের, যাদের মূল, কান্ড, পাতা হয় না এবং যাদের জননাঙ্গ এককোষী (monocellular sex organ)। থ্যালোফাইটাদের ভাগ করা হতো দু'ভাগে অ্যালগি (Algae) ও ফাঙ্গাই (Fungi)। অ্যালগি বলতে বোঝাত সেইসব থ্যালোফাইটাকে যাদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে। যারা উন্নত উদ্ভিদের মত সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। আমরা থ্যালোফাইটার বাংলা করি সমাঙ্গ উদ্ভিদ। অ্যালগির বাংলা করি শৈবাল আর ফাঙ্গাই এর বাংলা করি ছত্রাক। কিন্তু এখন থ্যালোফাইটাকে সাধারণত মনে করা হয় উদ্ভিদ রাজ্যের একটা খুবই কৃত্রিম বিভাগ (division)। যাদের বলা হয় থ্যালোফাইটা তাদের মধ্যে সম্পর্ক খুব কাছের নয়। এদের মধ্যে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন (phylogenetic relation) নেই। যাদের বলা হত শৈবাল, তাদের বিভিন্ন উদ্ভিদবিদ এখন বিভিন্নভাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে চান। শৈবাল বা অ্যালগি কথাটার এখন আর আগের মত কোন শ্রেণীবদ্ধনগত (taxonomic) তাৎপর্য নেই। কিন্তু সাধারণ বিবরণে শৈবাল কথা এখনও ব্যবহার করা হয়। শৈবাল বলতে বোঝায় সেইসব উদ্ভিদদের যাদের দেহ গড়ন অপেক্ষাকৃত সহজ; যাদের জননাঙ্গ এককোষী এবং যারা উন্নত সবুজ উদ্ভিদের মত সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম। যাদের বলা হয় শৈবাল তারা অধিকাংশই পানিতে অথবা খুব ভেজা জায়গায় বাস করে। যেমন ভেজা মাটি, বাড়ির দেয়াল, বৃক্ষের বাকল।

সাধারণত উদ্ভিদবিদরা শৈবালদের এখন ৭ ভাগে ভাগ করেন :

(১) সায়ানোফাইটা (Cyanophyta)—নীল-সবুজ শৈবাল।
(২) ক্লোরোফাইটা (Chlorophyta)—সবুজ শৈবাল।
(৩) ক্রাইসোফাইটা (Chrysophyta)—সোনালী শৈবাল।
(৪) ইউগ্লিনোফাইটা (Euglinophyta)—ইউগ্লিনা।
(৫) পাইরোফাইটা (Pyrrophyta)—ডাইনোফ্লাজেলেট।
(৬) রোডোফাইটা (Rhodophyta)—লোহিত শৈবাল।
(৭) ফিয়োফাইটা (Phaeophyta)—বাদামী শৈবাল।



এই সাত ভাগের মধ্যে রোডোফাইটা ও ফিয়োফাইটা আকারে হয় খুব বড় এবং এদের দেহ গঠনও অনেক জটিল। এরা ঠিক জীবাণুতত্ত্বের এলাকায় পড়ে না। সায়ানোফাইটা হলো প্রোক্যারিওটিক। আমরা এদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে অন্যদের সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করবো।

## সবুজ-শৈবাল

সাধারণত আণুবীক্ষণিক (microscopic)। কিছু আছে যারা বেশ বড়। এককোষী অথবা বহুকোষী। এদের দেহে উন্নত উদ্ভিদের মত ক্লোরোফিল a, b, ক্যারোটিন ও জ্যান্থফিল থাকে। এদের সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া উন্নত উদ্ভিদের মত। এদের দেহে কার্বোহাইড্রেট, স্টার্চ (starch) হিসাবে সঞ্চিত থাকে। উন্নত উদ্ভিদের কোষের মত এদের কোষের প্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা তৈরি। সাধারণত অলবণাক্ত পানি, ভেজা মাটি ও গাছের বাকলে হতে দেখা যায়। কতগুলি খুব পরিচিত দৃষ্টান্ত, ক্লোরেলা (Chlorella), স্পাইরোগাইরা (Spirogyra), ভকেরিয়া (Vaucheria), ইউডোগনিয়াম (Eudogonium), উলথ্রিকস (Ulothrix), ক্ল্যামাইডোমোনাস (Chlamydomonas)। এই বিভাগের অনেক শৈবাল ফ্লাজেলার সাহায্যে পানিতে সাঁতার কেটে চলতে পারে।

## সোনালী শৈবাল

এদের মধ্যে ডায়াটম (diatoms) কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সকলেই আণুবীক্ষণিক; প্রধানত এককোষী; এদের কোষে ক্লোরোফিল a থাকে। b, ক্যারোটিন ও জ্যান্থফিল থাকে না। এদের দেহে খাদ্যবস্তু সাধারণত তেল হিসাবে সঞ্চিত থাকে। এদের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা গঠিত নয়। পেকটিন ও সিলিকা ($SiO_2$) দ্বারা গঠিত। কোষ প্রাচীরকে দুভাগে খুলে ফেলা যায়। এর এক ভাগ আর এক ভাগের সঙ্গে গোল কৌটার ডালার মত লেগে থাকে। কিছু ডায়াটম সচল। কিন্তু তারা ঠিক কিভাবে চলাফেরা করে সে সম্বন্ধে ধারণা এখনও সুস্পষ্ট নয়। সমুদ্রের লোনা পানিতে, অলবণাক্ত পানিতে, ভেজা মাটি, গাছের ছালে বাস করে। এদের খুব পরিচিত দৃষ্টান্ত হলো, অ্যাসটেরিওনিলা (Asteorionella), ফ্ল্যাজিলারিয়া (Flagilaria), নাভিকুলা (Navicula), ডায়াটোমা (Diatoma), টেবিলারিয়া (Tabellaria), পিনুলারিয়া (Pinularia)।

banglainternet.com

## ইউগ্লিনা

আণুবীক্ষণিক, এককোষী। এরা ফ্লাজেলার সাহায্যে সাঁতরে চলে। শক্ত কোন কোষপ্রাচীর নেই। খাদ্যবস্তু প্যারামাইলাম (paramylum) ও চর্বি হিসাবে সঞ্চিত থাকে। প্যারামাইলাম স্টার্চের (starch) সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত যৌগ। এদের শরীরে ক্লোরোফিল a এবং b আছে। প্রধানত অলবণাক্ত পানিতে বাস করে।

## ডাইনোফ্ল্যাজেলেট

আণুবীক্ষণিক; প্রধানত এককোষী; ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে সাঁতরে চলতে পারে। দুটি ফ্ল্যাজেলার একটি পাশে লাগানো। কোষে ক্লোরোফিল a থাকে। খাদ্যবস্তু স্টার্চ (starch) হিসাবে সঞ্চিত থাকে। কোষপ্রাচীর থাকে অথবা থাকে না। যাদের থাকে, তাদের সেলুলোজ দিয়ে তৈরী। সাধারণত সামুদ্রিক অলবণাক্ত পানিতে কদাচিৎ দেখা যায়। গনিউলাস (Gonioulax) একটি খুব পরিচিত ডাইনোফ্লাজেলেট (dinoflagelet)।

যে সব শৈবাল ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে সাঁতরে বেড়াতে পারে, তাদের প্রাণীবিদরা সাধারণত মনে করেন এক কোষী প্রাণী বা প্রোটোজোয়া বিভাগভুক্ত বলে। আবার উদ্ভিদবিদ্যা অনেক সুপরিচিত প্রোটোজোয়াকে মনে করেন, ক্লোরোফিল হারিয়ে উদ্ভূত হয়েছে বলে এদের শ্রেণীবন্ধন খুবই কঠিন। জার্মান নিসর্গবিদ (naturalist) হেকেল (Haekel) তাই এদের মনে করেন প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝামাঝি পর্যায়ের জীব বলে এবং তিনি এদের উদ্ভিদ ও প্রাণী রাজ্যে (Kingdom) স্থাপন না করে, স্থাপন করেন (১৮৬৬) একটি তৃতীয় রাজ্যে। যার নাম তিনি দেন প্রোটিসটা (Protista)।

অ্যালগিরা সালোক সংশ্লেষণ করে। এর ফলে বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন ছাড়া পায় ও বায়ুমণ্ডল শ্বাসক্রিয়ার উপযোগী থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবন বিশেষভাবে শৈবালের উপর নির্ভরশীল। খাদ্যের জন্য তাদের শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতে হয় শৈবালের উপর। আর এ-সব শৈবাল সাধারণত আণুবীক্ষণিক। ডায়াটমদের মধ্যে খাদ্যবস্তু সঞ্চিত থাকে তেল হিসাবে। এই তেলের মধ্যে ভাইটামিন A ও D দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এখান থেকে এরা পৌঁছায় মাছের দেহে। সামুদ্রিক মাছের যকৃৎ (liver) থেকে যথেষ্ট পরিমাণে এই দুটি ভিটামিন পাওয়া যায়।

banglainternet.com



যে সব শৈবাল মাটিতে থাকে, তারা মাটিতে জৈব বস্তু যোগ করে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া নীল-সবুজ শৈবাল বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করতে পারে। এই অ্যামোনিয়া থেকে তারা প্রস্তুত করতে পারে প্রোটিন। নীল-সবুজ শৈবাল মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি ঘটায়। যে সব স্থানে অন্য কোন সবুজ উদ্ভিদ হতে পারে না, সেখানেও শৈবালদের হতে দেখা যায়। যেমন মেরু অঞ্চলের তুষারের উপর; গরম ঝর্ণার পানিতে ৮৫° থেকে ৯০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। পৃথিবীতে যখন অন্য কোন প্রকার সবুজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব ছিল না, শৈবালদের অস্তিত্ব তখনও ছিল।

## চতুর্থ অধ্যায়

# প্রকৃত ব্যাকটিরিয়া

আমরা উল্লেখ করেছি, ব্যাকটিরিয়া বলতে বোঝায় সেই সব প্রোক্যারিয়টদের, যাদের কোষে ক্লোরোফিল a থাকে না। কিন্তু সাধারণত ব্যাকটিরিয়া বলতে

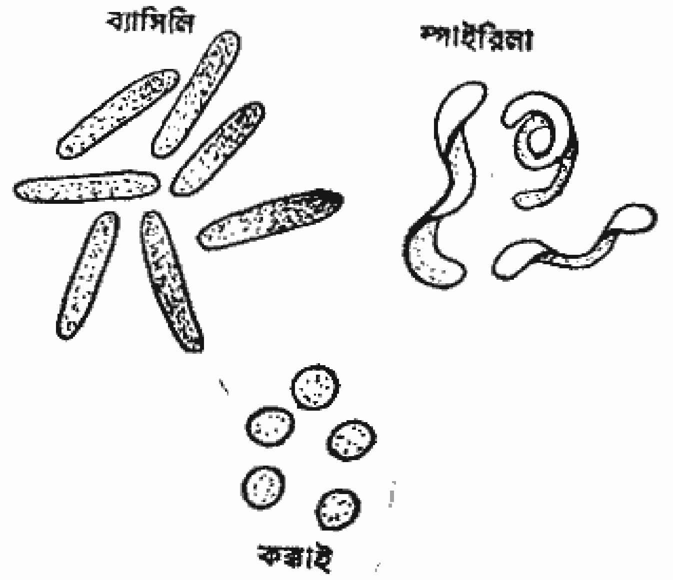


চিত্র ১ঃ বিভিন্ন আকৃতির ব্যাকটিরিয়া

সাধারণত বোঝায় ক্লোরোফিলবিহীন তিন প্রকার জীবাণুকে; দণ্ডাকৃতি গোল এবং বিশেষভাবে পেচান ( baccilli, cocci, spirilla )* ( চিত্র ১ )।

* "bacillus" লিখতে যখন ছোট হাতের b দিয়ে লেখা হয়, তখন সাধারণত বোঝান হয় যে কোন দণ্ডাকৃতি (rod-shaped) ব্যাকটিরিয়ামকে। কিন্তু Bacillus লিখলে সাধারণত বোঝায় একটি বিশেষ গণের ব্যাকটিরিয়াকে। তেমনি spirillum ছোট হাতের 's' দিয়ে লিখলে বোঝায় যেকোন প্যাঁচান ব্যাকটিরিয়াম, কিন্তু বড় হাতে S লিখলে বোঝায় একটি বিশেষ গণের ব্যাকটিরিয়ামকে। ল্যাটিন ও ইংরাজিতে bacterium কথাটা একবচন আর bactiria কথাটা বহুবচন। আমরা বাংলায় ব্যাকটিরিয়া শব্দটা অনেক ক্ষেত্রে একবচন হিসেবেও ব্যবহার করবো।

ব্যাকটিরিয়া নানা আয়তনের হতে পারে। তবে দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া সাধারণত চওড়ায় হয় ০·৪ থেকে ১·৫ মাইক্রোমিটার (mm) আর লম্বায় হয় ৪ থেকে ৫ মাইক্রোমিটারের কাছাকাছি (১ মাইক্রোমিটার = ১০০০ মিলিমিটার। মাইক্রোমিটারকে আগে বলা হতো মাইক্রন বা মিউ।) ছোট গোলাকৃতি ব্যাকটিরিয়ার ব্যাস মাত্র ১ মাইক্রোমিটার হতে পারে।

### শরীর স্থান (Anatomy)

একটি আদর্শ ব্যাকটিরিয়া কোষকে এভাবে বর্ণনা করা যায় (চিত্র ২)ঃ

(ক) **কোষপ্রাচীর** (Cell wall)ঃ একটি আদর্শ ব্যাকটিরিয়া কোষের চারধারে শক্ত কোষপ্রাচীর থাকে। কিন্তু সাধারণ উদ্ভিদ কোষের মত এই কোষপ্রাচীর সেলুলোজ (cellulose) দ্বারা গঠিত নয়। যে সব ব্যাকটিরিয়া গ্রাম পজেটিভ তাদের কোষপ্রাচীর মিউকো-প্রোটিন (mucoprotein) দ্বারা গঠিত। মিউকো-প্রোটিনের মূল কাঠামো প্রোটিন দ্বারা গঠিত। কিন্তু এর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত থাকে পলিস্যাকেরাইড (polysaccharide)। গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাচীরের গঠন গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়ার চাইতে জটিল। এক্ষেত্রে লিপিড (lipid) জাতীয় বস্তুও থাকতে দেখা যায়।* অনেক সময় কোষপ্রাচীরের চারধারে বিশেষ পলিস্যাকেরাইড এর স্তর থাকতে দেখা যায়। এরা আঠাল ও চটচটে পদার্থ। এই স্তরকে বলা হয় ক্যাপসুল (capsule)।

(খ) **প্রোটোপ্লাস্ট** (Protoplast)ঃ এনজাইমের সাহায্যে ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাচীরকে দ্রবীভূত (dissolve) করে ফেলা যায়। কোষপ্রাচীর বাদ দিলে ব্যাকটিরিয়া কোষের যা থাকে, তাকে উল্লেখ করা হয় প্রোটোপ্লাস্ট (protoplast) হিসাবে। কোষপ্রাচীরের নীচে একটা পাতলা পর্দা থাকে। এই পর্দা বা ঝিল্লিকে বলে প্রোটোপ্লাস্ট-ম্যামব্রেন (protoplast membrane)। প্রোটো-

* গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়া বলতে বোঝায়, যারা অ্যালকোহল দিয়ে ধুয়ে ফেলার পরও গ্রাম-রঞ্জক আটকে রাখে। গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়া এভাবে রঞ্জক আটকে রাখতে পারে না। প্রধানত কোষপ্রাচীরের পার্থক্যের জন্যই এরকম ঘটে। স্ট্যাফাইলোকক্কাস (staphylococcus), স্ট্রেপটোকক্কাস (streptococcus) গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়া গ্রাম-পজেটিভ। কিন্তু গণকক্কাস ( Gonococcus ), টাইফয়েড রোগের ব্যাকটিরিয়া গ্রাম-নেগেটিভ। সম্ভবত কোষপ্রাচীরে লিপিড থাকার জন্যই গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ায় গ্রাম-রঞ্জক লেগে থাকতে পারে না।

banglainternet.com

প্লাস্ট ম্যামব্রেন দিয়ে ঢাকা ব্যাকটিরিয়া কোষের সমগ্র অংশকে বলা হয় প্রোটো-প্লাস্ট। প্রোটোপ্লাস্ট শব্দটার উদ্ভব হয়েছে প্রোটোপ্লাজম (Protoplsm) থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৪০) চয়ন করা হয়েছিল, কোষের জীবন্ত বস্তুকে বোঝাবার জন্য। কিন্তু এখন এই শব্দটা আর ব্যবহার করা হয় না।

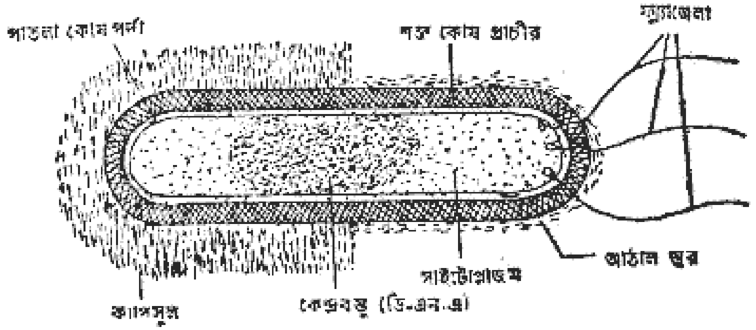


চিত্র ২ : ব্যাকটিরিয়াম শরীরস্থান

কারণ কোষে কোন এক ধরনের আধা-জীবন্ত পদার্থ (ground substance) থাকে না। কোষের নিউক্লিয়াস (nucleus) ও সাইটোপ্লাজমের (cytoplasm) রাসায়নিক বিশেষভাবেই আলাদা। এছাড়া কোষের যে অঞ্চলকে সাইটো-প্লাজম বলে উল্লেখ করা হয়, তাও একটা বস্তু দ্বারা গঠিত নয়। এর মধ্যে থাকে একাধিক বস্তু।

**নিউক্লিয়াস** (Nucleus) : ব্যাকটিরিয়ার নিউক্লিয়াসে কোষ আবরণ থাকে না। ব্যাকটিরিয়ার নিউক্লিয়াসে নিউক্লিওলাসও থাকে না। ব্যাকটিরিয়ার নিউক্লি-য়াস কেবলমাত্র DNA দ্বারা গঠিত। এতে প্রোটিন থাকে না। ইসচেরিচিয়া (Escherichia coli) ব্যাকটিরিয়ান নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে, তা থেকে মনে হয়, ব্যাকটিরিয়ার নিউক্লিয়াসে কেবলমাত্র একটা ক্রোমোজোম (chromosome) থাকে। অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের মত জোড়ায় জোড়ায় থাকে না। ব্যাকটিরিয়া ক্রোমোজোম কোন প্রকার প্রোটিন আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে না। ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম বলতে বোঝায় খুব লম্বা সুতোর মত DNA অণু। ব্যাক-টিরিয়া কোষ বিভক্ত হবার সময় কোন স্পিনডিল (spindle) তৈরী হয় না। অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়া কোষে মাইটোসিস (mitosis) ঘটে না। ব্যাকটিরিয়া কোষের



ক্রোমোজোম বিভাজন ব্যাপারে এখন বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।* ব্যাকটিরিয়া কোষের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস বলতে বোঝায় জড়িয়ে থাকা একটা লম্বা DNA অণু, যা বিশেষভাবে ভাগ হতে পারে। সাধারণভাবে মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখলে মনে হয়, কোষকেন্দ্র প্রথমে কিছুটা লম্বাকৃতি ধারণ করে। তারপর মাঝখান থেকে সমান দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

**ফ্ল্যাজেলা** (Flagella)

যেসব ব্যাকটিরিয়া নড়াচড়া করতে পারে, তারা সাধারণত ফ্ল্যাজেলার সাহায্যেই তা করে থাকে। ফ্ল্যাজেলা বলতে বোঝায় লম্বা সুতোর মত অবয়ব যা সাইটো-প্লাজমের সাথে যুক্ত থাকে। ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে ফ্ল্যাজেলারা খুবই সরু, মাত্র একটি খুব সূক্ষ্ম প্রোটিন-সূত্রের (fibril) দ্বারা গঠিত। এই প্রোটিন-এর সাথে আমাদের মাংসপেশীর প্রোটিনের মিল আছে। সমস্ত স্পাইরিলা ও অর্ধেকের বেশী ব্যাসিলি-র ফ্ল্যাজেলা (flagella) একবচনে flagellum) আছে। এরা সকলেই পানিতে সাঁতার কেটে বেড়াতে পারে (চিত্র ৩)।

অনেক জীবাণুবিদ মনে করেন, পানিতে থাকা স্পাইরিলা যাদের কোষের এক মাথায় কেবলমাত্র একটা ফ্ল্যাজেলাম থাকে, তারা বিবর্তনিক দিক থেকে বেশী প্রাচীন। এই ধরনের ব্যাকটিরিয়া থেকে ক্রম-পরিবর্তনের ফলে উদ্ভব হয়েছে দণ্ডাকৃতি সেসব ব্যাকটিরিয়া যাদের কোষের এক মাথায় মাত্র একটি করে ফ্ল্যাজেলাম থাকে। তারপর উদ্ভব হয়েছে একটি কোষের এক প্রান্তে অনেক-গুলি ফ্ল্যাজেলাযুক্ত ব্যাকটিরিয়া। সব পরে উদ্ভব হয়েছে সেইসব ব্যাকটিরিয়া, যাদের কোষের চারপাশে একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে।

ফ্ল্যাজেলা অনুসারে ব্যাকটিরিয়াকে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়। ফ্ল্যাজে-লার সাহায্যে বহু ব্যাকটিরিয়াকে সনাক্ত করা হয়। যেসব ব্যাকটিরিয়া কোষের এক মাথায় মাত্র একটা ফ্ল্যাজেলাম থাকে তাদের বলা হয় মনোট্রিকাস (Monotrichous)। যেসব ব্যাকটিরিয়া কোষের দুই মাথায় (pole) একটি ক'রে দু'টি ফ্ল্যাজেলাম থাকে তাদের বলে অ্যামফোট্রিকাস (Amphotrichous)। যেসব ব্যাকটিরিয়া কোষের এক মাথায় একাধিক ফ্ল্যাজেলা গুচ্ছাকারে থাকে, তাদের

* এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ক্রোমোজোম আর DNA-কে সব সময় এক করে দেখা উচিত নয়। উচ্চতর প্রাণীদের ডিমের কোষের সাইটোপ্লাজমে DNA থাকে প্রায় তাদের কোষ-কেন্দ্রের DNA থেকে দ্বিগুণ পরিমাণে। সব DNA-কে তাই বংশগতির বাহক হিসাবে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। যদিও এখন DNA-কেই বংশগতির বাহক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।



banglainternet.com

বলা হয় সেফালোট্রিকাস (Cephaltotrichous)। যেসব ব্যাকটিরিয়ার উভয় প্রান্তেই একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে, তাদের বলা হয় লফোট্রিকাস (Lophotri-

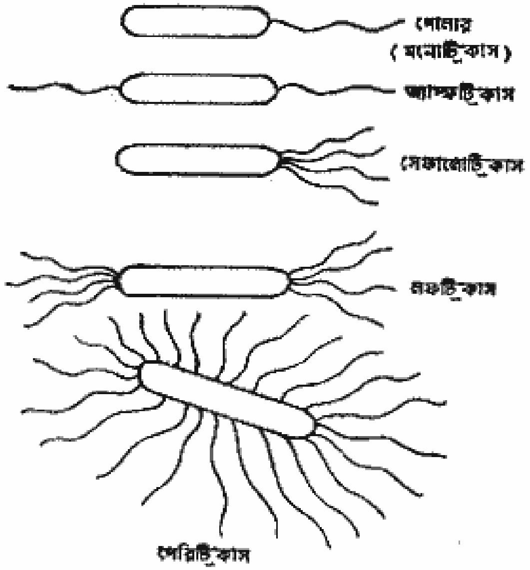


চিত্র ৩ঃ বিভিন্ন প্রকারের ফ্ল্যাজেলা

chous)। আর যেসব ব্যাকটিরিয়া কোষের চতুষ্পার্শ্বে ফ্ল্যাজেলা থাকে, তাদের বলে পেরিট্রিকাস (চিত্র ৩)।

পঞ্চম অধ্যায়

# ব্যাকটিরিয়ার প্রজনন, অস্তিত্ব রক্ষা ও মৃত্যু

উপযুক্ত অবস্থায় ব্যাকটিরিয়া দ্রুত সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির হার জ্যামিতিক। হিসাব ক'রে দেখা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে একটি ব্যাকটিরিয়া-কোষ থেকে প্রতি ১৫-২০ মিনিটে দু'টি ব্যাকটিরিয়া কোষের জন্ম হ'তে পারে। এভাবে বিভক্ত হ'তে থাকলে একটি ব্যাকটিরিয়া-কোষ থেকে ২৪ ঘণ্টায় হ'তে পারে $১০^{২১}$টি ব্যাকটিরিয়া। যার ওজন দাঁড়ায় ৮,০০০ পাউন্ড। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরকম হ'তে পারে না। কারণ, খাদ্যাভাব ও ব্যাকটিরিয়ার দেহক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন পদার্থের জন্য তার বংশবৃদ্ধি হার কমে যায় ও পরে বন্ধ হয়ে যায়। যেমন দুধের মধ্যে যেসব ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া হয়, তারা দুধের চিনি ভেঙে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে। এই অ্যাসিডের পরিমাণ যখন শতকরা ০'৯ ভাগে এসে দাঁড়ায়, তখন খাদ্যাভাব না ঘটলেও এইসব ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া এই অবস্থায় মারা যায় না। এদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে থাকে। যদি সামান্য কিছু ক্ষার পদার্থ যোগ ক'রে এই অম্লতার পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়, তবে তারা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে ও অ্যাসিড উৎপাদন করে।

**প্রজনন পদ্ধতি ঃ** ব্যাকটিরিয়ার প্রজনন বিষয়ে অধিকাংশ গবেষণা হয়েছে দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া নিয়ে। সব ব্যাকটিরিয়া যে ঠিক একই পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে এমন নয়। তাছাড়া সবার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখন পরিষ্কার নয়। ব্যাকটিরিয়ার প্রজনন সম্পর্কে সাধারণত যা বলা হয়, তা প্রধানত দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়ার প্রজনন-পদ্ধতিকে কেন্দ্র ক'রেই বলা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও দু'টি মত চলতি আছে। একটি মত অনুসারে একটি দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়াম দু'ধারে লম্বায় বৃদ্ধি পায় (চিত্র ৪ (ক))। তারপর ধীরে ধীরে আড়াআড়িভাবে মাঝখান থেকে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একে বলা হয় দ্বিভাজন (Binary fission)। অন্য মতটি হলো, প্রথমে ব্যাকটিরিয়ামটি একদিকে লম্বায় বেড়ে উঠে ও তার পেছন দিকটি ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে পুরাতন কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যাকটিরিয়াম-এর দেহ আসলে অনেকগুলি কোষে গঠিত। মাত্র এক মাথার দিককার কোষই প্রজননে অংশ গ্রহণ

banglainternet.com

ক'রে থাকে। ব্যাকটিরিয়াম বিভক্ত হ'বার সময় তার কোষকেন্দ্র লম্বা হয়ে মাঝখান থেকে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই পদ্ধতি, মাইটোসিস (Mitosis) পদ্ধতি থেকে আলাদা। একে বলা হয় প্রত্যক্ষ কোষ-বিভাগ (direct cell division)।

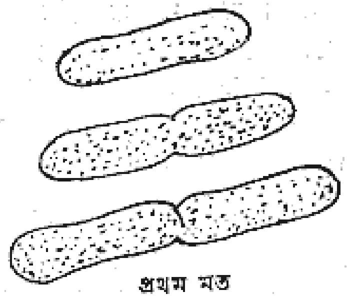

প্রথম মত

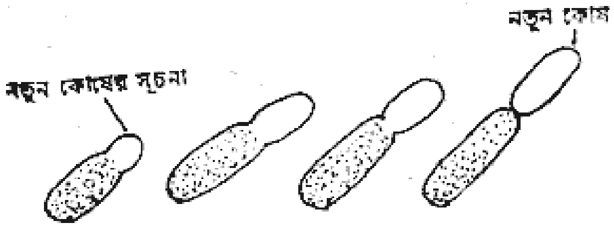


ব্যাকটেরিয়া বিভাজন

দ্বিতীয় মত

চিত্র ৪ (ক): ব্যাকটিরিয়া প্রজনন

অনেক সময় ব্যাকটিরিয়া-কোষ বিভক্ত হ'বার পর একে অপরের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয় না, যুক্ত থাকে (চিত্র ৪ (খ))। গোলাকৃতি যেসব ব্যাকটিরিয়া বিভক্ত হয়ে লম্বা মালার মত আকারে সজ্জিত থাকে তাদের বলা হয় স্ট্রেপটোকক্কাস। যারা ঘনাকার আকারে সজ্জিত থাকে তাদের বলা হয় সারসিনা (Sarcina), যারা আঙ্গুরের থোকার মত সজ্জিত থাকে তাদের বলা হয় স্ট্যাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus)। আর যখন এলো-মেলোভাবে কাছাকাছি ছড়িয়ে থাকে, তখন তাদের বলে মাইক্রোকক্কাস



(Micrococcus)। যে নামগুলো বলা হলো সবই গণবাচক। ব্যাকটিরিয়া বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রায়ই এদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

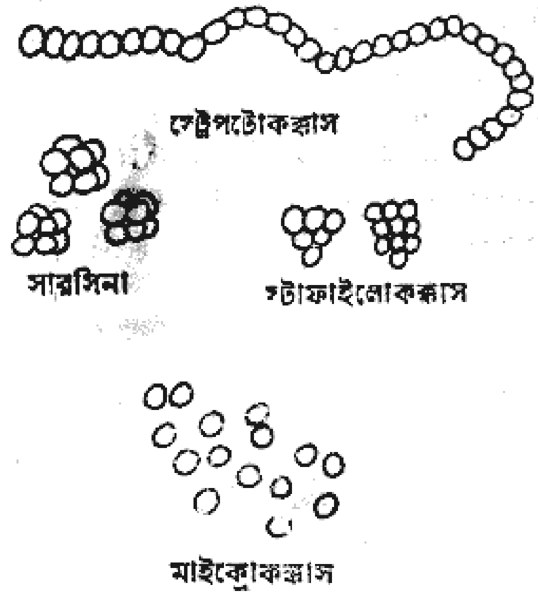


চিত্র ৪ (খ): ব্যাকটিরিয়া-কোষ বিভাগ

**বৃদ্ধির পর্যায়:** নতুন কোন খাদ্য-মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়া প্রথমে বৃদ্ধি পায় না। কিছু পরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তারপর বৃদ্ধির মাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকে। পরে ব্যাকটিরিয়া বৃদ্ধির হার একটা স্থিতি অবস্থায় আসে। এর পরে খাদ্যাভাবে ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যু ঘটতে থাকে। বৃদ্ধির প্রথম অবস্থাকে বলা হয় মন্থর অবস্থা বা ল্যাগ ফেজ (lag phase); তার-পরের অবস্থাকে বলা হয় দ্রুত বৃদ্ধির অবস্থা বা লগ ফেজ (log phase); এর-পরের অবস্থাকে বলা হয় স্থিতাবস্থা বা স্টেশনারি ফেজ (stationary phase); এরপরের অবস্থাকে বলা হয় মৃত্যুর অবস্থা বা লগ ডেথ ফেজ (log death phase); এরপরে যে অবস্থা আসে তাতে ব্যাকটিরিয়ার জন্ম-মৃত্যু একটা স্থিতির পর্যায়ে আসে। এই পর্যাকে বলে অস্তিত্ব রক্ষার অবস্থা বা সারভাইভাল ফেজ (survival phase)। ব্যাকটিরিয়ার বংশ বৃদ্ধিকে সাধারণত লগ-এ

banglainternet.com

(log) প্রকাশ করা হয়। যেসব ব্যাকটিরিয়া কাজে লাগিয়ে মানুষ প্রয়োজনীয় অর্থকরী দ্রব্য উৎপাদন করতে চায়, সেসব ক্ষেত্রে জানা দরকার কোন্ অবস্থায় ব্যাকটিরিয়া সবচেয়ে সক্রিয় থাকে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমস্যা দাঁড়ায়, সব বিষয় উপযুক্ত অবস্থা বজায় রাখা। হিসাব মত লগ ফেজ বের করা যায়। এ থেকে আন্দাজ পাওয়া যায়, কতক্ষণ পরপর ব্যাকটিরিয়ার মাধ্যমে নতুন মাধ্যম যোগ করলে ও পুরাতন মাধ্যমের অংশকে সরিয়ে নিলে ব্যাকটিরিয়ার সর্বোচ্চ সক্রিয়তা বজায় থাকবে। জন্ম ও মৃত্যু হার সমান হবে না। অথবা জন্মের চাইতে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে না। অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়া লগ ফেজ-এ থাকবে।

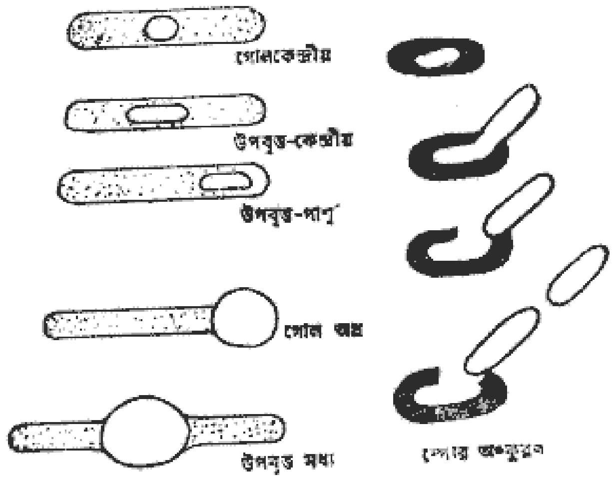


বিভিন্নপ্রকার স্পোর

চিত্র ৫ঃ বিভিন্ন প্রকার স্পোর ও স্পোর অংকুরণ

**স্পোর:** অনেক ব্যাকটিরিয়া যখন প্রতিকূল পরিবেশে পড়ে, তখন তার সাইটোপ্লাজম ঘন হয়ে ওঠে এবং একটি পুরু কোষপ্রাচীর সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ব্যাকটিরিয়া অনেক বেশী তাপ সহ্য করতে পারে। পানির অভাবে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। শুকনো অবস্থায় তারা সুপ্তভাবে বেঁচে থাকতে পারে। ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে এই অবস্থাকে বলা হয় স্পোর। উপযুক্ত আবহাওয়ায় আসলে স্পোরের পুরু আবরণ ফেটে ভিতর থেকে পাতলা

banglainternet.com



আবরণযুক্ত ব্যাকটিরিয়াম বেরিয়ে আসে ও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বংশ-বিস্তার করতে থাকে (চিত্র ৫)।

যেসব ব্যাকটিরিয়া স্পোর উৎপাদন করে কখনো স্পোর তাদের দেহের ঠিক মধ্য অংশে থাকে। কখনো থাকে এক পাশে। কখনো স্পোর হ'বার জন্য ব্যাকটিরিয়া, কোষের মধ্যভাগ অথবা অগ্রভাগ ফুলে ওঠে। কখনো স্পোরের আকৃতি হয় গোল। কখনো আবার ডিম্বাকৃতি (চিত্র ৫)। যে ব্যাকটিরিয়া মানুষের ধনুষ্টংকার রোগের কারণ, তার স্পোর হয় কোষের এক প্রান্তে ও সেই অংশ ফুলে ওঠে। দেখতে দেখায় কতকটা ড্রাম বাজাবার কাঠির গোল মাথার মত।

**ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যু:** ব্যাকটিরিয়া যেহেতু খুব ছোট, তাই তার ক্ষেত্রে মৃত্যু কথাটা কিছু স্বতন্ত্র অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যখন কোন ব্যাকটিরিয়াম স্থায়ীভাবে তার বংশ-বিস্তার ক্ষমতা হারায়, তখন তাকে সাধারণভাবে ধরা হয় মৃত। যখন একদল ব্যাকটিরিয়া স্থায়ীভাবে বংশ-বিস্তারে অক্ষম হয়, তখন তারা ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হ'তে থাকে। এক সাথে সকলে মারা যায় না। ব্যাকটিরিয়া নানা কারণে মারা যায়। খাদ্যবস্তুর অভাব, তাদের আপন দেহক্রিয়াজাত বস্তুর প্রভাব, অন্যান্য জীবাণুদেহ থেকে নিঃসৃত পদার্থ—যথা, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদির জন্য ব্যাকটিরিয়া মারা পড়ে। তবে, খুব কম ক্ষেত্রেই একদল ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে সব ব্যাকটিরিয়া মারা যায়। প্রকৃতিতে সাধারণত একদল ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে সকলে মারা যায় না। সামান্য কিছু সংখ্যক বেঁচে থাকে এবং উপযুক্ত অবস্থায় আবার বংশ-বিস্তার করতে থাকে। অনেক সময় অনেকদিন যাবত পুরাতন ব্যাকটিরিয়ার আবাদে (culture) কিছু সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া বহুদিন ধরে বেঁচে থাকে। এরা যেসব ব্যাকটিরিয়া মারা যেতে থাকে, তাদের দেহ থেকে প্রাপ্ত জৈব পদার্থকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ ক'রে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ এই অবস্থায় কিছু সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া যে হারে মারা যেতে থাকে, ঠিক সেই হারে কিছু সংখ্যক বিভক্ত হয়ে মোটামুটি একটা স্থায়ী জীবিত সংখ্যাকে বজায় রাখে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# ব্যাকটিরিয়ার যৌন-প্রজনন

ব্যাকটিরিয়া সাধারণত অযৌন-পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবার পর উপযুক্ত পরিবেশে একটি ব্যাকটিরিয়া-কোষ সমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'টি কোষে পরিণত হয়। একে বলা হয় বিভাজন পদ্ধতি (binary fisson)। তবে ইসচেরিচিয়া (Escherichia), সিগেলা (Shigella) ও স্যালমোনিলা (Salmonilla) গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের যৌনমিলন ঘটবার কথা জানা আছে। এরা সকলেই গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়া এবং মানুষ ও অন্য প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্রে থাকে। ব্যাকটিরিয়ার যৌন-প্রজনন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী গবেষণা হয়েছে ইসচেরিচিয়া কোলাই (Escherichia coli) নামক ব্যাকটিরিয়া নিয়ে। ইসচেরিচিয়া কোলাই ব্যাকটিরিয়া-কোষে মাত্র একটা ক্রোমোজোম (chromosome) থাকে। এরা লম্বা তন্তুর মত একটি মাত্র বিরাট DNA অণুর দ্বারা গঠিত। ব্যাকটিরিয়া ক্রোমোজোমে কোন প্রোটিন থাকে না। যৌনমিলনের সময় এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া-কোষ থেকে আর এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া-কোষে ক্রোমোজোমের কিছু অংশ যেতে পারে। যৌনমিলনের দিক থেকে ব্যাকটিরিয়া-কোষদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের কোষকে বলা হয় দাতা (donar) আর অন্য ধরনের কোষকে বলা হয় গ্রহিতা (receptor)। কেবলমাত্র দাতা কোষ থেকে DNA গ্রহিতা কোষে যেতে পারে। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে ফটো তুলে দেখান সম্ভব হয়েছে যে দাতা কোষ ও গ্রহিতা কোষ পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে এবং তাদের মধ্যে সাইটোপ্লাজমের যোগসূত্র সৃষ্টি হয়। কি পরিমাণ DNA দাতা কোষ থেকে গ্রহিতা কোষে যাবে তা নির্ভর করে কোষ দু'টি কতক্ষণ একে অপরের সঙ্গে লেগে থাকে তার উপর।

### মেরোজায়গোট

ব্যাকটিরিয়া-কোষে [illegible] মাত্র একটা করে ক্রোমোজোম থাকে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে থাকে জোড়ায় জোড়ায়। যখন জনন-কোষ (sex cell) উৎপন্ন হয়, তখন তা গঠিত হয় বিয়োজন বিভাজনের (reduction division) ফলে। বিয়োজন বিভাজন ফলে সৃষ্টি হয় বলে জনন-কোষে সব সময় থাকে

banglainternet.com



দেহ কোষের মধ্যে যে সংখ্যার ক্রোমোজোম থাকে তার অর্ধেক (haploid)। স্ত্রী ও পুরুষ জনন-কোষ যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে কোষ গঠিত হয়, তাকে বলা হয় জায়গোট (zygote)। জায়গোটে ক্রোমোজোম সংখ্যা দাঁড়ায় প্রত্যেক প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ কোষের সমান (diploid)। যেমন মানুষের জনন-কোষে থাকে ২৩ করে ক্রোমোজোম। স্ত্রী-পুরুষের জনন-কোষের মিলনের ফলে যখন মানুষের জায়গোট উৎপন্ন হয় তখন তাতে স্ত্রী কোষ থেকে ক্রোমোজোম আসে ২৩টি আর পুরুষ কোষ থেকে আসে ২৩। মোট ক্রোমোজোম সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬টি। মানুষের দেহকোষে থাকে ছেচল্লিশটি ক্রোমোজোম। সাধারণত বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা থাকে সুনির্দিষ্ট। ব্যাকটিরিয়া-কোষে ক্রোমোজোম থাকে একটি। যৌনমিলনের সময় এই একটি ক্রোমোজোমের কিছু অংশ দাতা কোষ থেকে যেতে পারে গ্রহিতা কোষে। এ ক্ষেত্রে ঠিক জায়গোট (Zygote) গঠিত হয় না। যা গঠিত হয়, তাকে উল্লেখ করা হয় মেরোজায়গোট (Merozygote) বা অর্ধ জায়গোট হিসাবে। মেরোজায়গোটের মধ্যে প্রথমে দাতা কোষ থেকে যে অংশ যায়, তা গ্রহিতা কোষের ক্রোমোজোমের পাশাপাশি অবস্থান করে বলে মনে হয়। এদের মধ্যে পরে সম্ভবত জোড়া লেগে একটা ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়। ঠিক কি ঘটে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখন খুব সুনির্দিষ্ট হতে পারেনি।

### পিলি (Pili)

অনেক গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়া কোষে ছোট লোমের মত অবয়ব থাকে। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের ছবিতে এদের দেখা যায়। এদের বলা হয় পিলি (pili একবচনে pilus)। পিলি অতি সূক্ষ্ম নলের মত। এখন ধারণা করা হয়, ব্যাকটিরিয়ার যৌনমিলনে পিলির বিশেষ ভূমিকা থাকা সম্ভব। সম্ভবত পিলির মধ্য দিয়ে দাতা কোষ থেকে DNA গ্রহিতা কোষে প্রবেশ করে। দাতা কোষ থেকে কেবল যে ক্রোমোজোমের অংশ গ্রহিতা কোষে যেতে পারে তাই-নয়। সম্ভবত প্লাজমিড (plasmid)-রাও যায়। প্লাজমিডরাও ব্যাকটিরিয়া-কোষের অংশ বিশেষ বহন করে নিয়ে যেতে পারে। ঘটনাটা ঘটে কতকটা ট্রান্সডাকসনের (transduction) মত।

প্লাজমিডরা কণিকা বস্তু। এরা ব্যাকটিরিয়ার সাইটোপ্লাজমে থাকে। এরা মূলতঃ DNA দ্বারা গঠিত হলেও, ব্যাকটিরিয়া ক্রোমোজোমের অংশ নয়। প্লাজমিডরা এক ব্যাকটিরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটিরিয়া-কোষে যাবার সময় ব্যাকটিরিয়

ক্রোমোজোমের কিছু অংশ বহন করে নিয়ে যেতে পারে। প্লাজমিডরা এভাবে দাতা কোষের বংশগত গুণ গ্রহিতা কোষে স্থানান্তরিত করতে পারে। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে তার কোন ঔষধ প্রতিরোধ ক্ষমতা (drug resistant factor) অন্য কোষে স্থানান্তরিত করে সেই কোষকে বিশেষ ঔষধ-রোধক (drug-resistant) করে তোলে।

## জীব-রাসায়নিক মিউট্যান্ট

ব্যাকটিরিয়ার যৌন-মিলন সম্পর্কে প্রথম জানা যায় ব্যাকটিরিয়ার জীব-রাসায়নিক মিউট্যান্ট (biochemical mutant) নিয়ে গবেষণা থেকে। মিউ-টেশন (mutation) বলতে বোঝায়, বংশধারায় আকস্মিক পরিবর্তন।* যেমন কোন ব্যাকটিরিয়া কোন বিশেষ এনজাইম উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু কোন আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে দেখা গেল ঐ ব্যাকটিরিয়া-কোষ আর তা উৎপাদন করতে পারছে না এবং ঐ কোষ থেকে উৎপাদিত কোষেরাও পারছে না বিশেষ এনজাইমটি উৎপাদন করতে। মিউট্যান্ট (mutant) বলতে বোঝায় কোন আচমকা বংশগত (inheritable) পরিবর্তন আসবার ফলে উদ্ভূত বংশধর। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাকটিরিয়া-কোষে আপনা থেকে কিছু মিউটেশন ঘটতে পারে। যার হার বেশী নয়। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে ব্যাকটিরিয়া-কোষে অনেক অধিক হারে মিউটেশন ঘটান চলে। যেমন যদি ব্যাকটিরিয়ার উপর এক্স-রে অথবা আলট্রাভায়োলেট-রে সম্পাত করা যায়, তবে দেখা যায় অধিক হারে মিউ-টেশন ঘটতে। মাস্টার্ড গ্যাসের (mustard gas) সাহায্যেও ব্যাকটিরিয়া ও অন্য জীবাণু কোষে মিউটেশন ঘটান যায়। ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে মিউটেশন ঘটিয়ে বংশগতি সম্বন্ধে প্রথম বিশেষভাবে গবেষণা করেন জীব-রাসায়নিক (biochemist), টেটাম (tatum) ও তাঁর ছাত্র জসুয়া লেডের বার্গ (Leder berg)। তাঁরা গবেষণা করেছিলেন, ইসচেরিচিয়া কোলাই K-12 (Escherichia coli K-12), ব্যাকটিরাম নিয়ে। এই ব্যাকটিরিয়াম মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। সাধারণ অবস্থায় এই ব্যাকটিরিয়াম নিজের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সব ভাইটামিন ও অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপাদন করে। বাইরে থেকে গ্রহণ করতে হয় না। এই ব্যাকটিরিয়ামকে গ্লুকোজ ও অজৈব লবণযুক্ত আবাদ মাধ্যমে সহজেই চাষ করা চলে। কিন্তু

* মিউটেশন শব্দের বাংলা অনেকে করেন 'পরিব্যক্তি'।



মিউটেশন ঘটালে এই ব্যাকটিরিয়ামের অনেক কোষ একাধিক ভাইটামিন ও অ্যামোইনো অ্যাসিড উৎপাদনের ক্ষমতা হারায়। ফলে এসব কোষকে চাষ (culture) করতে হলে আবাদ মাধ্যমে (culture media) বিভিন্ন ভাইটামিন ও অ্যামাইনো অ্যাসিড যোগ করতে হয়। এরকম মিউট্যান্টকে বলে অক্সোট্রপ (Auxotroph)।

টেটাম ও লেডের বার্গ প্রথমে দুটি বিশেষ অক্সোট্র নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁরা সাধারণত দেখেন ইসচেরিচিয়া কোলাই K-১২ থেকে উৎপাদিত একটি মিউট্যান্ট আবাদ মাধ্যমে ভাইটামিন বায়োটিন ( biotin ) ও অ্যামাইনো অ্যাসিড মেথিওনাইন ( metheonine ) যোগ না করলে বাঁচতে পারে না এবং আর একটি মিউট্যান্ট প্রয়োজন করে অ্যামাইনো অ্যাসিড থ্রোয়োনাইন ( threonine) এবং লিউসিন ( leucine )। কিন্তু যদি এই দুই প্রকার মিউট্যান্টকে একত্র মিশ্রিত করে এমন আবাদ মাধ্যমে চাষ করা হয়, যাতে এসব যৌগ পদার্থ যোগ করা হয়নি, তা হলে দেখা যায় কিছু কোষ বেঁচে থাকছে এবং বংশ বৃদ্ধি করতে পারছে। এদের জন্য আবাদ মাধ্যমে বায়োটিন, মেথিওনাইন, থ্রোয়োমাইন ও লিউসিন যোগ করতে হচ্ছে না। টেটাম ও লেডের বার্গ হিসাব করে দেখান, দুই প্রকার ইসচেরিচিয়া কোষের মধ্যে যৌনমিলন ঘটছে বলেই এরকম বংশধারার উদ্ভব সম্ভবপর হচ্ছে। তাঁরা তাঁদের বিখ্যাত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন ১৯৪৬ সালে। কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব বেশি প্রজাতির (species) ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে যৌনমিলন ঘটবার কথা জানা যায়নি। টেটাম ও লেডের বার্গ তাঁদের বিখ্যাত পরীক্ষায় প্রত্যেক প্রকার ইসচেরিচিয়া কোষ প্রায় ১০০০০০০০০ করে মিলিয়ে আবাদ করেন। এই মিশ্র আবাদের (mixed culture) মধ্যে যৌনমিলনের ফলে ১০০ থেকে ২০০-র মত কোষের উদ্ভব হয়, যারা উভয় প্রকার মিউট্যান্টের মিলিত গুণের পরিচয় প্রদান করে। প্রকৃতিতে এই যৌনমিলনের হার কি হতে পারে অর্থাৎ যৌনমিলন হার কি হারে ঘটে, তা এখনও হয়ে আছে অনুসন্ধানের বিষয়।

banglainternet.com

সপ্তম অধ্যায়

# ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধিতে পরিবেশের প্রভাব

**অক্সিজেন :** দেহক্রিয়ার দিক থেকে ব্যাকটিরিয়া নানাভাবে বৈশিষ্ট্যময়। অনেক ব্যাকটিরিয়া আছে, যারা বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন (অথবা পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন) ছাড়া বাঁচে না। এদিক থেকে এদের দেহক্রিয়া আমাদের মত। এরা বাতাসের অক্সিজেন-এর সাথে দেহের শর্করা পদার্থের সংযোগ ঘটিয়ে যে শক্তি লাভ করে, তার সাহায্যে দেহকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি লাভ করে। এসব ব্যাকটিরিয়াকে বলা হয় বায়ুজীবী (aerobes)। অনেক ব্যাকটিরিয়া আছে যারা মুক্ত অক্সিজেন (molecular oxygen) ছাড়া বাঁচে না। কিন্তু অক্সিজেন প্রয়োজন এদের খুব কম। যেখানে বাতাসে বেশী অক্সিজেন থাকে সেখানে এরা বাড়তে পারে না। এদের বলা হয় স্বল্প বায়ুজীবী (microaerophile)। কিন্তু অল্পসংখ্যক ব্যাকটিরিয়া আছে যারা বাতাসের মুক্ত অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে নির্জীব হয়ে পড়ে অথবা মারা যায়। এদের বলা হয় সীতাকীর্ণ অ-বায়ুজীবী (strict anaerobes)। একদল ব্যাকটিরিয়া আছে, যারা বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারে। আবার অক্সিজেন ছাড়াও বাঁচতে পারে। অনেকে আবার অক্সিজেন প্রয়োজন করে না। কিন্তু মুক্ত অক্সিজেনে মারা যায় না বা নির্জীব হয়ে পড়ে না। এদের সকলকে একত্রে বলা হয় সুবিধাবাদী অ-বায়ুজীবী (facultative anaerobe)। অনেক সময় যেসব ব্যাকটিরিয়া মুক্ত অক্সিজেন সামান্য পরিমাণে সহ্য করতে পারে, কিন্তু বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজন করে না, তাদের বলা হয় বায়ুসহক (aerotolarent)। অর্থাৎ অক্সিজেন-এর প্রয়োজন অনুসারে ব্যাকটিরিয়াকে প্রায় পাঁচভাগে ভাগ করা চলে।

**খাদ্য :** পুষ্টির (nutrition) দিক থেকে ব্যাকটিরিয়া প্রথমত দুটি দলে পড়ে। যেসব ব্যাকটিরিয়া তাদের পুষ্টির জন্য কোন জৈব পদার্থের (organic) উপর নির্ভরশীল নয়, তাদের বলা হয় অটোট্রফিক (autotrophic)। এরা অজৈব পদার্থ থেকে এদের খাদ্যবস্তু উৎপাদন করতে পারে। এমনকি এদের অনেকে জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে না। কিন্তু অন্য আর এক দল ব্যাকটিরিয়া (এরাই সংখ্যায় বেশী) তাদের পুষ্টির জন্য জৈব পদার্থের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এদের বলা হয় হিটেরোট্রফিক (heterotrophic)।



হিটেরোট্রফিক ব্যাকটিরিয়া আবার দু'দলে বিভক্ত করা যায়। যারা মৃত জৈব বস্তুকে কেন্দ্র করে বাঁচে, তাদের বলা হয় মৃতজীবী বা স্যাপ্রোফাইট (saprophyte)। আর যারা সাধারণত জীবন্ত অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে, তাদের বলা হয় পরজীবী (parasite)। প্রাণী ও উদ্ভিদের বহু রোগের কারণই হ'ল পরজীবী জীবাণু। পরজীবী জীবাণুর গবেষণা নিয়ে প্রথম জীবাণুতত্ত্বের আরম্ভ হয়। তাই অনেকে জীবাণুতত্ত্ব শব্দটি শুনে মনে করেন চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যাপার।

অটোট্রফিক ব্যাকটিরিয়া প্রধানত কিমোসিনথেটিক (cemosynthetic)। কিমোসিনথেটিক বলতে বোঝায়, যারা অজৈব জৈব পদার্থকে জারিত (oxidise) ক'রে শক্তি লাভ করে ও সেই শক্তির সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করে।

কিছু সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া আছে যারা সূর্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করতে পারে। এদের দেহে গাছের সবুজ বর্ণের অনুরূপ কণিকা আছে। যদিও এই কণিকারা অবিকল গাছের সবুজ কণিকাদের মত নয়। এসব ব্যাকটিরিয়াকে বলা হয় সালোক-সংশ্লেষক (photosynthetic)। কিন্তু এই সালোক-সংশ্লেষণ পদ্ধতি অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে মুক্ত অক্সিজেন ছাড়া পায় না। ফটোসিনথেটিক ব্যাকটিরিয়াকে আবার ভাগ করা যায় দু'ভাগে। এদের একদলকে বলা হয় ফটোলিটোট্রফিক (photolitropic)। এদের ক্ষেত্রে ফটোসিনথেসিস-এর জন্য প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন আসে হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$) থেকে। অন্যদলকে বলা হয় ফটোঅরগানোট্রফিক (photoorganotrophic)। এক্ষেত্রে ফটোসিনথেসিস-এর জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আসে জৈব পদার্থ (organic substance) থেকে।

**উত্তাপ :** উত্তাপের উপর ব্যাকটিরিয়ার দেহক্রিয়া নানাভাবে নির্ভরশীল। তাপমাত্রার প্রয়োজনের দিক থেকে ব্যাকটিরিয়া মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত। যেসব ব্যাকটিরিয়া ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পেতে পারে, তাদের বলা হয় সাইক্রোফিলিক (psychrophilio) বা ঠাণ্ডাপ্রিয়। এরা ০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা থেকে ২৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পেতে পারে। এরা রেফরিজিরেটর-এর মধ্যে কম উত্তাপেও হ'তে পারে। রেফরিজিরেটরে এরা ৪° থেকে থেকে ১০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সংখ্যায়ও যথাযথ বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু সাধারণত ২০° থেকে ২৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

banglainternet.com

যেসব ব্যাকটিরিয়া ২০° থেকে ৪৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পেতে পারে। যাদের যথাযথ বৃদ্ধির (optimum) জন্য প্রয়োজন হয় ৩০° থেকে ৩৭° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা, তাদের বলে মধ্যতাপপ্রিয় বা মেজোফিলিক (mesophilic)। আমাদের দেহের সাধারণ উত্তাপ মাত্র ৩৭° সেন্টিগ্রেড। তাই যেসব ব্যাকটিরিয়া আমাদের রোগ-উৎপাদক তারাও এই দলে পড়ে। অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া মধ্যতাপপ্রিয়।

কিছু সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া আছে যারা তাদের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য খুব বেশী তাপমাত্রার প্রয়োজন করে। এরা সাধারণত ৫০° থেকে ৫৫° সেন্টিগ্রেডে, ভালভাবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অনেকে ৭০° সেন্টিগ্রেডেও বৃদ্ধি পায়। এসব ব্যাকটিরিয়া ৪৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার নীচে বৃদ্ধি পেতে পারে না।* এইসব ব্যাকটিরিয়াকে বলা হয় উত্তাপপ্রিয় বা থারমোফিলিক (thermophilic)। উত্তাপপ্রিয় ব্যাকটিরিয়া এত উত্তাপে কিভাবে বাঁচে ও দেহক্রিয়া চালিয়ে যায় তা' এক বিস্ময়। অনেক সময় শুকনো ঘাসের স্তূপে হঠাৎ আগুন লাগে। এর কারণ থারমোফিলিক ব্যাকটিরিয়া। এদের ক্রিয়ায় যে তাপের সৃষ্টি হয়, তা' শুকনো ঘাসের পাজায় আগুন লাগাতে যথেষ্ট। অনেক সময় পাটের গাঁটে আগুন লাগবার জন্যেও থারমোফিলাস ব্যাকটিরিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়।

**অম্লতা (Acidity):** পরিবেশের অম্লতা (acidity) ও ক্ষারতার (alkalinity) উপর ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কোন দ্রবণের অম্লতা ও ক্ষারতার পরিমাণ সাধারণত ব্যক্ত করা হয় pH-এর সাহায্যে। pH বলতে বোঝায় কোন দ্রবণের মধ্যে কি পরিমাণ হাইড্রোজেন-আয়ন (hydrogen ion) আছে। বিশুদ্ধ পানি অম্ল ও ক্ষারের দিক থেকে নিরপেক্ষ (neutral)। সাধারণত বিশুদ্ধ পানিতে ২৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন-আয়ন ও হাইড্রক্সিল-আয়নের গুণফল হ'ল ১০$^{-১৪}$। এই অবস্থায় হাইড্রোজেন-আয়নের পরিমাণ ১০$^{-৭}$ ও হাইড্রক্সিল-আয়নের পরিমাণ ১০$^{-৭}$। আমরা যখন বলি কোন জিনিসের pH পরিমাণ তখন, আমরা হাইড্রক্সিল-আয়নের কথা ধরি না। কেবল বোঝাতে চাই হাইড্রোজেন আয়নের কথা।

* ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বলতে সাধারণত বোঝায় সংখ্যায় বৃদ্ধি। কোন অবস্থায় যখন ব্যাকটিরিয়া সংখ্যায় সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে বলা হয় উপযুক্ত (optimum) অবস্থা। কোন তরল খাদ্য-মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকলে, তা ঘোলা হয়ে ওঠে। এই ঘোলার পরিমাণ ও সময় থেকে সহজেই বৃদ্ধির হার বোঝা যায়।



পানিতে অ্যাসিড যোগ করলে হাইড্রোজেন-আয়নের মাত্রা বাড়ে। অ্যালকালি যোগ করলে হাইড্রোজেন-আয়নের মাত্রা কমে এবং হাইড্রক্সিল-আয়নের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু উভয়ের গুণফল সমান থাকে। তাই পানিতে অ্যাসিড বা অ্যালকালির লঘু দ্রবণের (solution) অম্লতা ও ক্ষারতা মাপবার জন্য pH পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। pH মাপকাঠি (scale) হ'ল ০ থেকে ১৪ পর্যন্ত।* pH বলতে বোঝায় হাইড্রোজেন-আয়নের নেগেটিভ লগ (negative log)। হাইড্রোজেন আয়নের মাত্রা বাড়লে pH কমে। হাইড্রোজেন আয়নের মাত্রা কমলে pH-এর পরিমাণ বাড়ে। ব্যাকটিরিয়া সাধারণত pH ৬·৫ থেকে ৭·৫ মধ্যে ভাল হয়। অনেক ব্যাকটিরিয়া আছে যারা অম্ল-মাধ্যমেও হ'তে পারে। আমাদের রক্ত কিছুটা ক্ষারপ্রবণ। তাই, যেসব ব্যাকটিরিয়া আমাদের দেহের রক্তের মধ্যে হ'তে পারে, তারা সামান্য ক্ষারপ্রবণ। যেসব ব্যাকটিরিয়া আমাদের রোগ ঘটায় তারা সবাই ক্ষারপ্রবণ।

ব্যাকটিরিয়ার দেহক্রিয়া আরো অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। যেমন, তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান বা সারফেস টেনসন (surface tension)। সাবানের সংস্পর্শে এসে অনেক জীবাণু মরে যায়। কারণ, সাবান পানির পৃষ্ঠটান হ্রাস করে এবং এসব জীবাণু এই অবস্থায় বাইরের চাপের অভাবে ভেতরের চাপে ভেঙ্গে পড়ে। সব ব্যাকটিরিয়া সামান্য পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) গ্যাস তাদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন করে। তাই, যদি কোন স্থানে কার্বন ডাই-অক্সাইড একদম না থাকে, তবে সেখানে ব্যাকটিরিয়া হ'তে পারে না।

দ্রবণের (solution) অবস্থার উপর ব্যাকটিরিয়া বৃদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কোন দ্রবণের আস্রবণ চাপ (osmotic pressure) বেশী হ'লে তার মধ্যে ব্যাকটিরিয়া হ'তে পারে না। কারণ, এই দ্রবণের মধ্যে ব্যাকটিরিয়া-দেহ থেকে তরল পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসে। পানি ও খাদ্যবস্তু ভিতরে যেতে পারে না। সমুদ্রের নীচে কাদার মধ্যে যেসব ব্যাকটিরিয়া থাকে, তারা সমুদ্রের পানির অত্যধিক চাপে অভ্যস্ত। এইসব ব্যাকটিরিয়া যদি ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমউপায়ে আবাদ (culture) করতে হয়, তবে এদের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন করে। অনেক ক্ষেত্রে এই চাপের মাত্রা দাঁড়ায় প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১২,০০০ পাউন্ড। এইসব অতি চাপপ্রিয় ব্যাকটিরিয়াকে বলা হয় বারোফিলিক (barophilic)।

* অবস্থা বিশেষে pH কখন 0 কম ও ১৪ বেশী হতে পারে। কিন্তু জীবাণুতত্ত্বের ক্ষেত্রে এ ধরনের pH মাত্রার সম্মুখীন হতে হয় না।

banglainternet.com

কোন জীবই পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। কেবল পানির মাধ্যমেই অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়ার দেহে সর্বপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলে। পানির আপেক্ষিক উত্তাপ (specific heat) খুব বেশী। এই কারণে ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবদেহে জারণ (oxidation) প্রক্রিয়ার সময় যে তাপ উৎপন্ন হয়, তা যে জায়গায় জারণ ঘটে তার তাপমাত্রাকে খুব বেড়ে যেতে দেয় না। সাধারণ খাদ্য মাধ্যমে যে পরিমাণ পানি থাকে, তাই ব্যাকটিরিয়া বৃদ্ধির জন্য সাধারণত হয় উপযুক্ত।

যেহেতু পানির সরবরাহ কম হলে অধিকাংশ জীবাণু বৃদ্ধি পেতে পারে না, তাই অনেক খাদ্যদ্রব্য রোদে শুকিয়ে রাখলে, তাতে পচন ধরে না। কারণ, উপযুক্ত পানির অভাবে এদের মধ্যে জীবাণুরা বৃদ্ধি পেতে পারে না।

দ্রবণের অবস্থার উপর ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুদের বৃদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। যথেষ্ট পানি থাকলেও তার মধ্যে যদি অন্য বস্তু দ্রবীভূত থাকে, যেমন বিভিন্ন প্রকার লবণ ও চিনি, এবং তার ফলে ঐ দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ হয় কোষের ভিতরকার অভিস্রবণ চাপ অপেক্ষা বেশী, তবে ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু বৃদ্ধি পেতে পারে না। তাদের ক্ষেত্রে ঘটে প্লাজমোলাইসিস (plasmolysis)। অর্থাৎ কোষের ভিতর থেকে পানি বাইরে বেরিয়ে আসে এবং প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে যায়। এখানে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য অনেক ক্ষেত্রে চিনির গাঢ় দ্রবণ এবং অনেক ক্ষেত্রে লবণ ব্যবহার করা হয়। অধিক লবণ অবশ্য এমনিতেও জীবাণুদের জন্য ক্ষতিকর।

অষ্টম অধ্যায়

# জীবাণু নিধন ও অপসারণের উপায়

বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে মৃত্যু একটি অনিবার্য ঘটনা। বহুকোষী জীব, কোন দুর্ঘটনা না ঘটলেও চিরদিন বাঁচে না। এক সময় সে আপনা থেকেই মারা যায়। কিন্তু এককোষী জীবদের ক্ষেত্রে তা হয় না। একটা ব্যাকটিরিয়া-কোষ উপযুক্ত পরিবেশে বিভক্ত হয়ে পরিণত হয় ২টি ব্যাকটিরিয়া-কোষে। দুটি ব্যাকটিরিয়াকোষ পরিণত হয় ৪টিতে। এভাবে জ্যামিতিক হারে ওদের বংশধারা বেড়ে চলে। উপযুক্ত পরিবেশে ওরা কখনও মরে না। কেবলই বিভক্ত হয়ে বংশ-বিস্তার করে চলে।*

ব্যাকটিরিয়া ও অন্য জীবাণুদের তাই মেরে ফেলতে হলে সৃষ্টি করতে হয় প্রতিকূল পরিবেশ। কেবল পরিবেশকে তাদের বেঁচে থাকবার অনুপযোগী করে তুলেই তাদের মেরে ফেলা যায়।

## জীবাণু নিধনের রাসায়নিক উপায়

১। **অ্যান্টিসেপটিক** ঃ অনেক দ্রব্য আছে যা ব্যাকটিরিয়াদের সরাসরি মেরে ফেলে না। কিন্তু তাদের বংশ বিস্তার বন্ধ করে। এদের উপস্থিতিতে ব্যাকটিরিয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে পারে না। এ ধরনের দ্রব্যকে বলা হয় অ্যান্টিসেপটিক (antiseptic)। অ্যান্টিসেপটিক বলতে আগে বোঝাত পচন-নিবারক দ্রব্য। শব্দটি বৃটিশ শল্যচিকিৎসক লিস্টার প্রচলিত করেন (১৮৬৭)। তিনি দেখান, যদি ক্ষতস্থানে ফিনল প্রয়োগ করা যায় তবে জীবাণুরা বৃদ্ধি পেয়ে পচা ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে না। ফিনল ($C_6H_5OH$) ব্যবহারের ফলে শল্য-চিকিৎসার বিবাদ বহুলভাবে কমে যায়।

২। **ডিজইনফেকট্যান্ট বা জীবাণুধারক** ঃ ডিজইনফেকট্যান্ট বলতে বোঝায় সেই সব বস্তুকে যারা সরাসরি জীবাণুদের মেরে ফেলে। একই বস্তু অল্প

* বহুকোষী প্রাণীর এক বা একাধিক কোষকে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে চাষ করলে তারাও জীবাণুদের মত আচরণ করে। তারা বেঁচে থাকে—যতক্ষণ না পরিবেশ প্রতিকূল হয়। কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে বহুকোষী জীবের কোষকে বাঁচিয়ে রাখাকে বলা হয় টিস্যু কালচার (Tissue culture)।



banglainternet.com

মাত্রায় প্রয়োগ করলে অ্যান্টিসেপটিক ও কিছু বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলে ডিজইনফেকট্যান্ট হিসাবে কাজ করতে পারে। কতগুলি বহুলভাবে ব্যবহৃত সাধারণ ডিজইনফেকট্যান্ট হলো : কসটিক সোডা (NaOH), সাবান, মারকিউরিক ক্লোরাইড ($HgCl_2$), পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$), ফরমালডিহাইড ( HCHO ), পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ( $K_2Cr_2O_7$ ), ক্লোরিন ও চুন। এদের সাহায্যে জীবাণুদের মেরে ফেলা চলে। জীবাণুদের উপর বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু বিভিন্নভাবে কাজ করে। সব ডিজইনফেকট্যান্ট সব জীবাণুর উপর সমানভাবে কার্যকর নয়। অনেক ব্যাকটিরিয়া স্পোর ( spore ) অবস্থায় অনেক ডিজইনফেকট্যান্টের প্রভাবে মারা যায় না। যেমন শতকরা ৭০ ভাগ ইথাইল অ্যালকোহলে অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া মারা যায়। কিন্তু ক্লসট্রিডিয়াম স্পোরোজেনাস (clostridium sporogens)-এর স্পোর অ্যালকোহলে ৪৬ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবার কথা জানা আছে। ডিজইনফেকট্যান্টের কার্যকারিতা নির্ভর করে জীবাণুদের বৈশিষ্ট্যের উপর; ডিজইনফেকট্যান্ট-এর বৈশিষ্ট্যের উপর; ডিজইনফেকট্যান্ট কতক্ষণ পর্যন্ত জীবাণুর সংস্পর্শে থেকেছে তার উপর এবং কি সংখ্যক জীবাণু আছে তার উপর। কারণ, সীমাহীন মাত্রায় ডিজইনফেকট্যান্ট ব্যবহার করা যায় না। জীবাণুর সংখ্যা খুব বেশী থাকলে, কোন বিশেষ মাত্রায় প্রয়োগ করা ডিজইনফেকট্যান্ট তাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারে না। ডিজইনফেকট্যান্ট প্রয়োগে তাই অধিকাংশ সময়েই সব জীবাণু মারা যায় না। কিছু জীবাণু থেকে যায়।

বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য জীবাণুদের উপর বিভিন্নভাবে কাজ করে। মারকারি (পারা) ঘটিত যৌগ সাধারণতঃ এনজাইমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের অকার্যকর করে তোলে। যেসব এনজাইমে SH জোট থাকে, মারকারি (Hg) তার SH জোটের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়। অনেক বস্তু জীবাণু কোষের কোন অংশকে বা গোটা কোষকে ভেঙে ফেলে। এর ফলেও জীবাণুর মৃত্যু ঘটে। অ্যালকোহল প্রোটিনকে স্থায়ীভাবে দলা পাকিয়ে দেয়। প্রোটিনকে এরকম দলা পাকিয়ে (coagulation) দেবার জন্য ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু মারা যায়। কোন কোন ডিজইনফেকট্যান্ট কোষ আবরণের ক্ষতি সাধন করে। ফলে অসমোসিস ঘটতে পারে না।

ডিজইনফেকট্যান্টের আর এক নাম জার্মিসাইড (germicides)।

৩। কিমোথেরাপী : মানুষের শরীরে মানুষের তৈরী রাসায়নিক দ্রব্য এবং অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে রোগ জীবাণু মেরে ফেলে চিকিৎসা করাকে বলা

banglainternet.com



হয় কিমোথেরাপী। যে সব দ্রব্য জীবাণু মারবার জন্য অথবা তাদের বংশবিস্তার রোধ করবার জন্য ব্যবহার করা হয় তারা জীবাণুদের জন্য ক্ষতিকর হলেও মানুষের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। কিমোথেরাপী জীবাণুজনিত রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমরা এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করবো।

## জীবাণু নিধনের দৈহিক উপায়

১। **আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি :** আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির জীবাণু নিধন ক্ষমতা খুব বেশী। বেগুনী আলোর চাইতে এই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম। আমাদের চোখে এই আলোক-তরঙ্গ ধরা পড়ে না। ২৬৫ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে অধিকাংশ জীবাণু মারা যায়। প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি শোষণ করে। এর ফলে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। এনজাইম তার সক্রিয়তা হারায়। ফলে ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুদের মৃত্যু হয়। আলট্রা ভায়োলেট ল্যাম্প কিছুক্ষণ জ্বালিয়ে রেখে একটা ঘরের বাতাসে ভাসমান জীবাণুদের মেরে ফেলা সহজ। কিন্তু আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি সর্বত্র যেয়ে পৌঁছতে পারে না। তাই এর সাহায্যে সবকিছু পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত করা চলে না। হাসপাতালের অস্ত্রোপচার কক্ষে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে বাতাস ও জিনিসপত্রের উপরিভাগ এখন জীবাণুমুক্ত করবার চেষ্টা করা হয়। আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি মানুষেরও ক্ষতি করতে পারে। তাই মানুষের দেহে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি যাতে সরাসরি এসে না লাগে তার ব্যবস্থা থাকতে হয়।

২। **আয়ন উৎপাদক বিকিরণ (Ionizing rays) :** অনেক বস্তু আছে যাদের উত্তাপের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করা যায় না। কারণ, তারা তাপ প্রয়োগে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন প্লাস্টিকের সিরিঞ্জ। এরকম বস্তুকে আয়ন উৎপাদক বিকিরণের সাহায্যে সহজেই জীবাণুমুক্ত করা যায়। আয়ন উৎপাদক বিকিরণ মানুষের জন্যও ক্ষতিকর। কিন্তু, এখন এক ধরনের মোড়ক প্লাস্টিক বাজারে পাওয়া যায়। যার মধ্যে জিনিসপত্র রেখে সহজেই নিরাপদে তাদের জীবাণুমুক্ত করা চলে। সাধারণতঃ দুই ধরনের বিকিরণ (radiation) ব্যবহার করা হয়। গামা রশ্মি এবং খুব উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন প্রবাহ।

গামা রশ্মি পাওয়া যায় কোবাল্ট ৬০ (cobalt 60) থেকে। আর ইলেকট্রন ধারাপ্রবাহ সৃষ্টি করা হয় লিনিয়ার অ্যাক্সিলেটরের ( linear accelator ) সাহায্যে।

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে জীবাণু যত ছোট হয়, তাদের মেরে ফেলবার জন্য বিকিরণের প্রয়োজন হয় তত বেশী।

৩। **সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ** (Ultrasonic Vibration) : সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ আমরা কানে শুনতে পাই না। এদের কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেন্ডে ৩০,০০০ অথবা তারও বেশি। তরল পদার্থের মধ্যে যদি এরকম কম্পন সৃষ্টি করা যায়, তবে সেই কাঁপুনির ফলে তরল পদার্থের মধ্যে ভাসমান জীবাণুদের কোষ ভেঙে পড়তে থাকে। নিকেল দণ্ড অথবা কোয়ার্টজ (quatz) ক্রিস্টালের সাহায্যে এ ধরনের সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ উৎপাদন করা যায়। কোষ তাত্ত্বিকরা (Cytologists) সূক্ষ্ম তরঙ্গের সাহায্যে কোষ ভেঙে তাদের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে গবেষণা করেন। বায়োকেমিস্টরা এভাবে ব্যাকটিরিয়া কোষ ভেঙে এনজাইম সংগ্রহ করে গবেষণা করেন। এভাবে জীবাণু মেরে জিনিসকে সাধারণতঃ জীবাণুমুক্ত করবার চেষ্টা করা হয় না।

৪। **উত্তাপ প্রয়োগে জীবাণু বিনাশ** : জীবাণু বিনাশের সবচেয়ে সহজ উপায় হল তাপ প্রয়োগ। যে সব জিনিস তাপ প্রয়োগে নষ্ট হয় না, তাপের সাহায্যে তাদের জীবাণুমুক্ত করা হয়। কোন কিছুকে পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত করাকে বলা হয় স্টেরিলাইজেশন (sterilization)। সাধারণতঃ তাপের সাহায্যে স্টেরিলাইজেশন করা হয়। তাপ দুইভাবে প্রয়োগ করা হয় : (ক) শুষ্ক ও (খ) ভেজা।

(ক) **শুষ্ক তাপ** : শুষ্ক তাপের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করা বলতে বোঝায় গরম বাতাসের মধ্যে রেখে জিনিস-পত্রের সঙ্গে জড়িত জীবাণুদের মেরে ফেলা। সাধারণতঃ এর জন্যে ব্যবহার করা হয় বিশেষভাবে তৈরী তাপ-প্রদান -যন্ত্র। যাকে বলে গরম-বাতাসের-চুল্লি (hot air oven)। এর মধ্যে ধাতব ও কাচের জিনিস-পত্র রেখে তাদের জীবাণুমুক্ত করা সহজ। কাচের ও ধাতুর তৈরী জিনিস-পত্র গরম-বাতাস-চুল্লিতে ১৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৪ ঘণ্টা কাল রাখলে সব জীবাণু মরে যায়।

(খ) **ভেজা তাপ** : ভেজা তাপে জীবাণু ধ্বংস করবার সময় সাধারণতঃ বাষ্পকে অধিক তাপমাত্রায় উঠাবার জন্য তার উপর চাপ বৃদ্ধি করা হয়। এক

banglainternet.com



বায়ু চাপমাত্রায় পানি ফুটে বাষ্প হতে লাগে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কিন্তু চাপ বাড়ালে আরো অধিক তাপমাত্রা ছাড়া পানি বাষ্পে পরিণত হয় না। সাধারণতঃ ভেজা তাপের সাহায্যে অটোক্লেভে (autoclave) জিনিস-পত্র এবং ব্যাকটিরিয়ার জন্য তৈরী আবাদ মাধ্যমকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। অটোক্লেভে সাধারণতঃ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১ কেজি তাপমাত্রায় গরম বাষ্পের সাহায্যে ২০ মিনিটে সব দ্রব্য থেকে জীবাণু মেরে ফেলা যায়। এই চাপ মাত্রায় বাষ্পের উত্তাপ দাঁড়ায় ১২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। এরকম তাপমাত্রায় জীবাণুরা বাঁচতে পারে না। শুষ্ক উত্তাপের চাইতে ভেজা উত্তাপ, অর্থাৎ বাষ্পের (steam) উত্তাপে জীবাণু মেরে ফেলা সহজ। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, যেখানে এনথ্রাক্স (anthrax) ব্যাকটিরিয়াম-এর স্পোর মেরে ফেলতে হলে তাকে ১৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরম বাতাসে রাখতে হয় ৩ ঘণ্টা, সেখানে বাষ্পের মধ্যে তাকে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মাত্র ১০ মিনিট কাল রাখলেই মরে যায়। অনেক ব্যাকটিরিয়ার স্পোর আছে যা ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাষ্পের মধ্যেও যথেষ্ট সময় বেঁচে থাকতে পারে। যেমন কোন কোন স্পোর ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু অধিক চাপে বাষ্পের মধ্যে অধিক উত্তাপে অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যায়।

## জীবাণু অপসারণ

যে সব দ্রব্য তাপের প্রভাবে সহজেই নষ্ট হয়, সেরকম দ্রব্যকে তাপ প্রয়োগ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা চলে না। তাদের জীবাণুমুক্ত করা হয় ছেঁকে নিয়ে। কাচের প্রলেপ ছাড়া চীনা মাটির অথবা অ্যাসবেসটসের (asbestos) দিয়ে তৈরী ফিল্টার (filter) বা ছাঁকনির সাহায্যে। এসব ফিল্টারের সাহায্যে ভাইরসদের আটকান যায় না। কারণ, এসব ফিল্টারের রন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে ভাইরসরা চলে যেতে পারে। কিছু খুব ছোট ব্যাকটিরিয়া যেমন মাইকোপ্লাজমা ( mycoplasma ) এ-রকম ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। তবে মোটা-মুটিভাবে এ ভাবে ছেঁকে নিলে তরল পদার্থ ভাইরাস ছাড়া আর সকল প্রকার জীবাণুমুক্ত হয়। ভাইরাসদের তরল পদার্থ থেকে ছেঁকে অপসারিত করতে হলে কলোডিয়ান (collodian) দিয়ে তৈরী ফিল্টার দিয়ে ছেঁকে নিতে হয়। এসব ছাঁকনির রন্ধ্রের ব্যাস হতে হয় ভাইরাস কণিকাদের চাইতে অনেক ছোট। কি রকম রন্ধ্রযুক্ত কলোডিয়ান ফিল্টারের মধ্য দিয়ে কোন ভাইরাস

যেতে পারছে আর কি মাপের রন্ধ্রযুক্ত কলোডিয়ান ফিল্টারের মধ্য দিয়ে কোন্ ভাইরাস যেতে পারছে না, তা থেকেই প্রথম নির্ণয় করা হয়েছিল ভাইরাস কণিকাদের মাপ। কলোডিয়ান (সেলুলোজ নাইট্রেট) তৈরী আবরণকে গ্রাডোকল আবরণও (gradocal membrane) বলে। কারণ, এই আবরণের রন্ধ্র ইচ্ছামত বিভিন্ন মাপের করে বসান যায়।

জীবাণুর সাহায্যে অ্যাসিড, অ্যান্টিবায়োটিক, ভাইটামিন ইত্যাদি উৎপাদনের সময় জীবাণুমুক্ত বাতাস যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে হয়। বাতাসকে কাচের উলের (glass wool) মাধ্যমে প্রবাহিত করে তা থেকে জীবাণু অপসারণ ও জীবাণুমুক্ত করা যায়।

## জীবাণুর উপর শৈত্যের প্রভাব

খুব ঠাণ্ডায় অনেক ব্যাকটিরিয়া মারা যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমান হয়, তা হলেই কেবল ব্যাকটিরিয়া মারা পড়ে বেশী। কিন্তু হঠাৎ ঠাণ্ডা করলে মারা পড়ে না। খুব দ্রুত ঠাণ্ডা করলে অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া ১৯৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় (অর্থাৎ শূন্যে নীচে ১৯৪ ডিগ্রি তাপমাত্রায়) যথেষ্ট সময় বেঁচে থাকতে পারে। কেন ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমালে ব্যাকটিরিয়া মারা যায়, কিন্তু হঠাৎ কমালে মারা যায় না, তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি।

খুব দ্রুত তাপমাত্রা কমিয়ে, বায়ুশূন্য স্থানে ব্যাকটিরিয়াদের শুকিয়ে, বায়ুশূন্য অ্যাম্পুলে রেখে দিলে ব্যাকটিরিয়া বহুকাল বাঁচে। এভাবে ব্যাকটিরিয়া সংরক্ষণ করাকে বলা হয় লায়োফিলিজেশন (lyophilization)। এ ভাবে রাখা ব্যাকটিরিয়ার জন্য কোন পুষ্টির দরকার হয় না। শ্বাস ক্রিয়ার জন্য বাতাসের প্রয়োজন করে না। এ সময় ব্যাকটিরিয়া কোষে সর্বপ্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া (মেটাবলিজম) বন্ধ থাকে। এভাবে বেঁচে থাকাকে বলে লীন জীবন (latent life)।*

এ অধ্যায়ে জীবাণু নিধন ও অপসারণ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোচনা করলাম। এ থেকে বোঝা সম্ভব হবে জীবাণু নিধন ও অপসারণের মূল

* কারো কারো মত এরকম লীনভাবে বেঁচে থাকা অবস্থাতে জীবাণুরা এই পৃথিবীতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন অঞ্চল থেকে এসে পৌঁছাতে পারে। বিষয়টি দূর কল্পনা। পুরাণ অনেক বর্ণনায় দেখা যায়, ধূমকেতুর আগমনে রোগ ও মহামারী বৃদ্ধি পাবার কথা।

banglainternet.com



কৌশল। জৈব বস্তু পচে নষ্ট হবার কারণ জীবাণু। জীবাণুদের নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে সস্তায় বিভিন্ন জৈব বস্তুকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়, তা ফলিত জীবাণুতত্ত্বের (Applied microbiology) বিশেষ আলোচ্য বিষয়। রোগ জীবাণুদের মেরে ফেলে রোগ নিবারণ করতে পারবার উপর নির্ভর করে মানুষের রোগ চিকিৎসার বিশেষ সাফল্য। জীবাণু নিধন ও অপসারণের জ্ঞান মানুষকে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং দীর্ঘায়ু হতে বিরাটভাবে সহায়তা করেছে।

**নবম অধ্যায়**

# অনুসন্ধান প্রণালী

প্রত্যেকটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে তার নিজস্ব অনুসন্ধান প্রণালী। জীবাণুতত্ত্বেরও নিজস্ব অনুসন্ধান প্রণালী আছে। আর এই অনুসন্ধান প্রণালীর (methodology) বৈশিষ্ট্যকে নির্ভর করেই তা রূপ নিয়েছে বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখায়। সাধারণ জীবাণুতত্ত্বের বইতে এই অনুসন্ধান প্রণালী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ অধ্যায়ে আমরা অনুসন্ধান প্রণালী সম্পর্কে একটা খুব মোটামুটি ধারনা প্রদানের চেষ্টা করবো; যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, জীবাণুদের জ্ঞান বিজ্ঞানীরা ঠিক কিভাবে আহরণ করেছেন। জীবাণুতত্ত্বের ভিত্তি কি।

১। **আবাদ মাধ্যম** ঃ কোন জীবাণু সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হলে তাকে প্রথম অন্য জীবাণু থেকে পৃথক আবাদ করবার ব্যবস্থা করতে হয়। জীবাণু আবাদের জন্য উপযুক্ত আবাদ মাধ্যম (**culture medium**) খুঁজে বের করতে পারা জীবাণুতত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্য।

যেহেতু প্রাণী ও মানুষের রোগ জীবাণু নিয়ে প্রথম বিশেষভাবে গবেষণা আরম্ভ হয়, তাই মাংসের সাহায্যেই প্রথমে আবাদ মাধ্যম প্রস্তুতের চেষ্টা চলে। একাজে সর্বপ্রথম বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেন জার্মান চিকিৎসক ও জীবাণু-তাত্ত্বিক রবার্ট কক্ (R. Koch)। কক্ গরুর মাংসকে পানিতে ভিজিয়ে রেখে তা থেকে রস নিংড়ে নিয়ে ব্যাকটিরিয়া আবাদের উপায় বের করেন। তিনি চর্বিবিহীন ভাল মাংসকে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে তা থেকে রস নিংড়ে নেন। এবং এর সঙ্গে মেশান শতকরা পাঁচ ভাগ পেপটন (peptone) ও শতকরা ০'৮ ভাগ সাধারণ লবণ (common salt)। মাংস থেকে পাওয়া রসের মধ্যে থাকে মাংসের পানিতে দ্রবণযোগ্য অংশ। পেপটন হল আলাদাভাবে মাংস থেকে তৈরি এক ধরনের নাইট্রোজেন যৌগ।* শতকরা ০'৮ ভাগ লবণ যোগ করা হয়েছিল। কারণ, মানুষের দেহের মধ্যে তরল বস্তুতে লবণ সাধারণতঃ ঐ মাত্রার কাছাকাছি থাকে। কক্ এভাবে যে আবাদ মাধ্যম তৈরি করেন, তাকে বলে পুষ্টি সুরুয়া (nutrient broth)। কক্ তাঁর আবাদ-মাধ্যমকে উত্তাপের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত

* প্রোটিনকে এনজাইমের সাহায্যে আর্দ্র বিশ্লেষণ (hydrolysis) করে পেপটন পাওয়া যায়।

banglainternet.com



করবারও ব্যবস্থা করেন। কক্-এর এই আবাদ মাধ্যম এখন ব্যাকটিরিয়া চাষের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

পুষ্টি সুরুয়ার সঙ্গে শতকরা ১'৫ ভাগ এগার (Agar) মিশালেই তা থকথকে জেলির মত হয়। এগার এক রকম কার্বোহাইড্রেট। যা লাল-শৈবাল (Rhodophyceae) থেকে পাওয়া যায়। অধিকাংশ জীবাণুই এগারকে আক্রমণ করতে পারে না। অর্থাৎ তারা এগার থেকে কার্বন অথবা অন্য কোন উপাদান পুষ্টির জন্য গ্রহণ করে না। জীবাণুদের ক্রিয়ার ফলে এগার নষ্ট হয় না। ফলে আবাদ মাধ্যম থক থকে জেলির মতই থাকে। এগার ব্যবহারে আরো অনেক রকম সুবিধা আছে। যেমন, এগার গলতে লাগে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কিন্তু জমতে লাগে ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি তাপমাত্রা। তাই প্রয়োজন হলে ব্যাকটিরিয়া অথবা ছত্রাকের, স্পোর, এগার জমে শক্ত হবার আগেই তার মধ্যে প্রদান করে তাদের নাড়িয়ে মাধ্যমের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে পরস্পরের থেকে পৃথক করা যায়। এগারের সাহায্যে জমিয়ে যে মাধ্যম পাওয়া যায়, তাকে বলে পুষ্টি এগার (nutrient agar)। নিউট্রিয়েন্ট ব্রথ ও নিউট্রিয়েন্ট এগারে বহুবিধ ব্যাকটিরিয়া আবাদ করা যায়। জীবাণুতত্ত্বের ক্ষেত্রে এগারের ব্যবহার খুবই ব্যাপক। কিন্তু কিছু ব্যাকটিরিয়া আছে যারা এগারের উপস্থিতিতে নির্জীব হয়ে পড়ে। এই সব ব্যাকটিরিয়া সম্পূর্ণ অজৈব বস্তুর সহায়তায় বেঁচে থাকে ও বংশবিস্তার করে। এরা জৈব বস্তুর উপস্থিতিতে মরে না গেলেও বংশ বিস্তার করতে অর্থাৎ বিভক্ত হতে পারে না। এদের এক দল মাটির মধ্যে অ্যামোনিয়া ($NH_4^+$) কে নাইট্রাইটে ($NO_2^-$) ও পরে আর এক দল নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে ($NO_3^-$) রূপান্তরিত করে। কোন মাধ্যমে সামান্য জৈব বস্তু, এমন কি এগার থাকলেও এসব ব্যাকটিরিয়া আবাদ করা যায় না। এদের আবাদ করবার বিশেষ কৌশল আবিষ্কার করেন ফ্রান্সে প্রবাসী রুশ জীবাণুতাত্ত্বিক ভিনোগ্রাদস্কি (S. Winogradsky, ১৮৫৬-১৯৫৩)। তিনি সম্পূর্ণ অজৈব যৌগের সাহায্যে আবাদ মাধ্যম (culture medium) প্রস্তুতের উপায় বের করেন। তিনি এগার (Agra)-এর পরিবর্তে ব্যবহার করেন সিলিকা জেল (silica gel)।*

* ভিনোগ্রদস্কি ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়া থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। মৃত্তিকার জীবাণু নিয়ে এঁর গবেষণা জগৎ-খ্যাত।

অনেক ব্যাকটিরিয়া আছে যারা বাতাসের অক্সিজেনে নির্জীব হয়ে পড়ে। এ-সব অবায়ুজীবী (anaerobic) ব্যাকটিরিয়া আবাদ করবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, যে সব বস্তু খুব সহজেই অন্য বস্তুকে হাইড্রোজেন প্রদান করতে পারে, অর্থাৎ যারা বিজারক বস্তু (reducing substance), তাদের উপস্থিতিতে এ-সব ব্যাকটিরিয়া বাতাস থাকলেও বৃদ্ধি পেতে পারে। এইজন্য অবায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া আবাদ করবার জন্য অনেক সময় আবাদ মাধ্যমে থায়োগ্লাইকোলিক অ্যাসিড, সিস্টেইন (cysteine), অ্যাসকরবিক অ্যাসিড প্রভৃতি যৌগ যোগ করা হয়। আবাদ মাধ্যমে এসব যৌগ থাকলে বাতাসের উপস্থিতিতেও অবায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া বৃদ্ধি পেতে ও বংশবিস্তার করতে পারে। বাতাসের অক্সিজেন তাদের ক্ষতি করতে অথবা নিস্তেজ করে রাখতে পারে না।

২। **আবাদ মাধ্যমের pH নিয়ন্ত্রণ :** ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধির উপর আবাদ মাধ্যমের সক্রিয় অম্লতা (active acidity) ও ক্ষারতার (alkalinity) প্রভাব খুব বেশি। বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন pH মাত্রায় ভাল হয়। ব্যাকটিরিয়া চাষের জন্য তাই আবাদ মাধ্যমের pH মাত্রা ঠিক রাখবার প্রয়োজন করে। তবে ছাতা চিতি (mou'd) ব্যাকটিরিয়ার মত অত বেশী সক্রিয় অম্লতা ও ক্ষারতার উপর নির্ভরশীল নয়। চিতির আবাদ মাধ্যমে তাই pH মাত্রা নির্দিষ্ট করবার প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করে না।* কোন আবাদ মাধ্যম তৈরির সময় তাদের যদি সক্রিয় অম্লতার পরিমাণ বেশি থাকে তবে N/20 কসটিক সোডার (NaOH) সাহায্যে তার পরিমাণ কমিয়ে আনতে হয়। অন্যদিকে সক্রিয় ক্ষারের পরিমাণ খুব বেশী হলে N/20 হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) সাহায্যে ক্ষারের মাত্রা কমিয়ে আনতে হয়। সাধারণতঃ এগার যোগ করে আবাদ মাধ্যম প্রথমবার গরম করবার পর ফিল্টার পেপারের সাহায্যে ছেঁকে নেওয়া হয়। মাধ্যমের তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি আসলে pH ঠিক করা হয়। পাঁচ ফোঁটা ব্রোমথিমল ব্লু (Bromthymol blue) দশ ফোঁটা মাধ্যমে যোগ করলে যদি রং হয় সবুজ তবে বুঝতে হবে মাধ্যমের pH ৭-এর কাছাকাছি আছে। কোন মাধ্যমের pH মাত্রা সাত হলে বুঝতে হবে তা অম্লও নয় আবার ক্ষারকও নয়, নিরপেক্ষ (nutral)। ৭-এর কম হলে বুঝতে হবে তা অম্লপ্রধান আর ৭-এর বেশী হলে বুঝতে

* চিতি (mould) ও ইস্ট (yeast) সাধারণতঃ অম্ল-প্রধান মাধ্যমে ভাল হয়।



হবে তা ক্ষারপ্রধান। অম্লপ্রধান মাধ্যমে ব্রোমথিমল ব্লুর রঙ হয় হলুদ আর ক্ষারপ্রধান মাধ্যমে নীল। বিভিন্ন ইনডিকেটর (indicator) বা নির্দেশকের রঙ বদল থেকে মাধ্যমের pH মোটামুটিভাবে নির্ণয় করা যায়। খুব নিখুঁত pH মাপতে হলে pH মিটার লাগে। pH তাপমাত্রার উপরও নির্ভরশীল। তাই pH-এর মাত্রা বলবার সময় তাপমাত্রারও উল্লেখ থাকা ভাল। মাংসের-সুরুয়া (broth) তৈরীর সময় সাধারণতঃ ৬০ ডিগ্রি সেঃ তাপ মাত্রায় pH থাকতে হয় ৭·২-এর কাছাকাছি। এই pH বহু ব্যাকটিরিয়ার ভালভাবে হয়।

৩। **বিশুদ্ধ আবাদ :** বিশুদ্ধ আবাদ (pure culture) বলতে বোঝায় কোন জীবাণুকে অন্য-আর সব জীবাণু থেকে পৃথক করে চাষ করা। সাধারণতঃ দু'ভাবে ব্যাকটিরিয়া পৃথক করে বিশুদ্ধ আবাদ করবার চেষ্টা করা হয় : (ক) লঘুকরণ পদ্ধতি এবং (খ) বিস্তারণ পদ্ধতি।

(ক) **লঘুকরণ পদ্ধতি** (dilution method) : যে দ্রব্য থেকে কোন বিশেষ ব্যাকটিরিয়াম পৃথক করতে হবে, তাকে জীবাণুমুক্ত পানিতে গুলিয়ে বিভিন্ন মাত্রার লঘু দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। সাধারণতঃ ১/২৫০.০০০ পর্যন্ত দ্রবণ কমালেই চলে। এর থেকে অধিক মাত্রার দ্রবণ সচারচর প্রস্তুত করতে হয় না। সর্বোচ্চ লঘুমাত্রার দ্রবণ থেকে কয়েক ফোঁটা নিয়ে তরল এগার মাধ্যমে (৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার কাছাকাছি) যোগ করে নাড়িয়ে মিশিয়ে জমতে দিতে হয়। এভাবে নাড়িয়ে মেশানোর ফলে ব্যাকটিরিয়া কোষ মাধ্যমের সর্বত্র পৃথক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি কোষ থেকে একটি করে পৃথক উপনিবেশ (colony) বা ব্যাকটিরিয়া কোষ সমষ্টি গড়ে ওঠে। এই উপনিবেশ থেকে বাঞ্ছিত ব্যাকটিরিয়াম নিয়ে নতুন পাত্রে খাদ্য মাধ্যমে আবাদ করলেই বিশুদ্ধ আবাদ (pure culture) সৃষ্টি হয়।

(খ) **বিস্তারণ পদ্ধতি :** বিস্তারণ পদ্ধতিতে ব্যাকটিরিয়াম পৃথক করতে হলে যে জিনিস থেকে কোন ব্যাকটিরিয়াম পৃথক করতে হবে তা সামান্য পরিমাণে নিয়ে জীবাণুমুক্ত জমাট মাধ্যমের উপর একটি জীবাণুমুক্ত নিডল (পুড়িয়ে ঠাণ্ডা করা) দিয়ে একটা লম্বা দাগ টানতে হয়। তারপর নিডলটাকে (needle) জীবাণুমুক্ত করে ঐ লম্বা দাগের আড়াআড়িভাবে একাধিক দাগ টানা হয়। এর ফলে ব্যাকটিরিয়া কোষগুলি সরে গিয়ে মাধ্যমের উপর আলাদাভাবে বংশ-বৃদ্ধি করে পৃথক পৃথক উপনিবেশ গড়ে তোলে।

জীবাণুতত্ত্বের কাজে সবসময় সাবধান হতে হয়, যাতে বাইরে থেকে কোন জীবাণু আবাদ মাধ্যমে ঢুকতে না পারে। কেবল যে জীবাণু আবাদ করার

banglainternet.com

প্রয়োজন তাই যেন মাধ্যমের মধ্যে উৎপাদিত হতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থাকে বলা হয় অ্যাসেপ্‌সি (asepse)। মাধ্যমের মধ্যে যাতে বাইরে থেকে কোন অবাঞ্ছিত জীবাণু না যেতে পারে তার জন্য টেস্টটিউবে মাধ্যম রেখে তাতে তুলার ছিপি বা অন্য কোন ছিপি লাগান হয়। জীবাণুমুক্ত প্লেট্রি-থালায় মাধ্যম ঢালবার সময় খুব সাবধান হতে হয়। কাচের জিনিস-পত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস ভাল করে তাপ প্রয়োগ করে আগে থেকেই জীবাণমুক্ত করে (sterilize) রাখতে হয়।

৪। **ব্যাকটিরিয়া রঞ্জিতকরণ :** ব্যাকটিরিয়া কোষ অর্ধস্বচ্ছ (translucent), তাই মাইক্রোসকোপে তাদের খুব স্পষ্ট করে দেখা যায় না। তাদের স্পষ্ট করে দেখবার জন্য তাদের গায়ে বিভিন্ন প্রকার অ্যানিলিন রঞ্জকে (anilin dye) লাগাবার প্রয়োজন হয়। রঙ লাগালে তাদের দেখতে পারা যায় অনেক সুস্পষ্টভাবে। ব্যাকটিরিয়া কোষের অনেক সূক্ষ্ম অবয়ব (organelle) আছে, রঙ ছাড়া যাদের দেখাই যায় না। যেমন ফ্ল্যাজেলা (flagella)। ব্যাকটিরিয়া কোষের ক্ষেত্রে যাকে সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় নিউক্লিয়াস বা কোষ-কেন্দ্র হিসাবে তা দেখবার জন্যও প্রয়োজন হয় বিশেষ রঞ্জক।

(ক) **সাধারণ রঞ্জন-পদ্ধতি** (simple staining) : সাধারণভাবে ব্যাকটিরিয়া কোষ দেখবার জন্য ব্যবহার করা হয় শতকরা ০'২ থেকে ১ ভাগ, মিথেলিন ব্লু (methylne blue), জেনসিয়ান ভায়োলেট (gentian violet) অথবা কারবল ফুকসিন (carbol fuchsin)।

প্রথম একটা পরিষ্কার কাঁচের স্লাইডে (slide) যে ব্যাকটিরিয়াম দেখতে হবে তার কিছুটা আবাদ নিয়ে খুব ভাল করে লেপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর বুনসেন বার্নারের অথবা স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার মধ্যে দিয়ে স্লাইডটিকে তাড়াতাড়ি বার তিনেক টেনে নেওয়া হয়। এর ফলে স্লাইড সামান্য পরিমাণে উত্তপ্ত হয়। এই উত্তাপে ব্যাকটিরিয়া কোষগুলি স্লাইডের গায়ে লেগে যায়। একে বলে তাপ আটকান (heat-fixed)। ব্যাকটিরিয়া কোষের গায়ে একরকম আঠাল বস্তু থাকে, যা তাদের কাচের গায়ে এরকম ভাবে আটকে যাবার কারণ। এভাবে তৈরী ব্যাকটিরিয়া কোষের প্রলেপের (smear) উপর ডিসটিল ওয়াটারে তৈরী রঙ ঢালতে হয়। রঙ ঢালবার পর ১ মিনিট-কাল অপেক্ষা করে স্লাইডটা কলের পানিতে ধীরে ধীরে ধুয়ে ফেলে শুকিয়ে নিয়ে মাইক্রোসকোপে দেখতে হয়। মাইক্রোসকোপের সাহায্যে ব্যাকটিরিয়া



দেখবার সময় এক ফোঁটা সিডার-উড-অয়েল (ceder-wood oil) দিয়ে অয়েল-ইমারসান অবজেকটিভের (oil-immersion objective) সাহায্যে দেখতে হয়। এসময় মাইক্রোসকোপের কনডেনসার উপরে তুলে নিতে হয়। যাতে খুব বেশী আলো পাওয়া সম্ভব হয়। ব্যাকটিরিয়া দেখবার জন্য সব সময় মাইক্রোসকোপের সমতল আয়না (flat mirror) ব্যবহার করতে হয়।

(খ) **গ্রামের রঞ্জন পদ্ধতি** (Gram's stain) : এই রঞ্জন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ডেনিস চিকিৎসক গ্রাম (Gram) ১৮৮৪ সালে। ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে এই রঞ্জন পদ্ধতির গুরুত্ব অনেক। কারণ এই রঞ্জন পদ্ধতির সাহায্যে প্রকৃত ব্যাকটিরিয়া (bacteria)-দের দু'ভাগে ভাগ করা যায় : গ্রাম-পজেটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভ। গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে দেহ ক্রিয়াগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন প্রকৃত ব্যাকটিরিয়ামকে সনাক্ত করতে হলে প্রথমেই দেখা হয়, তা গ্রাম পজেটিভ না গ্রাম নেগেটিভ।

তাপ-আটকান ব্যাকটিরিয়া প্রলেপের (smear) উপর প্রথমে দেওয়া হয় জেনসিয়ান ভায়োলেট অথবা ক্রিস্টাল ভায়োলেট। তারপর এক মিনিট কাল অপেক্ষা করা হয়। এরপর এই রঙ ঢেলে ফেলে প্রলেপের উপর প্রয়োগ করা হয় আয়োডিন। এক মিনিট কাল অপেক্ষা করার পর আয়োডিন স্লাইড থেকে ঢেলে ফেলে তা অ্যালকোহল-অ্যাসিটোনে ধৌত করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জেনসিয়ান ভায়োলেট অথবা ক্রিস্টাল ভায়োলেটের রঙ ধুয়ে আসতে থাকে ততক্ষণ ধৌত করা হয়। এরপর পানিতে ভাল করে ধৌত করে শতকরা ০'২ ভাগ ইয়োসিন (cosin) জলীয় দ্রবণে (acquous solution) অথবা ঐ জাতীয় অন্য কোন রঙে ১৫ সেকেন্ড রঞ্জিত করা হয়। গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়া থেকে জেনসিয়ান ভায়োলেট অথবা ক্রিস্টাল ভায়োলেটের রঙ অ্যালকোহল-আসিটোন দ্বারা ধৌত করলে উঠে যায় না। তাদের বেগুনি দেখায়। কিন্তু গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে অ্যালকোহল-অ্যাসিটোন দ্বারা ধৌত করলে জেনসিয়ান ভায়োলেট অথবা ক্রিস্টাল ভায়োলেটের রঙ ধুয়ে উঠে যায়। তারা ইয়োসিন-এর লাল বর্ণ ধারণ করে। মাইক্রোসকোপে দেখলে তাদের লাল বলে মনে হয়।

গ্রাম রঞ্জনের ক্ষেত্রে সব সময় তরুণ ব্যাকটিরিয়া আবাদ থেকে নিয়ে তাদের রঞ্জিত করতে হয়। কারণ পুরান আবাদে গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়াও গ্রাম-নেগেটিভ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রাম-পজেটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে পার্থক্যের একটা কারণ হল গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরে লিপিড থাকে না। কিন্তু,

banglainternet.com

গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরে যথেষ্ট লিপিড থাকে। লিপিড থাকার কারণে, তাদের গাছে জেনসিয়ান ভায়োলেট অথবা ক্রিস্টাল ভায়োলেটের রঙ আটকে থাকতে পারে না। ধুলে উঠে যায়। গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়া সহজেই পেনিসিলিন-এর প্রভাবে মারা যায়। কিন্তু গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়া যায় না। এ ছাড়া এই দুই বিভাগের ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে আরো অন্য ধরনের পার্থক্য আছে। যেহেতু গ্রাম রঞ্জন (Gram's stain) কে জীবাণুতত্ত্বের ক্ষেত্রে খুব বেশী গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়, তাই আমরা নীচে গ্রাম রঞ্জন প্রস্তুত বিধি প্রদান করছি এ-বিষয় আরো পরিস্কার ধারণা লাভের জন্য।

**(ক) জেনসিয়াম ভায়োলেট** (Gentian violet)

| | |
|---|---|
| জেনসিয়ান ভায়োলেট | ১ গ্রাম |
| শতকরা ৯৫ ভাগ অ্যালকোহল | ১০ মিলিমিটার। |

এর সঙ্গে যোগ করতে হবে শতকরা ১ ভাগ ফিনল দ্রবণ ১০০ মিলিলিটার। অর্থাৎ ১ গ্রাম ফিনল ১০০ মিলিমিটার ডিস্টিল ওয়াটারে গুলে নিয়ে যোগ করতে হয়।

**(খ) আয়োডিন সলিউশন** (Gram's Iodine)

| | |
|---|---|
| আয়োডিন | ১ গ্রাম |
| পটাশিয়াম আয়োডাইড | ২ গ্রাম |
| পরিস্রুত পানি | ২০০ গ্রাম। |

**(গ) অ্যালকোহল অ্যাসিটোন** (Alcohol-Acitone)

| | |
|---|---|
| অ্যালকোহল | ৪ ভাগ |
| অ্যাসিটোন | ১ ভাগ। |

**(ঘ) ইয়োসিন** (Eosin)

| | |
|---|---|
| ইয়োসিন | ০.২ গ্রাম |
| পরিস্রুত পানি | ১০০ মিলিলিটার। |

গ্রাম রঞ্জন (**Gram's stain**) তৈরির আরো অনেক রকম পদ্ধতি আছে কিন্তু অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে উপরের পদ্ধতিতে তৈরি রঞ্জক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল ফল প্রদান করে। যাদের সাধারণভাবে বলা হয় প্রকৃত ব্যাকটিরিয়া (Eubacteria), গ্রাম রঞ্জন বিধি কেবল তাদের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রেই কাজ

banglainternet.com



দেয়—সব ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে নয়। সব প্রোক্যারিয়ট (**Procaryot**) জীবাণুর জন্য এর প্রয়োগ চলে না।

## জিল-নেলসেন (Zeihl-Neelsen) রঞ্জক

ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে আর একটি রঞ্জকও গুরুত্বপূর্ণ। একে বলা হয় জিল-নেলসেন রঞ্জক। এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যাকটিরিয়াকে কারবল ফুকসিন (carbol fuchsin) নামক রঞ্জকের সাহায্যে রঞ্জিত করবার পর অ্যাসিড-অ্যালকোহল-এর সাহায্যে ধুয়ে ফেলা হয় ও পরে মিথেলিন ব্লুর (methylene blue) সাহায্যে রঞ্জিত করা হয়। যে-সব ব্যাকটিরিয়া অ্যাসিড-অ্যালকোহল (শতকরা ২৫ ভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড) দ্বারা ধুয়ে ফেলবার পরও কারবল ফুকসিন-এর রঙ রাখতে পারে, তাদের বলা হয় অ্যাসিড ফাস্ট (**acid fast**) বা অম্ল-দৃঢ় ব্যাকটিরিয়া। অ্যাসিড-ফাস্ট ব্যাকটিরিয়া আমাদের ক্ষতিকর রোগ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগের কারণ।

## অনুসন্ধান বিষয়

কোন জীবাণু সম্পর্কে জানা মানে তার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানা। একটি জীবাণু দেখতে কেমন; তার আকার কি রকম; তার দেহ-ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য কি; কি অবস্থার জীবাণুটি ভালভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে অর্থাৎ বংশবিস্তার করতে পারে; জীবাণুটি যদি আমাদের ক্ষতি করে তবে তা কিভাবে আমাদের ক্ষতিসাধন করে; কিভাবে তার বিস্তার রোধ করা যায়; কোন জীবাণু যদি কোন অর্থকরী দ্রব্য উৎপাদন করে, যেমন অ্যালকোহল, জৈব অম্ল, অ্যান্টিবায়োটিক, ভাইটামিন ইত্যাদি, তবে সেই ব্যাকটিরিটরাকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত দ্রব্য সস্তায় উৎপাদন করা যায়—এসব হল জীবাণু দিয়ে অনুসন্ধানের বিশেষ লক্ষ্য। কোন জীবাণুর বিস্তার রোধ করতে হলে জানতে হয় জীবাণুটি কিভাবে একস্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেহ থেকে অন্য দেহে যেতে পারে। কি অবস্থায় তা সহজে বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে কোন জীবাণুকে কাজে লাগাতে হলে জানতে হয়, জীবাণুটিকে কিভাবে সহজলভ্য জৈববস্তুর মধ্যে চাষ করা যায়। জীবাণুদের দেহ-ক্রিয়া (**physiology**) কেবল লভ্য খাদ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না। জীবাণুদের বৃদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভর করে তাপমাত্রা, অম্লতা ও বাতাসের মুক্ত অক্সিজেনের পরিমাণের উপর। তাই কোন জীবাণুকে কাজে লাগাতে হলে তার এ-সব প্রয়োজনের উপরও দৃষ্টি দিতে হয়।

কোন নতুন আবিংকৃত জীবাণুর ক্ষেত্রে সব সময় বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়, জীবাণুটি কোন আবাদ মাধ্যমে, কি অবস্থায় কোন কোন দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম। কারণ জীবাণুদের বিশেষ পরিচয় হল তাদের উৎপাদিত দ্রব্য দিয়ে।

**৫। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ :** যদি কোন বস্তুর ব্যাস ০˙০০০২ মিলিমিটারের কম হয় তবে তাদের সাধারণ মাইক্রোসকোপের সাহায্যে আর দেখা যায় না। তাদের দেখবার জন্য প্রয়োজন হয় ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ।

ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে ব্যবহার করা হয় ক্যাথোড রশ্মি। ক্যাথোড রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চাইতে অনেক কম। তাই ক্যাথোড রশ্মির (cathod ray) সাহায্যে সাধারণ আলোক রশ্মির চাইতে অনেক ছোট জিনিস দেখা ও ছবি তোলা সম্ভব হয়। ক্যাথোড রশ্মি অবশ্য আমাদের চোখে সাড়া জাগায় না। এই রশ্মির সাহায্যে কোন কিছু দেখতে গেলে তাই প্রয়োজন হয় প্রতিপ্রভা সৃষ্টিকারী পর্দার (fluorscent screen)। ক্যাথোড রশ্মি ইলেকট্রন কণিকার ধারা-প্রভাব। ইলেকট্রন-নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত। তাই এই ধারা-প্রবাহকে যদি কোন নেগেটিভ তড়িত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রভাহিত করা যায়, তবে ইলেকট্রনগুলি বিকর্ষিত হয়ে সংহত হয়। এরকমভাবে সংহত হবার ফলে কোন কিছু চিত্র লাভ করা যায়। দ্রষ্টব্য বস্তুকে স্থাপন করা হয় ইলেকট্রন ধারা-প্রবাহের মধ্যে। তারপর সেই ধারা প্রবাহকে যেতে দেওয়া হয় নেগেটিভ তড়িত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে। আলোক মাইক্রোসকোপে ব্যাকটিরিয়াকে ১৫০০ গুণের বেশি বড় করে দেখা সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে একটা খুব সাধারণ ইলেকট্রন-মাইক্রোসকোপের সাহায্যে ব্যাকটিরিয়ামের ছবি তোলা যায় ২০ হাজার গুণ বড় করে। সাধারণ আলোক মাইক্রোসকোপ দিয়ে মাত্র কয়েকটি বড় ভাইরাস ছাড়া অন্য ভাইরাসদের দেখতেই পাওয়া যায় না। যাদের দেখা যায় (যেমন বসন্ত রোগের ভাইরাস), তাদেরও দেখায় খুব ছোট বিন্দুর মত। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ দিয়ে সব ভাইরাসকেই অনেক গুণ বড় করে দেখা ও ছবি তোলা যায়। কোন কিছুর ব্যাস ১ ন্যানো মিটারের ছোট হলে তাকে আর ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে দেখা বা ছবি তোলা যায় না। কিন্তু এত ছোট কোন ভাইরাসের কথা জানা নেই। আমাদের রক্তের হিমগ্লবিন অণুর ব্যাস ২ দশমিক ৮ ন্যানো মিটার। এরকম মলিকিউলের ছবিও ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ দিয়ে উঠানো চলে। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ যথেষ্ট ব্যয়বহুল। এর ব্যবহার শিখবার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ প্রশিক্ষণের। জীবাণুতত্ত্বের ধরা-বাঁধা কাজের জন্য এখনও সাধারণ আলোক মাইক্রোসকোপের

banglainternet.com



ব্যবহারই যথেষ্ট। তাই এ-ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে কিছু না জানলেও চলে। কিন্তু কিছু পটভূমিকা জেনে রাখবার প্রয়োজন হয়, এগিয়ে থাকা গবেষণার ফলাফল বুঝবার জন্য। খুব ছোট জিনিসের (যেমন ভাইরাস কণিকার) ছবি ইলেকট্রন-মাইক্রোসকোপের সাহায্যে ওঠালে তার একটা সমগ্র চিত্র (total picture) পাওয়া যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় জিনিসের ছবি এর সাহায্যে ওঠানো সম্ভব নয়। বড় জিনিসের ছবি ওঠাতে হলে তাকে বহু ছোট ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের পৃথক ছবি তুলে তাদের একত্র করে একটা সমগ্র চিত্র গড়ে উঠাতে হয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে অনেক সময়েই বুঝতে অসুবিধা হয়, ঠিক কোন্ অংশকে আমরা দেখছি। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে তোলা ব্যাকটিরিয়া-কোষের ছবিতে এমন অনেক কিছুর ছবি ওঠে, ব্যাকটিরিয়া-কোষে যাদের ক্রিয়া সম্পর্কে আমরা এখনও জ্ঞাত হতে পারিনি। এরা ব্যাকটিরিয়া-কোষের অংশ। কিন্তু এদের প্রকৃত ভূমিকা এখন রয়েছে বিশেষভাবে অজ্ঞাত। এখন খুব ভাল ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে জীবন্ত কোষের অনুশীলনও কিছুটা পরিমাণে সম্ভব হয়েছে। তাই আশা করা যায়, এসব অংশের ভূমিকা সম্বন্ধেও অবগত হওয়া সম্ভব হবে।

**৬। জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়া :** ব্যাকটিরিয়া খুব ছোট। টেস্ট টিউবে (test-tube) এদের আমরা প্রায় রাসায়নিক দ্রব্যের মতই নাড়াচাড়া করতে পারি। তাই ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুশীলন করে দেখা সম্ভব হয়, ওরা কি ধরনের সব বস্তু উৎপন্ন করছে। ব্যাকটিরিয়া-কোষ আকারে যথেষ্ট ছোট বলে খুব কম জায়গায় বহু সংখ্যায় একত্রে থাকতে পারে। সাধারণ মাপের ৫০ কোটি ব্যাকটিরিয়া-কোষ ওজনে ১ মিলিগ্রামের কাছাকাছি। ব্যাকটিরিয়া-কোষের উপরিভাগের ক্ষেত্রফল (surface area) তাদের ওজনের তুলনায় বহুগুণ বেশি। উপরিভাগের ক্ষেত্রফলের পরিমাণ তুলনায় অনেক বেশি বলে বাইরে থেকে অধিকহারে বিভিন্ন বস্তু প্রতিটি কোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারে এবং এই সব বস্তুর রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, ১ কিউবিক সেন্টিমিটার স্থানে সাধারণ মাপের যতগুলি ব্যাকটিরিয়া-কোষ থাকতে পারে, তাদের সবার উপরিভাগের ক্ষেত্রফল একত্র যোগ করলে দাঁড়ায় ৫ বর্গমিটারের কাছাকাছি। ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য ছোট জীবাণুদের রাসায়নিক সক্রিয়তার অন্যতম কারণ হলো, তারা আকারে ছোট। তারা খুব কম জায়গায় অনেকে একত্রে অবস্থান করতে পারে এবং তাদের এনজাইমদের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক রূপান্তর ঘটাতে পারে। কোন্ জীবাণু কি কি জৈব ও অজৈব বস্তু উৎপাদনে সক্ষম তার

অনুশীলন করা হয়। কোন জীবাণুকে কাজে লাগিয়ে কোন অর্থকরী বস্তু (যেমন অ্যালকোহল, অ্যাসিড, অ্যান্টিবায়োটিক, ডেক্সট্রান (dextran ), ভাইটামিন প্রভৃতি) উৎপাদন করা চলে কিনা তা নিয়ে জীবাণুতত্ত্বে করা হয় বিশেষ গবেষণা।

কোন্ ব্যাকটিরিয়াম কোন্ বস্তু থেকে কি কি বস্তু উৎপাদন করতে সক্ষম, তার সাহায্যে সেই ব্যাকটিরিয়ামের বিবরণ দেওয়া হয়। কারণ, এই বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে পরে আবার ঐ ব্যাকটিরিয়ামকে সনাক্ত ( identify ) করা চলে। ব্যাকটিরিয়াম এর বর্ণনা দেবার সময় কতকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা সাধারণতঃ বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। যেমন,

—ট্রিপটোফান (tryptophan) থেকে ইনড্রোল (indrol) উৎপাদন ;

—নাইট্রাইট থেকে নাইট্রেট উৎপাদন ;

—বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট ভেঙ্গে যেসব বস্তু উৎপাদিত হয় ;

—আবাদ মাধ্যমের চূড়ান্ত pH কি দাঁড়ায়।

যেসব কার্বোহাইড্রেটের উপর ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়া সাধারণতঃ পরখ করা হয়, তারা হলো ঃ গ্লুকোজ, ম্যানোজ (mannose), সুক্রোজ, ম্যালটোজ (maltose), ল্যাক্টোজ (lactose) এবং স্টার্চ (starch)।

গ্যাস উৎপাদক ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে দেখা হয়, তারা কি ধরনের গ্যাস উৎপাদন করছে। অনেক ব্যাকটিরিয়া পেপটোন ভেঙ্গে $H_2S$ উৎপাদন করে বলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। পচা ডিমের মত গন্ধ নির্গত হয়। ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে তার আকার আকৃতির চাইতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গুরুত্বই অধিক। জীবাণুতত্ত্বের সঙ্গে জীব-রসায়নের (Biochemistry) সম্পর্ক নিকট।

দশম অধ্যায়

# ব্যাকটিরিয়ার পুষ্টি

কিছু সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া আছে, যারা তাদের পরিবেশ থেকে অজৈব বস্তু গ্রহণ করে তাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার জৈব বস্তু উৎপাদন করতে পারে। এদের বলা হয় অটোট্রপিক (autotropic) ব্যাকটিরিয়া। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া হিটেরোট্রপিক (heterotropic)। এরা এদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব জৈব বস্তু অজৈব বস্তু থেকে উৎপাদন করতে পারে না। খাদ্য হিসাবে এদের কিছু জৈব বস্তু পরিবেশ থেকে গ্রহণ করতে হয়। এরা কার্বন গ্রহণ করে জৈব বস্তু থেকে। কৃত্রিমভাবে এদের আবাদ করতে হলে আবাদ মাধ্যমে এক বা একাধিক জৈব বস্তু প্রদান করতে হয়। কমপক্ষে চিনি। যেমন গ্লুকোজ। কিন্তু কিছু ব্যাকটিরিয়া আছে, যাদের এখন কোন কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে চাষ করা সম্ভব হয়নি। এরা কেবল মাত্র উপযুক্ত জীবন্ত কোষ থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে বাঁচতে পারে। এদের বলা হয় বাধ্যতামূলক পরজীবী বা অবলিগেট প্যারাসাইট (obligate parasite)। কিন্তু এ ধরনের পরজীবী ব্যাকটিরিয়া সংখ্যায় বেশী নয়। এদের বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো রিকেটসিয়া। অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়াকে কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে আবাদ করা যায়। অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া কার্বনের জন্য জৈব বস্তুর উপর নির্ভর করে। কিন্তু তারা নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে অ্যামোনিয়া অথবা নাইট্রেট থেকে। অ্যামোনিয়া অথবা নাইট্রেট থেকে তারা তাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে। এ ব্যাপারে তাদের দেহের রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ উন্নত উদ্ভিদের মত।

যে সমস্ত মৌলিক উপাদান ছাড়া ব্যাকটিরিয়া বাঁচে না, আমরা নীচে তার একটা তালিকা প্রদান করছি ঃ

১। **কার্বন বা অঙ্গার ঃ** অটোট্রপিক (autotropio) ব্যাকটিরিয়া বাতাসের কার্বনডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন গ্রহণ করে কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ জীবাণু তাদের জৈব খাদ্যবস্তুর জন্য নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত অটোট্রপিক ব্যাকটিরিয়া ও সবুজ গাছপালার উপর। অটোট্রপিক ব্যাকটিরিয়া দু'রকমের ঃ

(ক) ফটোট্রপিক ও (খ) কিমোট্রপিক।

banglainternet.com

ফটোট্রপিক ব্যাকটিরিয়া কার্বোহাইড্রেট উৎপাদনে আলোক শক্তিকে কাজে লাগায়। আর কিমোট্রপিক ব্যাকটিরিয়া অন্য অজৈব বস্তু জারিত (oxidize) করে যে শক্তি লাভ করে তার সাহায্যে পানি ও কার্বনডাই-অক্সাইডের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে কার্বোহাইড্রেড উৎপাদন করে। পানি থেকে হাইড্রোজেন যুক্ত হয় কার্বনডাই-অক্সাইডের সঙ্গে। কিমোট্রপিক ব্যাকটিরিয়া স্বাভাবিক পরিবেশে জৈব বস্তুর উপস্থিতিতে মরে যায় না। কিন্তু কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে ( culture medium ) যেকোন প্রকার জৈব বস্তুর সংস্পর্শে মরে যেতে থাকে। তাই এদের আবাদ মাধ্যমে কোন প্রকার জৈব বস্তু ব্যবহার করা চলে না। এগার (agar)-এর পরিবর্তে ব্যবহার করতে হয় সিলিকা জেল (silica gel)।

২। **অক্সিজেন :** অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে জৈব বস্তু থেকে। অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া গ্লুকোজ থেকে কার্বন গ্রহণ করতে পারে। অটোট্রপিক ব্যাকটিরিয়া অক্সিজেন লাভ করে কার্বনডাই-অক্সাইড থেকে।

৩। **নাইট্রোজেন :** কিছু ব্যাকটিরিয়া ও নীল-সবুজ শৈবাল বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়া থেকে প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেন ($N_2$) থেকে খাদ্যবস্তু উৎপাদন করতে পারে না। অনেক ব্যাকটিরিয়া তাদের বৃদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ আমাইনো অ্যাসিড-এর প্রয়োজন করে। তবে অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া অ্যামোনিয়া ঘটিত লবণ, যেমন $(NH_4)_5 CO_3$ এবং নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে জাত লবণ, যেমন, $KNO_4$, গ্রহণ করে তা থেকে তাদের দেহের প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু কোন কোন ব্যাকটিরিয়ামকে তাদের নাইট্রোজেনের জন্য বিশেষ বিশেষ জৈব বস্তুর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হতে দেখা যায়। যেমন ক্লসট্রিডিয়াম অ্যাসিডিইউরিসি ( Clostridium acidiurioi ) কেবল ইউরিয়া থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। আবাদ মাধ্যমে ইউরিয়া যোগ না করলে এসব ব্যাকটিরিয়া চাষ করা যায় না।

৪। **ফসফরাস :** অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া অজৈব ফসফেট যেমন, ($KH_2PO_4$) থেকে ফসফরাস গ্রহণ করতে পারে। ব্যাকটিরিয়া ফসফরাস গ্রহণ করে ফসফেট আয়ন হিসাবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া আছে, যারা কেবল জৈব যোগ থেকেই ফসফরাস গ্রহণ করতে পারে। এইসব জৈব বস্তুর মধ্যে পাইরিডকসাল ফসফেটের (Pyridoxsal phosphate) কথা বিশেষভাবে

banglainternet.com



কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফসফরাস ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবের নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্যতম উপাদান। ফসফরাস নিউক্লিওটাইড, যেমন, ATP-এর অন্যতম উপাদান।

৫। **সালফার বা গন্ধক :** অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া সালফেট আয়ন হিসাবে সালফার গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কিছু ব্যাকটিরিয়া কেবল জৈব-যৌগ, যেমন, সিসটিন (cystine) থেকে গন্ধক গ্রহণ করতে পারে। সিসটিন একটি গন্ধক ঘটিত অ্যামাইনো অ্যাসিড। অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া অজৈব গন্ধক গ্রহণ করে সিসটিন উৎপাদন করতে পারে।

৬। **পটাশিয়াম :** অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া পটাশিয়াম আয়ন সহজেই গ্রহণ করতে পারে। পটাশিয়াম আয়ন অনেক এনজাইমের সক্রিয়তার জন্য প্রয়োজন হয়। যদিও কোন জৈব পদার্থের গঠনে পটাশিয়াম প্রয়োজন করেনা।

৭। **ক্যালসিয়াম :** ব্যাকটিরিয়া আয়ন হিসাবে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে পারে। ক্যালসিয়াম প্রধানতঃ এনজাইম সক্রিয়ক (activator) হিসাবে কাজ করে। ব্যাকটিরিয়া কোষপ্রাচীরে ক্যালসিয়াম থাকে না।

৮। **ম্যাগনেসিয়াম :** ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল গঠনে লাগে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়ায় ক্লোরোফিল থাকে না। এছাড়া ম্যাগনেসিয়াম ATP গঠনে সাহায্য করে। ব্যাকটিরিয়া ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত লবণ থেকে ম্যাগনেসিয়াম গ্রহণ করতে পারে।

৯। **লৌহ :** লৌহ সাইটোক্রোম ( cytochrome ) এবং অন্য কয়েক প্রকার এনজাইম গঠনে লাগে। লৌহ অনেক এনজাইম কো-ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে।

## খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থ

কতকগুলি মৌলিক পদার্থ ব্যাকটিরিয়া খুব স্বল্প পরিমাণে প্রয়োজন করে। এরা হলো কোবাল্ট, তামা, দস্তা, মলিবডেনাম। এরা সবাই এনজাইম-এর ক্রিয়ার কোন না কোন প্রকার অংশ গ্রহণ। খুব সামান্য পরিমাণ মলিবডেনাম না পেলে রাইজোবিয়াম (Rhijobium) গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়া বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে পারে না। অস্ট্রেলিয়ায় অনেক অঞ্চলে মাটিতে মলিবডেনামের অভাব থাকায় সেখানে সিম জাতীয় গাছের শিকড়ে রাইজোবিয়াম গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়া বাতাসের নাইট্রোজেনকে কাজে লাগাতে

পারত না। কিন্তু প্রতি একরে মাত্র ১ আউন্স (২৮ গ্রাম মলিবডেনাম যোগ করলেই তা থেকে রাইজোবিয়াম ব্যাকটিরিয়া তার প্রয়োজনীয় মলিবডেনাম ( molybdenum ) লাভ করতে পারে। জমিতে সিম জাতীয় গাছ সহজেই হতে পারে।

### বায়োজ বা অতি সামান্য পরিমাণে প্রয়োজনীয় জৈব বস্তু

জীবাণুদের পুষ্টির জন্য অনেক ক্ষেত্রে এক বা একাধিক জৈব বস্তু খুব অল্প মাত্রায় লাগে। এসব পুষ্টি বস্তু এসব জীবাণু নিজ দেহে উৎপাদন করতে পারে না। এদের সাধারণভাবে বলে বায়োজ (biose)। অনেক বায়োজ হলো আমাদের খুব পরিচিত ভাইটামিন (vitamin)। কিন্তু সব বায়োজ ভাইটামিন নয়। অনেক ব্যাকটিরিয়াকে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে চাষ করতে হলে ভাইটামিন $বি_1$ বা থায়ামিন (thiamins) যোগ করতে হয়। মানুষের দেহে কোন ভাইটামিনের অভাব হলে মানুষ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানুষের রক্তে ভিটামিনের অভাব হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করতে হলে রক্ত নিয়ে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে যোগ করে তার মধ্যে উপযুক্ত ব্যাকটিরিয়া বা অন্য জীবাণু আবাদ করে দেখা হয়, তা ঠিকমত বৃদ্ধি পেতে পারছে কিনা। যদি ঠিকমত বৃদ্ধি পেতে না পারে, তবে বুঝতে হবে রক্তে ঐ বিশেষ ভাইটামিনের, অর্থাৎ যে ভাইটামিনটি জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন, তার ঘাটতি পড়েছে। খুব কম পরিমাণে ঘাটতি, এভাবে জীবাণুর মাধ্যমে ধরতে পারা যায়। জীবাণুর সাহায্যে এভাবে ভিটামিন ও অন্য বস্তুর পরিমাপ করাকে বলে জীবতাত্ত্বিক পরিমাপ বা বায়ো-অ্যাসে (bio-assay)।

### পুষ্টি গ্রহণ

এক সময় মনে করা হত, পুষ্টিবস্তু (nutrient) কোষের বাইরে থেকে কোষের মধ্যে প্রবেশ করে সাধারণ ব্যাপন (diffusion) প্রক্রিয়ায়। কিন্তু এখন এই মতকে আর সমর্থন করা হয় না। কারণ, কেবল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পুষ্টিবস্তু জীবাণু কোষে প্রবেশ করলে তা যে হারে কোষের মধ্যে প্রবেশ করত, তার চাইতে অধিকহারে পুষ্টিবস্তু কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। কেবল ব্যাপন প্রক্রিয়ার ফলে যদি পুষ্টিবস্তু কোষের মধ্যে প্রবেশ করত, তবে সব সময় পুষ্টিবস্তুর পরিমাণ কোষের বাইরে বেশি থাকতে হবে। কারণ ব্যাপন নির্ভর

banglainternet.com



করে যে বস্তু ব্যাপ্ত হচ্ছে তার ঘনত্বের উপর। কিন্তু কোন পুষ্টি দ্রব্য বাইরে থেকে কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকলে, বাইরে দ্রবণের মধ্যে যদি তার মাত্রা অনেক কমে যায় ও কোষের ভিতরে যদি তার মাত্রা অনেক বেড়েও যায়, তথাপি বাইরে থেকে পুষ্টিবস্তুটি প্রবেশ করতেই থাকে। তার প্রবেশ করা বন্ধ হয়ে যায় না। কোষের মধ্যে পুষ্টিবস্তুর প্রবেশ যদি কেবল ব্যাপন বিক্রিয়ার ফল হত তবে এরকম হতে পারতো না। কোন পুষ্টিবস্তুর মাত্রা যখন কোষের বাইরে ও ভেতরে সমান হত, তখন বাইরে থেকে সেই পুষ্টিবস্তু কোষের মধ্যে যাওয়া আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যেত। তাছাড়া সব বস্তু কোষের মধ্যে যেতে পারে না। কোন বস্তু যেতে পারবে, তা নির্ভর করে কোষের প্রয়োজনের উপর। এখন জানা গিয়েছে, কোষের বাইরে থেকে পুষ্টিবস্তু কোষের মধ্যে যাওয়া নির্ভর করে এক শ্রেণীর এনজাইমের উপর। এই শ্রেণীর এনজাইমকে বলা হয় পরিবহন এনজাইম (transporting enzyme) বা পারমিয়াজ (permiases)। এরা ঠিক কোষ আবরণের উপরিভাগে থাকে। সেখানে পুষ্টিবস্তুর সঙ্গে অস্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। সেখানে যাবার পর তাদের থেকে পুষ্টিবস্তু বিযুক্ত হয়ে যায়। পুষ্টিবস্তু বিযুক্ত হবার পর এসব এনজাইম আবার ফিরে আসে কোষ-আবরণের (external plasma membrane) উপরিভাগে। এই আসা-যাওয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা সম্ভবতঃ যোগায় শক্তিসমৃদ্ধ যৌগ ATP। বাইরে থেকে যখন কোষের মধ্যে পুষ্টিবস্তু দ্রুত ঢুকতে থাকে, তখন সাধারণতঃ শ্বাসক্রিয়ার মাত্রাও অধিক হতে দেখা যায়। শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে ATP উৎপাদন জড়িত। তবে এই শ্রেণীর এনজাইম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও যথেষ্ট নয়। যতদূর মনে হয়, বিভিন্ন বস্তু বহনের জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন পরিবহন এনজাইম। সব বস্তু কোষের মধ্যে ঢুকতে পারে না। কারণ, কোষে তাদের বহন করবার মত এনজাইম উৎপাদিত হয় না।

খুব বড় অণু কোষ-আবরণের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। বড় অণুদের ভেঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট অণুতে পরিণত করতে হয়। জীবাণুরা এমন অনেক এনজাইম তাদের কোষের বাইরে ক্ষরণ করে, যারা বড় অণু ভেঙ্গে ছোট অণু উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমন বিশেষ ব্যাকটিরিয়া ব্যাসিলাস ম্যাসিরান্স (Bacillus macerarns) তার কোষের বাইরে এনজাইম অ্যামাইলাজ ( amylase ) ক্ষরণ করে। অ্যামাইলাজ-এর উপস্থিতিতে পানি ও স্টার্চ ( starch )-এর মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে। এর ফলে স্টার্চ ভেঙ্গে ম্যালটোজে

(maltose) রূপান্তরিত হয়। ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন প্রোটিনভঙ্গকারী এনজাইম (proteolytic enzymes) ক্ষরণ করে তাদের কোষের বাইরে অবস্থিত প্রোটিন বস্তুকে ভেঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড (amino acid) সৃষ্টি করতে পারে। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড তাদের কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রোটিয়াস (Proteus) এবং ক্লসট্রিডিয়াম (Clostridium) গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়া তাদের কোষের বাইরে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিনভঙ্গকারী বিভিন্ন এনজাইম ক্ষরণ করে। যার ফলে প্রোটিনের আর্দ্রবিশ্লেষণ (hydrolysis) ঘটে।

এভাবে বড় অণু ভেঙ্গে ছোট অণুর সৃষ্টি হওয়াকে বলে হজম প্রক্রিয়া। সাধারণ উদ্ভিদকোষে হজম প্রক্রিয়া কোষের মধ্যে ঘটে। কিন্তু ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকদের ক্ষেত্রে হজম প্রক্রিয়া ঘটে সাধারণতঃ কোষের বাইরে। বাইরে অপেক্ষাকৃত বড় অণু ভেঙ্গে ছোট অণুতে পরিণত না হলে তারা পুষ্টিবস্তু গ্রহণ করতে পারে না। যেসব ব্যাকটিরিয়া এবং ছত্রাক গাছের রোগ উৎপাদন করে, তারা পেকটিনাজ (pectinase) নামক এক শ্রেণীর এনজাইম ক্ষরণ করে। যার ফলে মিডল ল্যামেলা (middle lamella) ভেঙ্গে যায়। কারণ, মিডল ল্যামেলা ক্যালসিয়াম পেকটিনেজ দ্বারা গঠিত। পেকটিনাজ (pectinase) ক্যালসিয়াম পেকটিনেট-এর আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটায়।

যেসব জীবাণুদের আমরা সাধারণতঃ উদ্ভিদ হিসাবে গণ্য করে থাকি তাদের হজমক্রিয়া ঘটে কোষের বাইরে। এ ধরনের হজমক্রিয়াকে বলে কোষ বহির্ভূত হজম প্রক্রিয়া (extracellular digestion)। কিন্তু যেসব জীবাণুদের সাধারণতঃ বিবেচনা করা হয় প্রাণী হিসাবে, তাদের ক্ষেত্রে হজমক্রিয়া ঠিক কোষের বাইরে ঘটে না। এককোষী প্রাণী অ্যামিবা (amoeba) যখন কোন খাদ্য কণিকার সংস্পর্শে আসে তখন সে তাকে তার অর্ধ-তরল দেহ বস্তুর সাহায্যে ঘিরে ফেলে এবং তাকে নিজ কোষের মধ্যে নিয়ে নেয়। সেখানে ধীরে ধীরে তাকে বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে হজম করে। এভাবে খাদ্য কণিকাকে দেহের মধ্যে গ্রহণ করাকে বলা হয় ইনজেসশন (ingestion)।

জীবাণুদের কাজে লাগিয়ে তাদের সাহায্যে কোন অর্থকরী দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে অনেক সময় তাদের তরল আবাদ মাধ্যমকে নাড়াবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হয়। এভাবে আবাদ মাধ্যম নাড়াবার ব্যবস্থা থাকলে জীবাণুরা আবাদ মাধ্যমের সকল অংশ থেকে পুষ্টিবস্তু গ্রহণ করতে পারে।

অধিকাংশ জীবাণু বাইরে থেকে পুষ্টিবস্তু তাদের কোষের সমস্ত

banglainternet.com



উপরিভাগের সাহায্যে শোষণ করে। জীবাণুদের কোষের উপরিভাগের ক্ষেত্রফল (surface area) তাদের ওজনের অনুপাতে অনেক বেশি। তারা অনেক অধিক মাত্রায় পুষ্টিবস্তু গ্রহণ করে তার রাসায়নিক রূপান্তর ঘটাতে পারে। জীবাণুদের রাসায়নিক সক্রিয়তার এইটা বিশেষ কারণ।*

* উন্নত প্রাণীরা সবচেয়ে কম রাসায়নিক রূপান্তর ঘটাতে পারে। এর একটা কারণ তারা হজম করে ও পুষ্টিবস্তু গ্রহণ করে শরীরের বিশেষ অংশে। সর্বশরীর দিয়ে তারা খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে পারে না। দেহের প্রতিকোষ হজমের কাজে নিয়োজিত নয়।

একাদশ অধ্যায়

# ব্যাকটিরিয়ার শ্রেণীবন্ধন

বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া সম্বন্ধে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় বারজির ম্যানুয়ালে (Burgey's manual)। এই ম্যানুয়েল প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে, আমেরিকান ব্যাকটিরিওলজিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে, বারজির (B. bergey) সম্পাদনায়। তার পর থেকে এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৪ সালের সংস্করণে নানা দিক থেকে খুব বেশী পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এর আগের সংস্করণগুলিতে ব্যাকটিরিয়া নিয়ে আলোচনার সময় তাদের প্রথমতঃ বিভক্ত করা হত বিভিন্ন প্রজাতিতে (species)। যেসব প্রজাতির মধ্যে সম্পর্ক কাছের বলে বিবেচিত হত, তাদের করা হত একটি গণ বা জেনাস ভুক্ত (geuns)। যেসব জেনাসদের মনে হত নিকট সম্বন্ধযুক্ত, তাদের স্থাপন করা হত একই পরিবারে (family)। নিকট সম্পর্কযুক্ত হিসাবে বিবেচিত পরিবারদের স্থাপন করা হত একই অর্ডার (order) বা বর্গে। এই রকম বিভাগ করবার সময় এবং ব্যাকটিরিয়ার নামকরণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অনুসরণ করা হত উদ্ভিদবিদ্যার (Botany) মূল নিয়ম। কারণ, সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হত, ব্যাকটিরিয়া এক ধরনের খুব আদিম উদ্ভিদ। তাদের স্থাপন করা হত উদ্ভিদ রাজ্যে (Kingdom Plantae) ১৮৩৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী এহ্‌রেনবার্গ (C. Ehrenburg) জীবাণুদের চারভাগে ভাগ করেন : ব্যাকটিরিয়া (bactiria), ভিবরিও (vibrio), স্পাইরিলা (spirilla) এবং স্পাইরোকিটস (spirochactes)। গোড়ায় ব্যাকটিরিয়া বলতে কেবল দণ্ডাকৃতি, ক্লোরোফিলবিহীন, শক্ত প্রাচীরযুক্ত এককোষী জীবাণুদের বোঝাত। এখনকার মত ব্যাকটিরিয়া শব্দটিকে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত না।

১৮৫৪ সালে জার্মান উদ্ভিদবিদ (Botanist) কহন, (F. Cohn) প্রথম ব্যাকটিরিয়া ও নীল-সবুজ শৈবাল (blue-gren algae) মধ্যেকার সাদৃশ্য সম্পর্কে বিবেচনা করে ব্যাকটিরিয়া ও নীল-সবুজ শৈবালদের স্থাপন করেন উদ্ভিদ রাজ্যে, একটি বিশেষ বিভাগে। তিনি এই বিভাগের নাম দেন সাইজো-ফাইটা (Schizophyta)। কারণ এসব উদ্ভিদ সমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বংশ-বিস্তার করে। কহন ব্যাকটিরিয়া শব্দটির অর্থ সম্প্রসারণ ঘটান। তিনি ব্যাক-টিরিয়া বলতে কেবল দণ্ডাকৃতি ক্লোরোফিলবিহীন জীবাণুদের না বুঝিয়ে



কক্কাই, ভিবরিও, স্পাইরিলা এবং স্পাইরোকিটদেরও বোঝান। কহন-এর সময় আর একজন জার্মান উদ্ভিদবিদ, নিগেলি (C. Naegali) ১৮৫৭-সালে ব্যাকটি-রিয়া ও ছত্রাকদের মনে করেন নিকট সম্বন্ধীয়। তিনি ব্যাকটিরিয়াকে বর্ণনা করেন দ্বিভাজন-ছত্রাক (Schizomycetes) হিসাবে। তিনি সমস্ত ব্যাকটিরিয়াকে সাইজোমাইসেটিস শ্রেণী ভুক্ত (class) করেন।

বারজির ম্যানুয়ালে সপ্তম সংস্করণ অবধি ব্যাকটিরিয়াকে উদ্ভিদ হিসাবে গণ্য করা হয় নিকট সম্বন্ধযুক্ত আদিম পর্যায়ের উদ্ভিদ (Protophyta) হিসাবে। কিন্তু বারজির ম্যানুয়েলে ব্যাকটিরিয়া ও নীল-সবুজ শৈবালদের স্থাপন করা হয়েছে একটি পৃথক রাজ্যে (Kingdom)। এই রাজ্যের নাম দেওয়া হয়েছে প্রোক্যারিওটি (Procaryotae)।

প্রোক্যারিওটা (Procaryota) ও ইউক্যারিওটা (Eucaryota) শব্দ দু'টি প্রথম ব্যবহার করেন সাটন (Chatton), ১৯৩০।

উদ্ভিদবিদরা সাধারণতঃ প্রোক্যারিওটা এবং ইউক্যারিওট শব্দ দু'টি ব্যবহার করেন উদ্ভিদ রাজ্যকে দু'টি উপ-রাজ্যে (sub-kingdom) ভাগ করবার জন্য। প্রোক্যারিওটা শব্দটির দ্বারা তাঁরা একটি পৃথক রাজ্যকে বোঝাতে চান না।*

বারজির বিখ্যাত ম্যানুয়ালের (Bergy's Manual of Determinative Bacteriology) অষ্টম সংস্করণে সব ব্যাকটিরিয়াকে পরিবার বন্ধনে আবদ্ধ করে আলোচনা করবার চেষ্টা করা হয়নি। কারণ, এভাবে পরিবার গঠন করে আলোচনা করতে হলে যে ধরনের তথ্য থাকা দরকার, সর্বক্ষেত্রে তা নেই। এই সংস্করণে ব্যাকটিরিয়াকে ১৯ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। এই ভাগ কোন শ্রেণীবন্ধনগত ভাগ (Taxon) নয়। ব্যাকটিরিয়া বর্ণনা ও সনাক্ত করবার সুবিধার জন্য তৈরি ভাগ।

### বারজির ম্যানুয়ালের বর্তমান বিভাগ

১। ফোটোট্রপিক বা সালোক সংশ্লেষক ব্যাকটিরিয়া ( Phototrophic bacteria)।

২। পিছলে-চলা ব্যাকটিরিয়া ( gliding bacteria )।

৩। আবরণযুক্ত ব্যাকটিরিয়া ( sheath bacteria )।

৪। বাডিং ব্যাকটিরিয়া এবং / অথবা অ্যাপেনডেজ্‌ড্‌ ব্যাকটিরিয়া (budding bacteria and / or apendaged bacteria)।

* Alam J. Brook (1965) : The Living Plant. P. 342, Edinburgh University Press.

banglainternet.com

৫। স্পাইরোকিটস (spirochetes)।

৬। পেচাল ও বক্র ব্যাকটিরিয়া (spiral or curved bacteria)।

৭। গ্রাম-নেগেটিভ বায়ুজীবী দণ্ডাকৃতি ও গোল ব্যাকটিরিয়া (gram-negative aerobic rods and Cocci)।

৮। গ্রাম-নেগেটিভ সুবিধাবাদী অবায়ুজীবী দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া (gram-negative facultatively anaerobic rods)।

৯। গ্রাম-নেগেটিভ অবায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া (gram-negative anaerobic bacteria)।

১০। গ্রাম-নেগেটিভ কক্কাই ও কক্কোব্যাসিলি (gram-negative Cocci and Cocco bacilli)।

১১। গ্রাম-নেগেটিভ অবায়ুজীবী কক্কাই ( gram-negative anaerobic cocci)।

১২। গ্রাম-নেগেটিভ কিমোলিথোট্রপিক ব্যাকটিরিয়া (gram-negative chemolithotropic bacteria)।

১৩। মিথেন উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া (methene-producing bacteria)।

১৪। গ্রাম-পজেটিভ গোল ব্যাকটিরিয়া (gram-positive Cocci)।

১৫। এণ্ডোস্পোর উৎপাদক দণ্ডাকৃতি ও গোলাকৃতি ব্যাকটিরিয়া (endo-spore-forming rods and Cocci)।

১৬। গ্রাম-পজেটিভ স্পোর অনুৎপাদক দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া (gram-positive asporogenous rod-shaped bacteria)।

১৭। অ্যাকটিনো মাইসেটিস ও তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জীবাণু (actino-mycetes and related organisms)।

১৮। রিকেটসিয়া ( rickettsias )।

১৯। মাইকোপ্লাজমা ( mycoplasmas )।

বারজির ম্যানুয়ালে এখন ব্যাকটিরিয়াকে এভাবে ভাগ করায় ব্যাকটিরিয়া সনাক্ত করণে অনেক সুবিধা হয়েছে।

কিন্তু যেসব ব্যাকটিরিয়া আমাদের কাছে খুব পরিচিত তাদের পুরান ধারায় বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করে আলোচনা সম্ভব। আমরা এরকম কতগুলি পরিবারের বিবরণ প্রদান করছি। এর ফলে ব্যাকটিরিয়া সম্পর্কে একটা সমগ্র ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। যেসব ব্যাকটিরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে, যেসব ব্যাকটিরিয়া জমির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধির সহায়তা করে এবং



যেসব ব্যাকটিরিয়া মানুষ, গৃহপালিত পশু-পাখি এবং ফসলের রোগ উৎপাদন করে তাদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে এই পরিবারগুলি নির্বাচন করা হয়েছে।

ব্যাকটিরিয়া সালোক-সংশ্লেষণ সম্পর্কে গবেষণা করতে যেয়েই প্রথম জানতে পারা যায় সবুজ উদ্ভিদদের সালোক-সংশ্লেষণ প্রণালীর সম্পর্কে গবেষণার সূত্র। সম্ভবতঃ ব্যাকটিরিয়ার মধ্যেই পাওয়া যায় সালোক-সংশ্লেষণের আদিম রূপ। আমরা তাই সালোক-সংশ্লেষক ব্যাকটিরিয়া পরিবার নিয়েও আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি এখানে।

উন্নত উদ্ভিদ ক্ষেত্রে পরিবার গঠনের সময় তাদের দেহের আকৃতি, অঙ্গ সংস্থান এবং বিশেষ করে ফুলের অর্থাৎ জন্মাঙ্গের বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ ফুলের বৈশিষ্ট্য পরিবেশের প্রভাবে সহজে পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু ব্যাকটিরিয়ার পরিবার গঠনের সময় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাদের দেহক্রিয়া গত বৈশিষ্ট্যের (physiological characters) উপর। পরিবার বলতে এক্ষেত্রে প্রধানতঃ বোঝায় একই ধরনের দেহক্রিয়া বিশিষ্ট ব্যাকটিরিয়া। যা আবার শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে তাদের এনজাইমের রাসায়নিক চরিত্রের উপর। অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়াকে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে হলে প্রধানতঃ তারা কি করে তার বর্ণনা দিতে হয়। কেবল তারা দেখতে কেমন, তা বল্লে চলে না।

## জৈব-বস্তু নির্ভর সাধারণ ব্যাকটিরিয়া

১। **সিউডোমোনাডেসি** (Pseudomonadaceae) : গ্রাম-নেগেটিভ দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া। বায়ুজীবী। সাধারণতঃ নড়াচড়া করতে পারে। ফ্ল্যাজেলা মেরু অংশিও (polar flagella)। ফ্ল্যাজেলা সংখ্যা এক থেকে একাধিক হতে পারে। একাধিক ফ্ল্যাজেলা গুচ্ছাকারে থাকে। কিছু প্রজাতি চলাচল শক্তিবিহীন। অনেকে পানিতে দ্রবণীয় রঞ্জক বস্তু উৎপাদন করে। অনেকে যে রঞ্জক বস্তু (pigment) উৎপাদন করে তা পানিতে দ্রবীভূত হয় না। সাধারণতঃ আবাদ মাধ্যমের উপরিভাগে সহজেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সাধারণতঃ মাটিতে অথবা পানির মধ্যে থাকে। সমুদ্রের খুব লোনা পানিতেও এই পরিবারভুক্ত ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায়। এই পরিবারের অনেক ব্যাকটিরিয়া উদ্ভিদ রোগ উৎপাদক। সামান্য কয়েকটি প্রজাতি মানুষেরও রোগের কারণ হতে পারে। খুব পরিচিত গণ (genera), সিউডোমোনাস (Pseudomonas) এবং জ্যানথোমোনাস

banglainternet.com

( xanthomonas )। সিউডোমোনাস মাটিতে থাকে। অনেক সিউডোমোনাস মানুষ ও উদ্ভিদের রোগ উৎপাদক। জ্যানথোমোনাস কেবল উদ্ভিদের রোগ উৎপাদক। এই পরিবারে অনেক সময় অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়াদেরও (acetobacter) স্থাপন করা হয়। এরা অ্যালকোহলকে অ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত করে।

২। **এনটেরোব্যাকটিরিয়েসি** (Enterobacteriaceae) : গ্রাম-নেগেটিভ দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া। সাধারণ কথায় কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া (coliform bacteria) বলে উল্লেখ করা হয়। অনেকে নড়াচড়া করে বেড়াতে পারে। এদের পেরিট্রিকাস (peretrichous) ফ্ল্যাজেলা থাকে। সহজেই আবাদ করা যায়। বায়ুজীবী। সকলেই গ্লুকোজ ভেঙ্গে অ্যাসিড অথবা অ্যাসিড ও গ্যাস উৎপাদন করতে পারে। সকলেই নাইট্রেটকে নাইটাইট্রে রূপান্তরিত করতে পারে। ক্যাটালেজ নামক এনজাইম উৎপাদনে সক্ষম। অনেকে মৃতজীবী (saprophytic)। অনেকে মানুষ ও প্রাণীদের অন্ত্রের মধ্যে থাকে ও রোগ উৎপাদনে সক্ষম। এই পরিবারের কিছু ব্যাকটিরিয়া উদ্ভিদের নরম-পচা (soft-rot) রোগ উৎপাদন করে। সম্ভবতঃ এই পরিবারভুক্ত ব্যাকটিরিয়া নিয়ে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী গবেষণা হয়েছে। কতকগুলি গণ (genera) : ইসচেরিচিয়া (Escherichia), স্যালমোনিলা (Salmonella), সিগেলা (Shigella), প্রোটিয়াস ( Proteus ), সেরাটিয়া (Serratia), আরউইনিয়া (Erwinia), পেকটো-ব্যাকটিরিয়াম ( Pecto bacterium ), ক্লেবসিয়েলা (Klebsiella), এরোব্যাকটার (Aerobacter)।

স্যালমোনিলা গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়া টাইফয়েড রোগের কারণ; সিগেলা গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়া রক্ত আমাশার কারণ; ক্লেবসিয়েলা, একপ্রকার নিউমোনিয়া রোগ ও মূত্রনালীতে রোগ উৎপাদন করতে পারে। আরউইনিয়া উদ্ভিদের সুফলে ক্ষত রোগ, মিইয়েপড়া (wilt) রোগ সৃষ্টি করে। পেকটোব্যাকটিরিয়াম গাছের অংশ বিশেষকে পচিয়ে ফেলে। ইসচেরিচিয়া কোলাই নামক ব্যাকটিরিয়াম উপস্থিতি কোন পানিতে বেশি হলে বুঝতে হবে সেই পানি মানুষের মল দ্বারা দূষিত হয়েছে এবং পানের যোগ্য নয়। ইসচেরিচিয়া কোলাই (Escherichi coli) ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে বহুবিধ গবেষণার কাজ চালানো হয়। কারণ এই ব্যাকটিরিয়াম সহজেই আবাদ করা চলে এবং তা পরীক্ষাগারে খুবই পরিচিত।



৩। **ল্যাকটোব্যাসিলেসি** ( Lactobacillaceae ) : দণ্ডাকৃতি গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়া। স্পোর হয় না। নড়াচড়া করে বেড়াতে পারে না। কার্বোহাইড্রেট ভেঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে। দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদজাত দ্রব্যের সঙ্গে জড়িত থাকে। মুখে, যোনীপথে (vagina) ও অন্যান্য অংশেও পাওয়া যায়। অল্প বায়ুজীবী। অনেক সময় পর পর শিকলের আকারে কোষগুলি যুক্ত থাকতে পারে। দৃষ্টান্ত, ল্যাকটোব্যাসিলাস (lactobacillus)। আগে এই পরিবারে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদক স্ট্রেপটোকক্কাস (streptococcus) এবং লিউকমোস্টকদেরও (leucomostoc) স্থাপন করা হত। এরা গোলাকৃতি। কিন্তু এখন সাধারণতঃ এদের স্থাপন করা হয় পৃথক পরিবারে। এই পৃথক পরিবারকে উল্লেখ করা হয় স্ট্রেপটোককেসি (streptococcaceae) হিসাবে।

৪। **নেইসেরিয়েসি** (Neisseriaceae) : গ্রাম-নেগেটিভ গোলাকৃতি ব্যাকটিরিয়া। সাধারণতঃ জোড়ায় জোড়ায় থাকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রজাতি, নেইসেরিয়া গনোরি ( Neisseria gonorrhoeae )। মানুষের গনোরিয়া রোগের কারণ এবং নেইসেরিয়া মেনিনজাইটিডিস ( N. meningitidis ), মানুষের মেনিনজাইটিস রোগের একটি কারণ।

৫। **মাইক্রোককেসি** (Micrococcaceae) : গোলাকার গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়া। এই পরিবারের বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো মাইক্রোকক্কাস (micrococus), স্ট্যাফাইলোকক্কাস ( staphylococcus ) এবং সারসিনা (sarcina)। মাইক্রোকক্কাস কোষ বিশেষভাবে চারটি চারটি করে ( tetrads ) কাছাকাছি থাকে অথবা ছড়িয়ে এলোমেলো হয়ে যায়। স্ট্যাফাইলোকক্কাসরা এমনভাবে বিভক্ত হয় যে দেখে মনে হয় আঙ্গুরের থোকার মত। সারসিনা খাড়াভাবে তিন দিকে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ প্রথমবার যেদিক বিভক্ত হয় তার পরের বার সেদিক হয় না। দ্বিতীয়বার যেদিকে বিভক্ত হয়, তৃতীয়বার সেদিকে হয় না। ফলে এদের দেখে মনে হয় ঘনক আকৃতির প্যাকেটের (cubical packet) মত। সারসিনাকে এখন একটি আলাদা পরিবারে স্থাপন করা হয়। এই পরিবারকে বলে পেপটোককেসি (peptococcaceae)। পেপটোককেসি পরিবারভুক্ত ব্যাকটিরিয়া অবায়ুজীবী (anaerobic)।

মাইক্রোকক্কাস মাটিতে, পানিতে এবং গন্ধজাত দ্রব্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। এরা মৃতজীবী অথবা পরজীবী। কিন্তু রোগ উৎপাদন করে। এরা পুঁজ উৎপাদক। এদের জন্য ফোঁড়া হয়। তবে সব স্ট্যাফাইলোকক্কাস রোগ উৎপাদক নয়।

banglainternet.com

৬। **প্রোপিওনিব্যাক্টিরিয়েসি** (Propionibactriaceae) : গ্রাম-পজেটিভ অনিয়মিত দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া। কার্বোহাইড্রেট ভেঙে প্রোপিওনিক অ্যাসিড উৎপাদন করতে সক্ষম। মুক্ত অক্সিজেনের অভাবে ভালভাবে বৃদ্ধি পায়। মানুষ ও প্রাণীদের অন্ত্রে থাকে। দুগ্ধজাত দ্রব্যে থাকে। দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতে লাগে। বিশেষভাবে পরিচিত জেনাস, প্রোপিওনিব্যাকটিরিয়াম (Propionibacterium)।

৭। **স্পাইরিলেসি** (Spirillaecae) : দণ্ডাকৃতি শক্ত কোষপ্রাচীর যুক্ত প্যাঁচাল ব্যাকটিরিয়া। সাধারণতঃ নড়াচড়া করতে পারে। প্রতি কোষে একটি করে ফ্ল্যাজেলাম (flagellum) থাকে (কখন দুটি এবং খুব কমক্ষেত্রে গুচ্ছাকারে ফ্ল্যাজেলা থাকতে পারে)। সাধারণতঃ কোষের এক প্রান্তে ফ্ল্যাজেলাম যুক্ত থাকে। এরা প্রধানতঃ পানিতে থাকে। স্পাইরিলাম মাইনাস (Spirillum minus) মানুষের রোগ উৎপাদন করে। আগে এই পরিবারে কলেরা রোগের জীবাণু ভিবরিও কমা ( Vibrio comma )-কে স্থাপন করা হত। কিন্তু এখন এ ধরনের বাকান ব্যাকটিরিয়াদের স্থাপন করা হয় একটি স্বতন্ত্র পরিবারে। এই পরিবারকে বলা হয় ভিবরিওনেসি (Vibrionaceae )। ভিবরিওনেসি পরিবারভুক্ত ব্যাকটিরিয়া গ্রাম-নেগেটিভ। এরা প্যাঁচাল নয়। সামান্য পরিমাণে বাঁকা।

৮। **মিথেনোব্যাকটিরিয়েসি** (Methanobacteriaceae) : এরা সকলেই মিথেন ($CH_4$) উৎপাদনে সক্ষম। তিনটি জেনেরা বিশেষভাবে পরিচিত। মিথানোব্যাকটেরিয়াম (Methanobacterium), মিথানোসারসিন (Methanosarsin), মিথানোকক্কাস (Methanococcus) এরা সকলেই অবায়ুজীবী (anaerobic)। সাধারণ জলাভূমিতে (mashes) থাকে। গবাদি পশুর পাকস্থলিতেও থাকে। এখানে তারা উদ্ভিদজাত দ্রব্যকে ভেঙে মিথেন উৎপাদন করে। মিথেন ব্যাকটিরিয়া সাধারণতঃ বাতাসের মুক্ত অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসলে বাঁচে না। এরা বিশেষভাবেই অবায়ুজীবী (strict anaerobic)। তাই এদের আবাদ করতে হলে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এই পরিবারভুক্ত ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ অবস্থায় কেবল অজৈব বস্তুর উপর নির্ভর করেও বেঁচে থাকতে পারে (Chemolithotropic growth)।

৯। **অ্যাজোটোব্যাকটিরিয়েসি** (Agotobacteriaceae) : গ্রাম-নেগেটিভ দণ্ড ও বিভিন্ন আকৃতির ব্যাকটিরিয়া। অনেক সময় ইস্টের মত। বায়ুজীবী। মাটিতে থাকে। বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে পারে।



তিনটি গণ (genera)। অ্যাজোটো ব্যাকটার (Azoto bacter), অ্যাজোমোনাস (Azomonas), বেইজারিরিঙ্কিয়া (Beijerinckia)।

১০। **রাইজোবিয়েসি** (Rhizobiaceae) : গ্রাম-নেগেটিভ দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া। ফ্ল্যাজেলা থাকে। এই পরিবারভুক্ত ব্যাকটিরিয়া সীম জাতীয় গাছের শিকড়ে হতে পারে এবং কেবলমাত্র সেখানে থাকবার সময় বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে পারে। গাছের দ্বারা উপকৃত হয়। গাছের কাছ থেকে এরা কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করে। দুইটি গণ, রাইজোবিয়াম ( Rhizobium ), এবং অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম ( Agrobacterium )। রাইজোবিয়াম ও অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়া গাছে অর্বুদ (nodules) উৎপাদন করে। অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম গাছে রোগ উৎপাদন করে।

১১। **ব্রুসেলাসি** (Brucellaceae) : ছোট গ্রাম-নেগেটিভ দণ্ডাকৃতি অথবা গোল ব্যাকটিরিয়া। বিশেষভাবে পরজীবী। মানুষ ও অন্য উষ্ণ রক্তের প্রাণীর বিভিন্ন রোগের কারণ। চারটি গণ : পাস্তুরেলা ( Pasteurella ), ব্রুসেলা (Brucella), বরদেতেলা (Baredetella) এবং হিমোফাইলাস (Haemophilus)। এখন অনেকে এই পরিবারকে ভেঙে অন্য পরিবার গঠনের পক্ষে। তবে সাধারণভাবেই এই পরিবারের কথা স্বীকার করা হয়।

১২। **কোরাইনি ব্যাকটিরিয়েসি** (Coryne bacteriaceae) : গ্রাম-পজেটিভ দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া। কোষের দুই প্রান্ত ভাগ বিশেষভাবে ফোলা ( surlling at poles )। নড়াচড়া করতে পারে না। স্পোর হয় না। কার্বোহাইড্রেট থেকে কখন গ্যাস উৎপাদন করে না। দুধের ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে থাকতে পারে। মাটিতেও থাকে। কোন কোন প্রজাতি মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের রোগ উৎপাদনে সক্ষম। দৃষ্টান্ত, কোরাইনি ব্যাকটিরিয়া (Coryne bacterium), মাইক্রোব্যাকটিরিয়াম (Microbacterium), সেলুলোমোনাস ( Cellulomonas )। প্রথম গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়া মানুষ উদ্ভিদের রোগ উৎপাদন করতে পারে। কোরাইনিব্যাকটিরিয়াম ডিপথেরি (Coryne bacterium diptheriae) মানুষের ডিপথেরিয়া রোগের কারণ। সেলুলোমোনাস, মাটিতে থাকে। সেলুলোজ ভাঙে। মাইক্রোব্যাকটিরিয়াম দুগ্ধজাত দ্রব্যে থাকে।

১৩। **ব্যাসিলাসি** (Bacillaceae) : প্রধানতঃ দণ্ডাকৃতি গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়া। এন্ডোস্পোর (endospore) উৎপাদন করে। জৈব বস্তু, লবণে



banglainternet.com

বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। দৃষ্টান্ত, ব্যাসিলাস ( Bacillus ), ক্লসট্রিডিয়াম (Clostridium)। ব্যাসিলাসরা বায়ুজীবী। ক্লসট্রিডিয়ামরা অবায়ুজীবী। ক্লসট্রিডিয়াম এর ক্ষেত্রে স্পোর উৎপন্ন হবার পর কোষগুলি এক মাথায় বিশেষভাবে ফুলে ওঠে। স্পোরের সাহায্যে এসব ব্যাকটিরিয়া অনেক প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে। এই পরিবারভুক্ত ব্যাকটিরিয়াদের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। অনেকে মানুষ ও প্রাণীদের রোগ উৎপাদন করে। এই পরিবারের আরো একটি খুব পরিচিত গণ (genus) হলো স্পোরোসারসিনা (sporosarcina)। এদের আবরণ ব্যাসিলাসদের অনুরূপ। এরাও বায়ুজীবী (aerobes)।

১৪। **মাইকোব্যাকটিরিয়েসি** (Mycobactericeae): সরু, লম্বা দণ্ডাকৃতি অ্যাসিড-ফাস্ট (acid-fast) ব্যাকটিরিয়া। সাধারণতঃ এদের অ্যাকটিনোমাইসেটিসদের (actinomycites) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধরে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এদের মধ্যে শাখার উদ্ভব হতে দেখা যায়। এদের কোষ-প্রাচীরে মোম জাতীয় (wax) পদার্থ থাকে। এই পরিবারে পড়ে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগের জীবাণু, মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকুলোসিস ( Mycobacterium tuberculosis) এবং মাইকোব্যাকটিরিয়াম লেপরি (Myco. leprae)। এদের কারবল ফুকসিন (carbol fuchsin)-এর সাহায্যে রঞ্জিত করবার পর অ্যাসিড অ্যালকোহল (শতকরা ৯৫ ভাগ অ্যালকোহল-এর মধ্যে শতকরা ২'৫ ভাগ $HNO_3$) দিয়ে ধুলে রঙ উঠে যায় না।

## সালোক সংশ্লেষক ব্যাকটিরিয়া

ব্যাপক অর্থে ব্যাকটিরিয়া বলতে বোঝায় সেই সমস্ত প্রোক্যারিয়টদের যাদের দেহে ক্লোরোফিল-a (chlorophyll a) থাকে না (procaryon without chlorophyll a )। কিছু কিছু প্রোক্যারিয়ট আছে যাদের দেহে ক্লোরোফিল a না থাকলেও অন্য ধরনের ক্লোরোফিল থাকে। এসব ব্যাকটিরিয়াকে গণ্য করা হয় ব্যাকটিরিয়া হিসাবে। এরা আলোকশক্তির সহায়তায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্য অজৈব বস্তু অথবা খুব সরল জৈব বস্তুর বিক্রিয়া ঘটিয়ে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করতে পারে। এই সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কখনও মুক্ত অক্সিজেন ($O_2$) ছাড়া পায় না। সালোক সংশ্লেষক ব্যাকটিরিয়াকে (photosynthetic bacteria) তিনটি পরিবারে ভাগ করা যায়ঃ

banglainternet.com



১। ক্রোমাটিয়েসি (chromatiaceae) বা গৈরিক গন্ধক ব্যাকটিরিয়া। এর দৃষ্টান্ত হলো ক্রোমাটিয়াম (chomatium)।

২। ক্লোরোব্যাকটিরিয়েসি (chlorobacteriaceae) বা সবুজ গন্ধক ব্যাকটিরিয়া। এর দৃষ্টান্ত হলো ক্লোরোবিয়াম (chlorobium)।

৩। রোডোস্পাইরিলেসি (rhodospirillaccae) বা অগন্ধক গৈরিক ব্যাকটিরিয়া। এর দৃষ্টান্ত হলো রোডোসিউডোমোনাস (rhodopseudomonas)।

প্রথম দুটি পরিবারের ব্যাকটিরিয়াকে চলতি কথায় সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় রঙীন গন্ধক ব্যাকটিরিয়া (colourless sulpher bacteria) হিসাবে। ক্রোমাটিয়েসি এবং ক্লোরোবিয়েসি পরিবারের ব্যাকটিরিয়া সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্রহণ করে অজৈব বস্তু (যেমন $H_2S$) থেকে। কিন্তু রোডোস্পাইরিলেসি পরিবারভুক্ত ব্যাকটিরিয়া গ্রহণ করে সহজ জৈব পদার্থ (যেমন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড) থেকে।

সালোক সংশ্লেষক ব্যাকটিরিয়াদের ভাবা যেতে পারে খুবই আদিম পর্যায়ের জীবাণু হিসাবে। এরা সকলেই অবায়ুজীবী (anaerobic)। অর্থাৎ এরা বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন ছাড়াই বাঁচতে পারে। এরা এদের শ্বাসক্রিয়ার জন্য মুক্ত অক্সিজেনের ($O_2$) প্রয়োজন করে না। নানা কারণে পৃথিবীর আদিম বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন ছিল না, অথবা খুব কম ছিল বলেই অনুমিত হয়। এরকম পরিবেশে এই ধরনের ব্যাকটিরিয়া ছিল বাঁচবার বিশেষ উপযোগী।

## রাসায়নিক সংশ্লেষক ব্যাকটিরিয়া

এরা সম্পূর্ণ অজৈব বস্তুকে নির্ভর করে বেঁচে থাকে। অজৈব বস্তুকে জারিত করে এরা যে শক্তি লাভ করে তার সাহায্যে এরা বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডকে কাজে লাগিয়ে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করতে পারে। এই পদ্ধতিকে সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় কিমোসিনথেসিস (chemosynthesis) বা রাসায়নিক সংশ্লেষণ হিসাবে। দুটি পরিবারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

১। নাইট্রোব্যাকটিরিয়েসি (Nitrobacteriaceae) ও

২। থায়োব্যাকটিরিয়েসি (Thiobacteriaceae)।

এই উভয় পরিবারের ব্যাকটিরিয়াই প্রধানতঃ দণ্ডাকৃতি এবং গ্রাম নেগেটিভ। নাইট্রোব্যাকটিরিয়েসি পরিবারের সবচেয়ে পরিচিত জেনেরা হলো, নাইট্রোসোমোনাস (Nitrosomonas) এবং নাইট্রোব্যাকটার ( Nitrobacter )। নাইট্রোসোমোনাস অ্যামোনিয়াকে ($NH_4^+$)কে নাইট্রাইটে ($NO_2^-$) রূপান্তরিত করে শক্তি আহরণ করে। অন্যদিকে নাইট্রোব্যাকটারা নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে ( $NO_3^-$ ) রূপান্তরিত করে প্রয়োজনীয় শক্তি লাভ করে থাকে। এসব ব্যাকটিরিয়া মাটিতে থাকে। এরা ভূমির উর্বরতা রক্ষায় সহায়ক। থায়োব্যাকটিরিয়েসি পরিবারের সবচেয়ে পরিচিত জেনাস হলো থায়োব্যাসিলাস ( thiobacilus )। এরা কাদা, খালের পানি ও মাটিতে থাকে। সমুদ্রের পানিতেও পাওয়া যায়। এরা গন্ধক ও অজৈব গন্ধক যৌগ জারিত করে শক্তি আহরণ করে। এদের সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় বর্ণহীন গন্ধক ব্যাকটিরিয়া হিসাবে।

এসব ব্যাকটিরিয়া এদের প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট নিজেরাই উৎপাদন করতে পারে। এই কার্বোহাইড্রেট এরা প্রস্তুত করে বাতাসের কার্বোন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে পানির হাইড্রোজেনের মিলন ঘটিয়ে। এর জন্য যে শক্তির দরকার হয় তা আসে রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে। তাই এসব ব্যাকটিরিয়াকে একত্রে উল্লেখ করা হয় কিমোসিনথেটিক ব্যাকটিরিয়া ( chemosynthetic bacteria) বা রাসায়নিক সংশ্লেষক ব্যাকটিরিয়া হিসাবে।

যেহেতু কিমোসিনথেটিক ব্যাকটিরিয়া সম্পূর্ণ অজৈব বস্তুদের নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারে, তাই জীবাণুবিদ অরলা জেনসেন (Orla-Jensen) এদের মনে করেন (১৯০৯) সবচেয়ে আদিম জীবন যাত্রার পরিচয়বাহী বলে। কিন্তু এখন এই ধারণাকে আর সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় না। কারণ, যেহেতু এসব ব্যাকটিরিয়া তাদের দেহে অজৈব বস্তু থেকে সর্বপ্রকার জৈব বস্তু উৎপাদনে সক্ষম তাই ধরে নিতে হয় যে এদের এনজাইম পদ্ধতি ( engyme system ) সবচাইতে জটিল। এরকম জটিল এনজাইম পদ্ধতি সৃষ্টি হতে সময় লেগেছে। এরা অতি আদিম জীবনধারার পরিচয় বহন করে না।

হলডেন-ওপারিন (Haldane-Operin) মতবাদ অনুসারে, পৃথিবীর আদিম সমুদ্রের পানিতে প্রথমে কেবলই উৎপন্ন হয়েছিল বিভিন্ন প্রকার জৈব বস্তু। এসব জৈব বস্তু থেকে যে জীবকোষের উদ্ভব হয় তারা খাদ্য হিসাবে সমুদ্রের

banglainternet.com



পানি থেকে গ্রহণ করত বিভিন্ন জৈব বস্তু। কারণ, এদের এনজাইম পদ্ধতি ছিল খুব সরল।* অনেক পরে উদ্ভব হয়েছে কেবল অজৈব বস্তুকে নির্ভর করে বেঁচে থাকবার প্রক্রিয়া।

আমরা তাই প্রথমে আলোচনা করেছি জৈব বস্তু নির্ভরশীল ব্যাকটিরিয়ার কথা এবং তার পরে সালোক সংশ্লেষ ও রাসায়নিক সংশ্লেষক ব্যাকটিরিয়া সম্পর্কে।

## প্রজাতি নিরূপণ

ব্যাকটিরিয়াকে প্রথমে অন্যান্য জীবের মত প্রজাতি বদ্ধ করা হয়। ব্যাকটিরিয়া এত ছোট এবং তাদের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে এত কম যে, কেবল আকৃতিগত পার্থক্যের (morphological difference) সাহায্যে ব্যাকটিরা প্রজাতি বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক যৌন-প্রজনন হয় না। তাই এখানে যৌন-প্রজনন-এর সাহায্যে প্রজাতি নিরূপণও সম্ভব নয়। এখানে প্রজাতির অর্থ দাঁড়ায় যথেষ্ট স্বতন্ত্র ব্যাকটিরিয়া সমষ্টি। ঠিক কতটা পার্থক্য থাকলে একদল ব্যাকটিরিয়াকে একটা পৃথক প্রজাতিভুক্ত বলা হবে, সে বিষয় বিভিন্ন শ্রেণীবন্ধনবিদ বিভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। তবে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, একদল ব্যাকটিরিয়াকে একটি প্রজাতিভুক্ত করতে হলে তার নিকটতম ব্যাকটিরিয়া প্রজাতির সঙ্গে তার কম পক্ষে একটি এনজাইম (enzyme) উৎপাদক ক্ষমতার পার্থক্য থাকতে হব।

ব্যাকটিরিয়ারা খুব ছোট। তাই কোন একটি মাত্র ব্যাকটিরিয়া কোষ নিয়ে বিচার করে প্রজাতি নিরূপণ সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সবসময় বিচার্য হয় একদল ব্যাকটিরিয়া-কোষ—যাদের আকার আকৃতি, দেহক্রিয়া, বিশেষ করে এনজাইম উৎপাদনের ক্ষমতা অবিকল একই রকম। সাধারণতঃ ব্যাকটিরিয়া প্রজাতি এভাবে বর্ণনা করা হয় :

---

* Operin, A. J. (1975) : The Origin of Life, on Earth. Academic Press Inc. New yerk.
Haldane, J. B. S., The Origin of Life. Reprinted in "Man and Nature". PP. 84-98. The Indian Renaisance Association Ltd. Dehradun. 1940.

(১) **দৈহিক আকৃতিগত চরিত্র** (Morphological characteristics) :

(ক) ব্যাকটিরিয়া কোষগুলি দেখতে কিরকম ও কিভাবে তারা সাজানো আছে;

(খ) তাদের পরিমাপ (size) কত;

(গ) গ্রাম-পজেটিভ, না গ্রাম-নেগেটিভ;

(ঘ) ফ্ল্যাজেলা আছে কিনা; থাকলে তারা কিভাবে সাজানো;

(ঙ) স্পোর হয় কিনা, হলে ব্যাকটিরিয়া-কোষের কোন অংশে অবস্থিত।

(২) **আবাদ গত চরিত্র** (Cultural characteristics) : (ক) শ্বাসক্রিয়ার জন্য মুক্ত অক্সিজেন ($O_2$) প্রয়োজন করে কিনা, করলে কি পরিমাণ করে;

(খ) কোন তাপমাত্রায় (temparature) সবচেয়ে ভালভাবে বৃদ্ধি পায়;

(গ) কোন pH সবচেয়ে ভাল হয়।

(৩) জীব রাসায়নিক (চরিত্র Bichemical characteristics) :

(ক) কি কি চিনির গাজন (fermentation) নিষ্পন্ন করতে পারে;

(খ) আমানো অ্যাসিড ইনডোল (indol) উৎপাদন করতে পারে কিনা;

(গ) অ্যাসিড উৎপাদন করে কিনা;

(ঘ) গ্যাস উৎপাদন করে কিনা; গ্যাস উৎপাদন করলে কি ধরনের গ্যাস উৎপাদন করে;

(ঙ) নাইট্রেট ($NO_3$) বিজারিত (reduce) করতে পারে কিনা ইত্যাদি।

(৪) রোগ উৎপাদন ক্ষমতা (Pathogenicity) : ব্যাকটিরিয়াটি কোন রোগ উৎপাদন করে কিনা, রোগ উৎপাদন করলে তা, উদ্ভিদের, জীব জন্তুর, না মানুষের করে।

এভাবে বিচার করে ঠিক করা হয় ব্যাকটিরিয়ামটি কোন প্রজাতিভুক্ত। যদি ব্যাকটিরিয়ামটি এর আগে কেউ বর্ণনা করে থাকেন, তবে তার একটা বর্ণনা বার্জি'র ম্যানুয়ালে পাওয়া সম্ভব। এই ম্যানুয়ালে বর্ণিত কোন প্রজাতির সঙ্গে কোন ব্যাকটিরিয়ামের বর্ণনা যদি না মেলে, তবে মনে করা যেতে পারে, ব্যাকটিরিয়ামটি আগে সম্ভবতঃ কেউ বর্ণনা করেনি অথবা করলেও তা বিশেষ পরিচিত নয়।

banglainternet.com

দ্বাদশ অধ্যায়

# এনজাইম বা জৈব প্রভাবক

ক্যাটালিস্ট (catalyst) বা প্রভাবক বলতে বোঝায় এমন দ্রব্য যা কোন রাসায়নিক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে (accelerate) কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে রাসায়নিক দিক থেকে পরিবর্তিত হয় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা চলে পটাসিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$) থেকে অক্সিজেন প্রস্তুত করবার সময় ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ($MnO_2$)-এর ব্যবহারের কথা। এমনিতে যদি পটাসিয়াম ক্লোরেট থেকে অক্সিজেন পেতে হয় তবে তাকে উত্তপ্ত করতে হয় প্রায় ৮০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। কিন্তু ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশিয়ে যদি উত্তপ্ত করা হয় তবে মাত্র ২০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অক্সিজেন পাওয়া যায় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া (reaction) শেষ হবার পর দেখা যায় ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড-এর কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেনি। ঠিক যে পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড যোগ করে উত্তপ্ত করা হয়েছিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার শেষে তার পরিমাণ একই আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যদি কেবলমাত্র ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড থেকে অক্সিজেন পেতে হয় তবে তাকে উত্তপ্ত করতে হয় ৫০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। এ থেকে অনুমান করা চলে যে, অক্সিজেন ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড থেকে আসে না, আসে পটাসিয়াম ক্লোরেট থেকে এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এ-ক্ষেত্রে এই অক্সিজেন ছাড়া পাবার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত (accelerate) করে মাত্র। কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যখন কোন বস্তুর এভাবে প্রভাব বিস্তার করে তখন তাকে বলা হয় প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট (catalyst)। ক্যাটালিস্টরা প্রধানতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ফলে যে তাপমাত্রায় ক্যাটালিস্ট ছাড়া কোন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে ক্যাটালিস্ট বা প্রভাবক থাকার ফলে তার চাইতে অনেক কম তাপমাত্রায় সেই একই রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটতে পারে।

এনজাইম বলতে বোঝায় এমন জৈব বস্তু, যা জীবদেহে প্রভাবকের কাজ করে।[১] এদের জন্য জীবদেহে সর্বপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

১। গ্রীক ভাষায় জাইম মানে হল খামির বা ইস্ট (yeast)। এনজাইম মানে হল

এদের মধ্যস্থতার জন্যই কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য অনেক কম তাপ-শক্তির প্রয়োজন হয়। অন্যথায় আমাদের, অন্যান্য জীবের এবং জীবাণুদের দেহে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য যে পরিমাণ তাপ-শক্তির প্রয়োজন হতে পারত তাতে উত্তাপে সারা দেহ পুড়ে যেত।

এখন জানা গিয়েছে যে, এনজাইমরা প্রধানতঃ প্রোটিন পদার্থ। তবে এই প্রোটিন পদার্থের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য আরো অনেক বস্তু সংযুক্ত থাকে। যেসব অ-প্রোটিন পদার্থ এনজাইম প্রোটিন অণুর সাথে খুব শক্ত-ভাবে সংযুক্ত থাকে, তাকে বলা হয় প্রসথেটিক গ্রুপ (prosthetic group) এবং যেসব পদার্থ খুব শক্তভাবে লেগে থাকে না, অনেক সহজে আলগা হতে পারে, তাদের বলা হয় সহকারী এনজাইম বা কো-এনজাইম (co-enzyme)। একটি কো-এনজাইম কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার একাধিক এন-জাইম এর সাথে যুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। যেমন, কো-এনজাইম 'এ' (co-enzyme A)।

অনেকগুলি অবস্থার উপর একটি এনজাইম-এর কর্মক্ষমতা নির্ভর করে। এসব অবস্থার মধ্যে তাপমাত্রা, হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ, যে বস্তুর উপর এনজাইম ক্রিয়া করে, যাকে সাধারণভাবে বলা হয় সাবস্ট্রেট (substrate), তার পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এনজাইম অণুরা সাধারণতঃ খুবই সীমাবদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন এনজাইম কেবলমাত্র একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে তাই এক একটি জীবাণু দেহে থাকে বহু প্রকার এনজাইম। কতক-গুলি এনজাইম সব জীবাণু দেহেই সাধারণভাবে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন জীবাণু তাদের দেহে বিশেষ বিশেষ এনজাইম উৎপাদন করতে পারে। সব ব্যাকটিরিয়া সব জৈব বস্তুকে ভাঙতে পারে না বা কাজে লাগাতে পারে না। এ থেকে নিরূপণ করা যায় তার এনজাইমগত বৈশিষ্ট্য।

ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে, এই এনজাইম-এর পার্থক্য থেকে তাদের পৃথক করে চিনতে পারবার ও বর্ণনা করবার চেষ্টা করা হয়। ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে প্রজাতি বলতে বোঝায় বিশেষতঃ এনজাইম-এর পার্থক্যকে। অনেক ক্ষেত্রে যদি একদল ব্যাকটিরিয়া আর এক দল থেকে মাত্র একটি এনজাইম বেশী উৎপন্ন করতে পারে, তবে যারা বেশী পারে, তাদের একটি স্বতন্ত্র প্রজাতির ব্যাকটিরিয়া বলে

থামিন-এর মতো। থামিন নিজে গবেষণা করতে যেয়ে প্রথম এনজাইমদের সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়।

banglainternet.com



উল্লেখ করা হয়। স্পিসিজ হতে হলে কমপক্ষে একটি এনজাইম-এর পার্থক্য থাকা চাই। এটাই সাধারণ মত।

জীবাণুদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে এনজাইম সম্পর্কে জ্ঞান অর্থনৈতিক কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নানা উপায়ে ব্যাকটিরিয়ার এনজাইম-এর ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে ব্যাকটিরিয়ার জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। জীবাণুরা যেসব এনজাইম সৃষ্টি করে তার প্রভাবে যেসব রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাদের অনেককেই উল্লেখ করা হয় গাঁজন বা ফারমেনটেশন (fermentation) বলে। জীবাণুদের কাজে লাগিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে ফারমেনটেশন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।[১]

জীবাণুরা নানা অবস্থায় বিশেষ বিশেষ এনজাইম উৎপন্ন করতে পারে। যে-সব এনজাইম কোন জীবাণু সব সময় উৎপন্ন করে তাদের বলা হয় উপাদানগত এনজাইম (constitutive enzyme)। আর যেসব এনজাইম বিশেষ অবস্থার আও-তায় উৎপন্ন হতে পারে তাদের বলা হয় অভিযোজক (adaptive) এনজাইম। এসব এনজাইম স্বাভাবিক অবস্থায় জীবাণুরা উৎপন্ন করতে পারে না। কিন্তু বিশেষ দ্রব্যের উপস্থিতিতে করতে পারে। এসব এনজাইম জীবাণুদের আত্ম-রক্ষায় সাহায্য করে। যেমন অনেক ব্যাকটিরিয়া পেনিসিলিন-এর উপস্থিতিতে পেনিসিলিনাজ (penicillinase) নামক এনজাইম উৎপাদন করতে পারে। এই এনজাইম পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic)-এর উপর ক্রিয়া করে, ফলে এই অ্যান্টিবায়োটিক অণুরা ভেঙ্গে পড়ে। এসব জীবাণুর ক্ষেত্রে তাই পেনিসিলিন কার্যকরী হতে পারে না। এই রকম অভিযোজক এনজাইম উদ্ভাবনের ক্ষমতা থাকার জন্য জীবাণুরা অনেকে প্রতিকূল অবস্থায় রক্ষা পেতে পারে। কিভাবে একদল জীবাণু হঠাৎ কোন অভিযোজক এনজাইম উৎপন্ন করতে পারে, অন্যরা পারে না সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনো স্পষ্ট নয়।

অনেকে এনজাইম উৎপন্ন হবার পর দেহের অভ্যন্তরেই থাকে। এরা জীবাণুদেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু অনেক এনজাইম উৎপন্ন হবার পর জীবাণুদেহ (কোষ) থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। যেসব এনজাইম জীবাণু দেহের অভ্যন্তরে থাকে তাদের বলা হয় এনডো-এনজাইম (endoenzyme) বা অন্ত-এনজাইম। যারা দেহের মধ্যে উৎপন্ন

১। গাঁজন প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, গাঁজন ক্রিয়ার ফলে অসম্পূর্ণভাবে জারিত (incompletely oxidised) বস্তু উদ্ভূত হয়ে সঞ্চিত হয়।

হবার পর বাইরে বেরিয়ে আসে তাদের বলা হয় এক্সো-এনজাইম (exoenzyme) বা বহিঃএনজাইম। যেসব এনজাইম জীবাণুদেহের বাইরে বেরিয়ে আসে, তারা জীবাণুদেহের বাইরে অবস্থিত জৈব বস্তুদের ভেঙ্গে ফেলতে পারে। এই ভাবে দেহের বাইরে জৈব বস্তু (যা জীবাণুরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে) ভেঙ্গে ছোট ছোট অণুর সৃষ্টি হবার ফলে তা জীবাণুদের শরীরের মধ্যে সহজে প্রবেশ করতে পারে ও জীবাণু তাদের দেহের অভ্যন্তরীণ এনজাইমের সাহায্যে আরো ভেঙ্গে প্রয়োজনীয় শক্তি (energy) লাভ করতে পারে। অথবা এসব জৈব বস্তুকে নানাভাবে রূপান্তরিত করে আপন দেহ বস্তুতে পরিণত করতে পারে। যেসব এনজাইম জীবাণুদেহের বাইরে বেরিয়ে আসে, দেহের বাইরে জৈব বস্তুর উপর ক্রিয়া করে (act) তারা তাদের ক্রিয়ার জন্য পানির প্রয়োজন করে। পানির অণুরা এক্ষেত্রে এসব এনজাইমের মধ্যস্থতায় জটিল জৈব অণুদের সাথে যুক্ত হয় ও জটিল অণুরা অপেক্ষাকৃত ছোট অণুতে পরিণত হয়। পানি যুক্ত হয়ে জটিল জৈব অণু ভেঙ্গে পড়াকে বলে আর্দ্র-বিশ্লেষণ বা হাইড্রোলাইসিস (hydrolysis)। আমাদের দেহে হজম ক্রিয়া সংঘটিত হবার সময় পাকস্থলীর মধ্যে পাকস্থলীর আবরণ থেকে অনেক প্রকার এনজাইম, যথা পেপসিন, ট্রাইপসিন ইত্যাদি নির্গত হয়। তারা জটিল জৈব অণুকে ভেঙ্গে ফেলে। এভাবে জটিল জৈব অণু ভেঙ্গে ফেলাকে বলা হয় হজম ক্রিয়া (digestion)। কোষ-প্রাচীরযুক্ত জীবাণুদের ক্ষেত্রে খাদ্য হজম ক্রিয়া ঘটে জীবাণু দেহের বাইরে।

ব্যাকটিরিয়া-কোষে বাইরে থেকে খাদ্য বস্তুর প্রবেশের কাজেও এনজাইম-এর সহযোগিতা প্রয়োজন। এসব এনজাইমের সাহায্য ব্যতিরেকে খাদ্য বস্তু ব্যাকটিরিয়া-দেহে প্রবেশ করতে পারে না। এসব এনজাইম, যা খাদ্য বস্তু দেহের অভ্যন্তরে আসতে সাহায্য করে, তাদের একত্রে বলা হয় প্রবেশক বা পারমিএজ (permeases)। আমরা ব্যাকটিরিয়া-এনজাইমকে এভাবে ভাগ করে দেখতে পারি :

১। **হাইড্রোলেজ** (Hydrolases) : জটিল জৈব-অণুকে পানির অণুর সাথে সংযোগ ঘটিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। দৃষ্টান্ত, অ্যামাইলেজ (amylase); ট্রাইপসিন (trypsine) লাইপেসেজ (lipases)।

২। **ট্রান্সফারেজ** : কোন জৈব-অণুর এক অংশ অন্য জৈব-অণুর সাথে (transferases) যুক্ত হতে সাহায্য করে। প্রথম অণুকে বলা হয় দাতা (donator) আর দ্বিতীয় অণুকে বলে গ্রহীতা (acceptor)।

banglainternet.com



৩। **অক্সিডেজ** (Oxydases) : যারা অক্সিজেনযুক্ত হতে সাহায্য করে। যথা, সাইটোক্রোম অক্সিডেজ (cytochrome oxydases)।

৪। **ডিহাইড্রোজেনেজ** : অণু থেকে হাইড্রোজেন সরাতে সাহায্য করে। যথা, ডিহাইড্রোজেনেস (dehydrogenases)।

৫। **রিডাকটেজ** (Reductases) : অক্সিজেন সরাতে অথবা হাইড্রোজেন যোগ করতে সাহায্য করে।

৬। **ক্যাটালেজ** (Catalase): হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ($H_2O_2$)-কে পানি ও অক্সিজেনে পরিণত করে। যেসব ব্যাকটিরিয়ার দেহে এই এনজাইম থাকে না তারা সাধারণতঃ অবায়ু-জীবী।

৭। **পারমিএজ** : বাইরে থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু কোষের পাতলা (permeases) আবরণের মধ্যে যেতে সাহায্য করে।

এনজাইমরা ব্যাকটিরিয়া-কোষে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে না। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর এনজাইম থাকে কোষের বিশেষ বিশেষ অংশে। যেমন অক্সিডেজরা থাকে প্রোটপ্লাস্ট-এর পর্দার গায়ে ভিতরের দিকে। এখানে অক্সিডেসন বা জারণের ফলে যে শক্তি ছাড়া পায়, পারমিএজ এনজাইম অণুরা তা গ্রহণ করে প্রোটপ্লাস্ট পর্দার (protoplast membrane) বাইরে যেতে ও ভিতরে আসতে পারে।

কোষের মধ্যে এনজাইমের অবস্থান অনুসারে, তাদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

(১) **এনডো-এনজাইম** (Endo-enzymes) : এরা কোষের মধ্যে থেকে কাজ করে। যেমন জারণ-বিজারণ (oxydation-reduction) প্রক্রিয়ায় অংশ-গ্রহণকারী এনজাইমসমূহ।

(২) **একসো-এনজাইম** (Exo-enzyme) : এরা সাধারণতঃ কোষের বাইরে এসে কাজ করে। এদের দৃষ্টান্ত হল বিভিন্ন আর্দ্র বিশ্লেষক (hydrolyzin) এনজাইম। এরা হজম ক্রিয়ায় (digestion) অংশ গ্রহণ করে। যেমন ইনভার্টেজ (invertase)। অবশ্য এসব এনজাইম কোষের মধ্যে থেকেও কাজ করতে পারে। সব সময়ই যে কোষের বাইরে বেরিয়ে এসে কার্যকর হয়, তা নয়।

(৩) **একটো-এনজাইম** (Ecto-enzyme) : এরা কোষে ঠিক প্লাজমা ঝিল্লির উপরিভাগে অবস্থান করে। এরা বাইরে থেকে খাদ্য বস্তু কোষের ভিতরে বয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। পারমিয়াজরা একটো-এনজাইম।

## কো-এনজাইম ও কো-ফ্যাক্টর

কো-এনজাইম ও কো-ফ্যাক্টর উভয়েই খুব সামান্য পরিমাণে থেকে বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তা করে। এদের উপস্থিতি ছাড়া এনজাইম সক্রিয়তা লাভ করে না। কো-এনজাইম আর কো-ফ্যাক্টরে পার্থক্য হল কো-এনজাইম জৈব বস্তু আর কো-ফ্যাক্টর হল ধাতব আয়ন।

রাসায়নিক বিক্রিয়া বর্ণনা করবার সময় সাধারণতঃ কো-এনজাইমদের রাসায়নিক সংকেত ব্যবহার করা হয় না। কারণ, এরা খুব জটিল। সাধারণতঃ কো-এনজাইমদের নাম সংক্ষেপে লিখে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বর্ণনা প্রদান করা হয়। কয়েকটি কো-এনজাইমের সংক্ষিপ্ত নাম নীচে দেওয়া হল :

NAD = নিকোটিনামাইড অ্যাডিনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড (Nicotinamide adenine dinucleotide) জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে বিজারিত অবস্থাকে দু'ভাবে লেখা হয়,

$NAD + 2H \rightleftharpoons NADH_2$ অথবা $NAD^+ + 2H \rightleftharpoons NADH + H^+$

NADP = নিকোটিনামাইড অ্যাডিনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট (Nicotinamide adenine dinulcotide phosphate)। জারণ বিজারণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। বিজারিত অবস্থা বোঝাতে লেখা হয় $NADPH_2$, অথবা $NAPH + H^+$

ATP = অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (Adenosine triphosphate) শক্তির রূপান্তরে অংশ গ্রহণ করে। ATP থেকে যখন ফসফেট জোট কোন জৈব বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তা রাসায়নিক দিক থেকে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সহজেই অন্য বস্তুর সঙ্গে তার বিক্রিয়া হতে পারে।

Co-A অথবা Co-A—SH = কো-এনজাইম A (Co-enzyme A)। এখানে A বলতে বোঝায় অ্যাসিটেট। ATP-র মত কো-এনজাইম A একটি শক্তি সমৃদ্ধ যোগ। কিন্তু ATP-র মত নিউক্লিউটাইড নয়। গন্ধক ঘটিত যোগ।

কো-এনজাইম A যখন কোন জৈব অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন শ্বাস ক্রিয়ার সময় কো এনজাই A তোলে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে খুব সক্রিয় করে এ অবস্থায় তাকে বলে অ্যাসেটাইল কো এনজাইম A ($CH_3$ । $CO \simeq SHCo$-A)।



এইজাইম ও কো-এনজাইমের সহযোগিতায় ব্যাকটিরিয়ার দেহে ও দেহের বাইরে সর্বপ্রকার বিক্রিয়া চলে। ব্যাকটিরিয়ার মূলতঃ তার এনজাইমের সাহায্যেই বাইরের জটিল জৈব বস্তুকে ভেঙে তার কোষের ভিতর প্রবেশযোগ্য করে তোলে। ব্যাকটিরিয়া যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম এবং তার কোষের অভ্যন্তরে যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় আমরা তার কতকগুলির তালিকা প্রদান করছি :

১। **জারণ বা অক্সিডেশন** (Oxidation) : জীব-রসায়নে জারণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় কোন জৈব বস্তু থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ। হাইড্রোজেন অপসারণের সময় ইলেকট্রন অপসারণও ঘটে। কারণ, একটি হাইড্রোজেন পরমাণু সরা মানে তার সঙ্গে একটি ইলেকট্রনও চলে যাওয়া। অক্সিডেশনের সময় সাধারণতঃ কোন জৈব বস্তু একটি কারবন পরমাণু থেকে দুটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু চলে যায়। সাধারণ শ্বাস ক্রিয়ার সময় হাইড্রোজেন শেষ পর্যন্ত যুক্ত হয় অক্সিজেনের সঙ্গে। সৃষ্টি হয় পানির অণু।

২। **বিজারণ বা রিডাকশন** (Reduction) : জীব-রসায়নে বিজারণ বলতে বোঝায় কোন বস্তুর অণুর মূল অংশে, অর্থাৎ কারবন পরমাণুদের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়া। হাইড্রোজেন যুক্ত হবার অর্থ দাঁড়ায় ইলেকট্রন যুক্ত হওয়া। হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন কারবন পরমাণুর দিকে সরে যায়।

জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া যুগপৎ চলে। এই প্রক্রিয়ার ফলে বিপুল শক্তি ছাড়া পায়। সাধারণ শ্বাস ক্রিয়ার সময় হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়। অক্সিজেন হয় বিজারিত এবং হাইড্রোজেন হয় জারিত। হাইড্রোজেন থেকে এক্ষেত্রে ইলেকট্রন ঠিক অক্সিজেনে চলে যায় না। অক্সিজেন-এর দিকে সরে যায়। অক্সিজেন হয়ে ওঠে ইলেকট্রো নেগেটিভ আর হাইড্রোজেন হয়ে ওঠে ইলেকট্রো পজেটিভ।

৩। **আর্দ্র-বিশ্লেষণ বা হাইড্রোলাইসিস** (Hydrolysis) : এক্ষেত্রে পানির অণুসংযোগে জৈব অণু ভেঙে পড়ে। এই প্রক্রিয়ায় পানির অণুও ভেঙে যায়।

$$BA + H_2O \rightarrow BOH + HA$$

৪। **পানি অপসারণ বা ডিহাইড্রেশন** (Dehydration) : এ ক্ষেত্রে কোন অণুর থেকে পানির অণুর বহিষ্কার ঘটে। যেমন,

$$HOCH_2 . CHOH . CH_2OH \longrightarrow CH_2 = CH . CHO + 2H_2O$$

গ্লাইসেরল ... অ্যাক্রোলিন

banglainternet.com

**৫। অ্যামিনোজোট সরান বা ডি-অ্যামিনেশন (Deamination) :** এ-ক্ষেত্রে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অ্যামাইনো জোট ($NH_2$) বহিষ্কৃত হয়ে বিক্রিয়াটি দুই পর্বে ঘটতে পারে। প্রথম পর্বে অ্যামাইনো অ্যাসিড জারিত হয়ে ইমিনো অ্যাসিডে (imino acid) রূপান্তরিত হয়। পরে ইমিনো অ্যাসিডের আর্দ্র-বিশ্লেষণ ঘটে এবং তা থেকে কিটো অ্যাসিড ও অ্যামনিয়ার উদ্ভব হয়।

$$H_2N-\underset{\underset{R}{|}}{CH}-COOH \xrightarrow{\text{এনজাইম}} HN=\underset{\underset{R}{|}}{C}-COOH+2[H]$$

অ্যামাইনো অ্যাসিড ইমিনো অ্যাসিড

$$HN=\underset{\underset{R}{|}}{C}-COOH+H_2O \longrightarrow =\underset{\underset{R}{|}}{C}-COOH+NH_2$$

**৬। অ্যামিনেশন (Amination) :** অ্যামাইনো জোট ($NH_2$) যুক্তকরণ। যেমন,

$$HOOC.CH=CH.COOH \xrightarrow[+NH_4Cl]{} HOOC.CH_2.\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH}.COOH$$

ম্যালিক অ্যাসিড অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড

**৭। ডিকার্বোক্সিলেশন ( Decarboxylation ) :** কার্বোক্সিল জোট (–COOH) থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সরান। যেমন,

$$H-\overset{\overset{R}{|}}{\underset{\underset{COOH}{|}}{C}}-NH_2 \longrightarrow H-\overset{\overset{R}{|}}{\underset{\underset{H}{|}}{C}}-NH_2+CO_2$$

**৮। ফসফোরিলেশন ( Phosporhilation ) :** কোন জৈব অণুর সঙ্গে ফসফেট জোট যুক্তকরণ। যেমন,

$$C_{12}H_{22}O_{11} \xrightarrow{ATP} \text{ফ্রুকটোজ-1, 6-ডাইফসফেট}$$

এক্ষেত্রে ফসফেট জোট জৈব বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়ে এসটার (ester) গঠন করে। এই ধরনের এসটার খুব সক্রিয় যৌগ হিসাবে আচরণ করে। ফসফোরিলেশন মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়া এবং অন্য জীবদেহে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির আদান-প্রদান হয়।

banglainternet.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

# জৈব শক্তির উৎপাদন ও স্থানান্তর

সর্বপ্রকার জীবদেহে দুই প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া চলে। এক প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বলে এক্সারগনিক (exergonic) আর অন্য প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বলা হয় এন্ডারগনিক (endergonic)। এক্সারগনিক বিক্রিয়ায় শক্তি (energy) ছাড়া পায়। আর এনডারগনিক বিক্রিয়ায় শক্তি শোষিত হয়। জীবদেহে এক্সারগনিক বিক্রিয়ায় যে শক্তি ছাড়া পায়, এন্ডারগনিক বিক্রিয়া তার সহায়তাতেই সম্ভব হয়।

তাপগতিবিদ্যার ( Thermodynamics ) দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে কোন এক্সারগনিক বিক্রিয়ার তখনই একটি এন্ডারগনিক বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করতে পারে, যখন এক্সারগনিক বিক্রিয়া থেকে যে শক্তি ছাড়া পায়, তার পরিমাণ হয় এন্ডারগনিক বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির চাইতে বেশি। তা না হলে তাপ প্রবাহ সম্ভব হয় না। রাসায়নিক বিক্রিয়াও সম্ভব হয় না।

### শক্তি যুগলতা

শক্তি যুগলতা (energy coupling) বলতে বোঝায় একটি এক্সারগনিক বিক্রিয়া কর্তৃক একটি এন্ডারগনিক বিক্রিয়াকে শক্তি সরবরাহ। শক্তি কখনও একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে আর একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরাসরি স্থানান্তরিত হতে পারে না। স্থানান্তরিত হয় পরমাণু অথবা পরমাণু জোটের মাধ্যমে। একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বোঝান যেতে পারে :

১। $AB+H_2O \rightarrow AH+BOH$ (– ৮০০০ ক্যালোরি)

২। $CH+BOH \rightarrow BC+H_2O$ ( + ৩০০০ ক্যালোরি)

---

মোট যোগফল : $AB+CH \rightarrow AH+BC$ (– ৫০০০ ক্যালোরি)

---

এখানে প্রথম বিক্রিয়াটি এক্সারগনিক। এই বিক্রিয়ার ফলে শক্তি ছাড়া পাচ্ছে ৮০০০ ক্যালরি ( শক্তি চলে যাওয়া বোঝাতে "—" চিহ্ন দেওয়া হয়)। কিন্তু দ্বিতীয় বিক্রিয়াটি হচ্ছে এন্ডারগনিক। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ৩০০০

ক্যালরি শক্তি (+ চিহ্ন দিয়ে শক্তি গ্রহণ বোঝান হয়)।* প্রথম বিক্রিয়াটি দ্বিতীয় বিক্রিয়াটিকে শক্তি যোগাতে পারছে। কারণ, দ্বিতীয় বিক্রিয়াটি ঘটবার জন্য যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন প্রথম বিক্রিয়ায় তার চাইতে ছাড়া পাচ্ছে বেশি। এখানে শক্তি সরাসরি প্রথম বিক্রিয়া থেকে দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় যাচ্ছে না। শক্তি যেতে পারছে, কারণ, 'B' জোট 'AB' যোগ থেকে এসে 'C' সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। শক্তি স্থানান্তরিত হচ্ছে জোট স্থানান্তরিত হচ্ছে বলে। দুটি বিক্রিয়ার মধ্যে একটি সাধারণ জোট শক্তিকে এক বিক্রিয়া থেকে অন্য বিক্রিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে।

### শক্তি সমৃদ্ধ যৌগ

জীবদেহে একটি-বিক্রিয়া থেকে শক্তি আর একটি বিক্রিয়ায় স্থানান্তরিত হয় শক্তি সমৃদ্ধ যৌগের মাধ্যমে। শক্তি সমৃদ্ধ যৌগের সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত হল ATP। আমরা এর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ATP-র আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটালে উৎপন্ন হয় ADP (অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট) এবং অজৈব ফসফেট (Pi)। আর্দ্র বিশ্লেষণের সময় ১ গ্রাম মোল ATP থেকে (অর্থাৎ ৫০৭ গ্রাম ATP) ছাড়া পায় প্রায় ৮০০০ ক্যালোরি পরিমাণ শক্তি। যেসব জৈব যৌগের আর্দ্র বিশ্লেষণের সময় এত অধিক পরিমাণে শক্তি ছাড়া পায়, তাদের উল্লেখ করা হয় শক্তি-সমৃদ্ধ যৌগ হিসেবে। ATP-র-রাসায়নিক সংকেতকে সংক্ষেপে এভাবে লেখা যায় ঃ

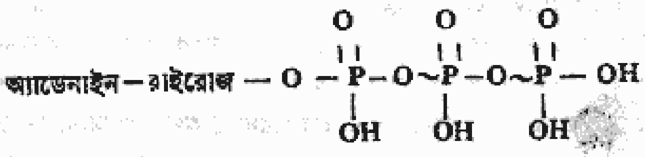


এখানে '~' চিহ্নের সাহায্যে বোঝান হয় শক্তি সমৃদ্ধ রাসায়নিক বন্ধন। এক একটি বন্ধন ভাঙলে ছাড়া পায় ৮০০০ ক্যালরি পরিমাণ শক্তি।*

* ১ ক্যালরি বলতে বোঝায় ১ গ্রাম পানিকে ১৫° থেকে ১৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নিতে হলে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। ১ ক্যালোরি সমান ৪·১৮৫ জুল। এখন সাধারণতঃ শক্তিকে জুল হিসাবে প্রকাশ করা হয়। তবে জীবাণুতত্ত্বে ক্যালরির ব্যবহার এখনও চলে।

* আসলে এই শক্তি থাকে সমস্ত অণুতে ছড়িয়ে। বোঝার সুবিধার জন্য এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার হয়। ঠিক কোন রাসায়নিক বন্ধন ভাঙবার জন্য এই শক্তি ছাড়া পায় না।

banglainternet.com



ATP বিভিন্ন এনডারগনিক বিক্রিয়ায় শক্তি যোগায়। ATP থেকে ফসফেট জোট গিয়ে যখন কোন যৌগে যুক্ত হয় তখন তা রাসায়নিক দিক থেকে খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন, ATP থেকে ফসফেট যখন গ্লুকোজের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন গ্লুকোজ (-৬) ফসফেট সৃষ্টি হয়। গ্লুকোজ ছয় ফসফেট রাসায়নিক দিক থেকে হয় খুব সক্রিয়। বিক্রিয়াটিকে এভাবে দেখান যায় ঃ

ATP+$H_2O$→ADP+Pi (৮০০০ ক্যালোরি)

গ্লুকোজ+Pi→গ্লুকোজ-৬-ফসফেট+$H_2O$ (+৩০০০ ক্যালোরি)

মোট যোগফল ঃ গ্লুকোজ+ATP→ADP+গ্লুকোজ-৬-ফসফেট (—৫০০০ ক্যালোরি)

এখানে ফসফেট জোট (Pi) মাধ্যম ATP থেকে শক্তি যাচ্ছে গ্লুকোজে। ATP থেকে গ্লুকোজে শক্তি যেতে পারছে, কারণ ATP থেকে শক্তি ছাড়া পাচ্ছে ৮০০০ ক্যালোরি। সে যায়গায় দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় লাগছে ৩০০০ ক্যালোরি। এখানে ৫০০০ ক্যালরি শক্তির অপচয় হচ্ছে। মানে পরিবেশে তাপ হিসাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে। জীবদেহের উপরে বিক্রিয়াটিকে যেভাবে ভাগ করে দেখান হয়েছে, ঠিক সে ভাবে ঘটে না। ATP থেকে ফসফেট জোট এনজাইম-এর মধ্যস্থতায় এসে যুক্ত হয় গ্লুকোজের সঙ্গে। ATP কাজ করে এনজাইমের সঙ্গে কো-এনজাইম হিসাবে। সব সময় ATP শক্তি কোন বিক্রিয়ায় অংশ নিতে হলে উপযুক্ত এনজাইম থাকতে হবে। অধিকাংশ জীবাণু ও প্রাণীদেহে ATP সৃষ্টি হয় শ্বাস ক্রিয়ার সময়, ADP-ও ফসফেট যুক্ত হয়ে। সবুজ উদ্ভিদ আলোকশক্তির সাহায্যেও ATP উৎপন্ন করতে পারে। ATP-তে সঞ্চিত শেষ শক্তির উৎস সূর্যালোক।

### সাধারণ শ্বাসক্রিয়া

সাধারণ শ্বাসক্রিয়ার সময় ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু দেহে জৈব বস্তু, বিশেষ করে কার্বোহাইড্রেট ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয়। গ্লুকোজ ভেঙে উৎপন্ন হয় পাইরুভিক অ্যাসিড ($CH_3$. Co . COOH)। পাইরুভিক অ্যাসিড ভেঙে শেষ পর্যন্ত উৎপন্ন হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি। সংক্ষেপে শ্বাসক্রিয়ার মূল বিক্রিয়াকে এভাবে দেখান চলে ঃ

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3.CO.COOH + 4[H]$$
$$2CH_3.CO.COOH + 6H_2O \rightarrow 2O[H] + 6CO_2$$
$$24[H] + 6O_2 \rightarrow 12H_2O$$

মোট যোগফল ঃ $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6H_2O + 6CO_2$

শ্বাসক্রিয়ার সময় সৃষ্টি হয় ৬৮০০০০ ক্যালরি শক্তি। এই শক্তি একটা অংশ থেকে উৎপন্ন হয় ATP ও অন্য অংশ ছড়িয়ে পড়ে উত্তাপ হিসাবে। শ্বাসক্রিয়ার সময় এক গ্রাম মলিকিউল গ্লুকোজ (১৮০ গ্রাম) থেকে ৩৮ গ্রাম মলিকিউল (অর্থাৎ ১৯২৬৬ গ্রাম) ATP উৎপন্ন হতে পারে।

**গাজন প্রক্রিয়া (Fermentation)**

ফারমেনটেশন বা গাজন প্রক্রিয়া বলতে বিশুদ্ধ জীবাণুতত্ত্বে বোঝায় জৈব বস্তু ভেঙ্গে অসম্পূর্ণভাবে জারিত জৈব বস্তুর উৎপাদন। এক্ষেত্রে বাতাসের অক্সিজেন হাইড্রোজেন গ্রহণ করে না। এক জৈব বস্তু থেকে হাইড্রোজেন অন্য জৈব বস্তুতে যায়। গাজন প্রক্রিয়াতেও শক্তি ছাড়া পায়। কিন্তু তার পরিমাণ অল্প।*

**অবাত শ্বাসক্রিয়া (Anaerobic respiration)**

অবাত শ্বাসক্রিয়ার সময়ও বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন কোন ভূমিকা পালন করে না। এ ক্ষেত্রে জৈব বস্তুর হাইড্রোজেন গ্রহণ করে অক্সিজেন ছাড়া অন্য অজৈব বস্তু। যেমন,

$$2CH_3-CHOH-COOH + SO_4 \rightarrow 2CH_3-COOH + 2CO_2 + H_2S + 2OH^-$$

ল্যাকটিক অ্যাসিড      অ্যাসিটিক অ্যাসিড

**সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র**

বাতাসের অক্সিজেন অধিকাংশ জীবাণুর সাধারণ শ্বাসক্রিয়ায় অংশ নেয়। অক্সিজেন-এর সহায়তায় শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হয় একাধিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। ৬-কার্বন চিনি (hexose) ভেঙ্গে পরিণত হয় ২ অণু পাইরুভিক অ্যাসিডে। যে পদ্ধতিতে অনুসরণ করে ৬-কার্বন চিনি ৩-কার্বন পাইরুভিক

* ফলিত জীবাণুতত্ত্বে গাজন বলতে বোঝায় জীবাণু অথবা জীবাণুর এনজাইম দ্বারা জৈব বস্তু ভাঙ্গা। এক্ষেত্রে বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন ($O_2$) অংশ নিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও অসম্পূর্ণভাবে জারিত জৈব বস্তু উৎপন্ন হয়ে জমতে থাকে। যেমন,

$$CH_3CH_2OH + O_2 \rightarrow CH_3COOH + 2H_2O$$

অ্যালকোহল      অ্যাসিটিক অ্যাসিড

ফারমেনটেশন শব্দটা সাধারণতঃ জীবাণু কর্তৃক কার্বোহাইড্রেট ভাঙ্গা বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। প্রোটিন ভাঙ্গা বোঝাতে ব্যবহার করা হয় পিউট্রিফিকেশন (Putrification)।



অ্যাসিডে পরিণত হয়, তাকে বলে গ্লাইকোলাইসিস (glycolysis)। পাইরুভিক অ্যাসিড পরিণত হয় ২-কার্বন সক্রিয় অ্যাসিটিক অ্যাসিডে—অর্থাৎ অ্যাসিটাইল-কো-এনজাইম A-তে ( $CH_3CO \sim SHCO\text{-}A$ )। এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া পায়। সক্রিয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড-এর কিছু অংশ থেকে চর্বি-পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে। সক্রিয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড চর্বি সংশ্লেষণে (fat synthesis) অংশ নেয়। আর এক অংশ ৪-কার্বন অক্সাল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ( oxal acetic acid )-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিণত হয় ৬-কার্বন সাইট্রিক অ্যাসিড (citric acid)।* সাইট্রিক অ্যাসিড ভেঙ্গে পরিণত হয় ৫-কার্বন আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিডে ($\alpha$-kitoglutaric acid)।

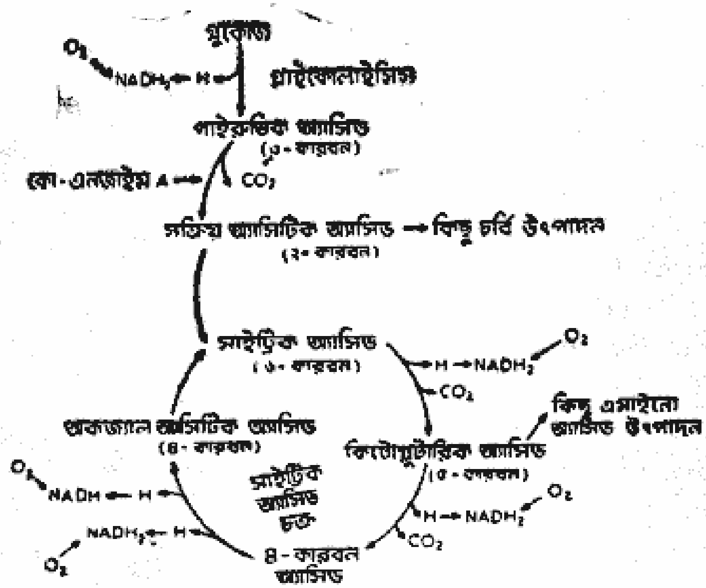


সংক্ষিপ্ত সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র

কিছু আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড অ্যামানো অ্যাসিড উৎপাদনে অংশ নেয়। বাদবাকী ভেঙ্গে পরিণত হয় অক্যাল অ্যাসিটিক অ্যাসিডে। যা

* অক্সাল অ্যাসিটিক অ্যাসিড, $COOH.CH_2.CO.COOH$
সাইট্রিক অ্যাসিড, $COOH.CH_2.COH(COOH).CH_2COOH$
আলফা-কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড, $COOH.CO.CH_2.CH_2.COOH$

banglainternet.com

সক্রিয় অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিণত হয় সাইট্রিক অ্যাসিডে। এভাবে চক্রটি চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন সময় যে হাইড্রোজেন বিযুক্ত হয়, কো-এনজাইম NAD তা গ্রহণ করে। NAD থেকে আরো কয়েক প্রকার কো-এনজাইমের সহায়তায় (যেমন ফ্লেভোপ্রোটিন) শেষ পর্যন্ত হাইড্রোজেন যুক্ত হয় বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে। সৃষ্টি হয় পানির অণু। বাতাসের অক্সিজেন হাইড্রোজেন মিলন ঘটাবার বিক্রিয়ায় এনজাইম সাইটোক্রোম অক্সিডাজ (লৌহযুক্ত এনজাইম) পালন করে বিশেষ ভূমিকা। খুব সংক্ষেপে সাইট্রিক অ্যাসিড-চক্রকে ৮৩ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রের অনুরূপ দেখান যায়।

এক মলিকিউল পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয় ৩ মলিকিউল কার্বন ডাইঅক্সাইড। আর ২ মলিকিউল পানি। যেহেতু ১ মলিকিউল পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয় ৩ মলিকিউল কার্বন ডাইঅক্সাইড। আর ২ মলিকিউল পানি। তাই দুই মলিকিউল পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে সৃষ্টি হয় ৬ মলিকিউল কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ৪ মলিকিউল পানি। গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ২ মলিকিউল পানির উদ্ভব হয়। তাই ১ মলিকিউল গ্লুকোজ থেকে উৎপন্ন হয় ৬ মলিকিউল কার্বন ডাইঅক্সাইড ও ৬ মলিকিউল পানি। শ্বাসক্রিয়ার সাধারণ সূত্র দাঁড়ায় ঃ

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O.$$

চতুর্দশ অধ্যায়

# সালোক সংশ্লেষক ও রাসায়নিক সংশ্লেষক ব্যাকটিরিয়া

নীল-সবুজ শৈবাল, অন্যান্য শৈবাল এবং উন্নত সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের সাহায্যে পানির অণুকে ভেঙে হাইড্রোজেন লাভ করে। এই হাইড্রোজেন তারা বাতাস থেকে পাওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর সঙ্গে যুক্ত করে উৎপন্ন করে কার্বোহাইড্রেড। এই পদ্ধতিকে বলে ফটোসিনথেসিস বা সালোক সংশ্লেষণ। কিছু সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া সালোক সংশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনেক দিক থেকে ভিন্ন। ব্যাকটিরিয়ার সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোন মুক্ত অক্সিজেন ছাড়া পায় না। কারণ, তাদের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পানি থেকে আসে না। আসে অন্য বস্তু থেকে।

## সালোক সংশ্লেষী ব্যাকটিরিয়া

যেসব ব্যাকটিরিয়া সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম তাদের দেহে বিশেষ এক প্রকার ক্লোরোফিল থাকে, যাকে উল্লেখ করা হয় ব্যাকটিরিয়া-ক্লোরোফিল (bacteria chlorophyll) হিসাবে। এরা প্রধানত অবলোহিত আলোর (infra-red rays) সাহায্যে সালোক সংশ্লেষণ করে। অবলোহিত আলোর ঢেউ সাধারণ লাল আলোর চাইতে বড়। আমরা এই আলোয় কোন কিছু দেখতে পাই না। অন্য সবুজ গাছপালা অবলোহিত আলোর সাহায্যে সালোক সংশ্লেষণ করে না। তারা সালোক সংশ্লেষণে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করে সাধারণ লাল আলো।

যেসব ব্যাকটিরিয়া সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম তাদের মধ্যে পাটল রঙের গন্ধক ব্যাকটিরিয়া (thiospirillum) বিশেষভাবে পরিচিত। এরা সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$) ব্যবহার করে। হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে হাইড্রোজেন গিয়ে যুক্ত হয় কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে। উৎপন্ন হয় কার্বোহাইড্রেট। আর যে গন্ধক (S) ছাড়া পায় তা দানা দানা ভাবে জমতে থাকে ব্যাকটিরিয়া কোষে। যেসব ব্যাকটিরিয়া সালোক সংশ্লেষণ করে তারা প্রধানত অবায়ুজীবী এবং বাস করে বদ্ধ কাদা পানিতে। যেখানে জৈব বস্তু পচে যথেষ্ট হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হতে পারে।

banglainternet.com

হাইড্রোজেন সালফাইড ছাড়াও অন্য বস্তু থেকে (যেমন সরল জৈব অ্যাসিড) ব্যাকটিরিয়া সালোক সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন লাভ করতে পারে।

**রাসায়নিক সংশ্লেষী ব্যাকটিরিয়া**

কিছু ব্যাকটিরিয়া আছে যারা কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে সবুজ গাছের মত কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু এদের শরীরে কোন প্রকার ক্লোরোফিল থাকে না। এরা আলোকশক্তিকে ব্যবহার করতে পারে না। এরা কার্বোহাইড্রেট উৎপাদনের শক্তি লাভ করে অজৈব বস্তু (যেমন অ্যামনিয়া জারিত (oxidize) করে। এই ধরনের ব্যাকটিরিয়াকে বলে রাসায়নিক সংশ্লেষী বা কিমোসিনথেটিক (chemosynthetic) ব্যাকটিরিয়া। রাসায়নিক সংশ্লেষী ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে নাইট্রোসোমোনাস (nitrosomonas) এবং নাইট্রোব্যাকটার (nitrobacter) বিশেষভাবে পরিচিত। নাইট্রোসোমোনাস অ্যামোনিয়া ($NH_3$) জারিত করে নাইট্রোব্যাকটার নাইট্রাইট ($NO_2$) জারিত করে শক্তি লাভ করে।

সাধারণ সালোক সংশ্লেষণ, ব্যাকটিরিয়া সালোক সংশ্লেষণ এবং রাসায়নিক সংশ্লেষণ (chemosyntnesis) এভাবে ছক কেটে দেখান যায় :

**(ক) সবুজ উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণ :**

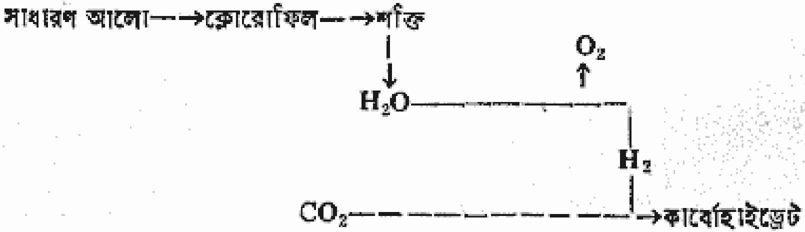


**(খ) ব্যাকটিরিয়া সালোক সংশ্লেষণ :**

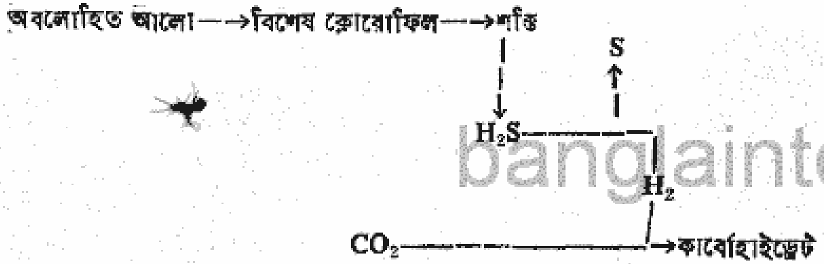


banglainternet.com



**(গ) রাসায়নিক সংশ্লেষণ :**

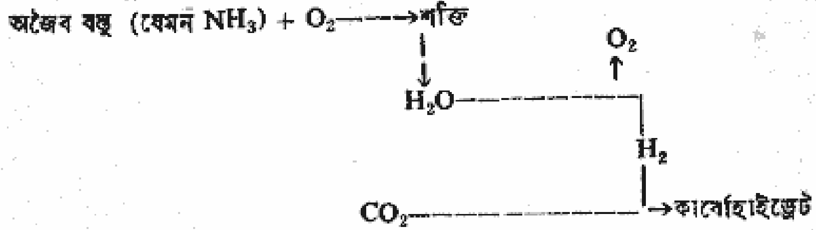


**পুষ্টি ধারায় বিবর্তন**

এক সময় মনে করা হত রাসায়নিক সংশ্লেষী ব্যাকটিরিয়ার (chemosynthetic bacteria) উদ্ভব ঘটেছে সবার আগে এবং অন্য সব ব্যাকটিরিয়ার আবির্ভাব হয়েছে পরে। কারণ, এরা সম্পূর্ণ অজৈব বস্তুকে নির্ভর করে বাস করতে পারে। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করা হয়। মনে করা হয় জৈব বস্তু গ্রহণকারী ব্যাকটিরিয়াদের আবির্ভাব (origin) হয়েছে আগে। কারণ, যারা জৈব বস্তু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, তাদের এনজাইম ব্যবস্থা অনেক কম জটিল। হলডেন-ওপারিন-এর মত অনুসারে আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যে রকম ছিল তাতে সেসময় সূর্যরশ্মির প্রভাবে সমুদ্রের পানিতে আপনা থেকে অনেক সরল জৈব বস্তুর উদ্ভব হওয়া সম্ভব ছিল। প্রথম জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব হয় এই সব জৈব বস্তু থেকে। আর তারা প্রথম দিকে স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন জৈব বস্তুকেই গ্রহণ করতো খাদ্য বস্তু হিসাবে। এখন সাধারণতঃ মনে করা হয়, অবায়ুজীবী (anaerobic) হিটেরোট্রপ (hcterotropic) ব্যাকটিরিয়া আবির্ভূত হয়েছিল আগে। এরপরে আসে সেইসব ব্যাকটিরিয়া যারা ব্যাকটিরিয়া ক্লোরোফিলের সাহায্যে আলোকশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জৈব বস্তু উৎপাদন করতে পারে কিন্তু হাইড্রোজেন গ্রহণ করে অন্য জৈব বস্তু থেকে। এরা ফটো অর্গ্যানোট্রোপ (Photo-organotrophs)। তারপরে আসে ফটোলিথোট্রপিক ব্যাকটিরিয়া (Photolithotropic bacteria)। যারা ফটোসিনথেসিস-এর জন্য প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন গ্রহণ করে অজৈব বস্তু যেমন $H_2S$ থেকে। রাসায়নিক সংশ্লেষী ব্যাকটিরিয়াদের উদ্ভব হয়েছে সবার পরে।

কিন্তু অনেকে মনে করেন, সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম জীব (arganism) দের আবির্ভাব হয়েছে সবার আগে। অনেক এক কোষী শৈবাল আছে, যাদের অধিক উত্তাপে আবাদ করলে তারা তাদের ক্লোরোফিল হারায় এবং আর ফিরে পায় না। এরা বাস করতে থাকে প্রোটজোয়া অ্যামিবার (amoeba) মত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

# নাইট্রোজেন বিপাক

প্রোটিন নাইট্রোজেন ঘটিত যোগ। প্রোটিনে গড়পড়তা শতকরা ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। তাই কোন খাদ্য বস্তুতে কি পরিমাণ প্রোটিন পদার্থ আছে, তার একটা মোটামুটি হিসাব পাবার জন্য প্রথমে ঐ খাদ্য বস্তুতে কি পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে তা নির্ণয় করা হয়। শতকরা যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে তাকে $\frac{100}{16}$ দিয়ে অর্থাৎ ৬·২৫ দিয়ে গুণ করলে প্রোটিনের শতকরা হিসাব পাওয়া যায়। জীবদেহে প্রোটিনের গুরুত্ব খুব বেশি। প্রোটিন কোষের অনেক অবয়বের কাঠামো গঠন করে এবং সর্বপ্রকার এনজাইমই প্রোটিন পদার্থ। এনজাইম ছাড়া কোন জীবকোষে কোন প্রকার জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলা সম্ভব নয়। রাসায়নিক দিক থেকে জীবন এনজাইম প্রক্রিয়ার একটি প্রকাশ মাত্র।

প্রোটিনকে আর্দ্র-বিশ্লেষণ করলে এক প্রকার অ্যামফটারিক (amphotaric) জৈব যৌগ পাওয়া যায়। এদের বলা হয় আমাইনো অ্যাসিড। সবচেয়ে সহজ অ্যামাইনো অ্যাসিড হল গ্লাইসিন, ($CH_2\,NH_2\,COOH.$)। প্রত্যেক অ্যামাইনো অ্যাসিড মলিকিউসের $NH_2$ অংশ হল ক্ষার আর COOH অংশ হল অ্যাসিড। একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড অণুর $NH_2$ অংশ আর একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড অণুর COOH অংশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এই সংযুক্তির ফলে ছাড়া পায় এক অণু পানি এবং নাইট্রোজেন ও কার্বনের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিশেষ রাসায়নিক বন্ধন, যাকে বলা হয় পেপটাইড বন্ধন (—NH—CO—) দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড অণু যখন একত্রিত হয় তখন তার একট $NH_2$ জোট একটা COOH জোটের সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে যে জৈবের উদ্ভব হয় তাকে বলা হয় ডাই-পেপটাইড। একটি ডাই-পেপটাইডের ($NH_2$) জোট আবার আর একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের COOH জোটের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। তিনটি অ্যামাইনো অ্যাসিড অণু মিলে গঠিত হয় ট্রাই-পেপটাইড। এভাবে একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড অণু মিলে গড়ে ওঠে প্রোটিন। সাধারণতঃ প্রোটিনে ৫০ অথবা তার চাইতে অধিক সংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাডিস একত্রিত থাকে। অ্যামাইনো অ্যাসিড-দের মত প্রোটিন ও অ্যামফটারিক (amphoteric) বস্তু। অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিডের মত প্রোটিনও অ্যাসিড ও অ্যালকালি—উভয়ের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারে।



## অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপাদন

অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক তাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন অজৈব নাইট্রোজেন যোগের সাহায্যে উৎপাদন করতে পারে।* ও ব্যাকটিরিয়া কোষে আলফা-কিটো-গ্লুটারিক অ্যাসিড (α ketoglutaric acid)-এর সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া ঘটে। এর ফলে উদ্ভব হয় আলফা-ইমিনোগ্লুটারিক অ্যাসিড (α-iminoglutaric acid)। তার সঙ্গে পানি যুক্ত হয়ে উদ্ভব হয় গ্লুটামিক অ্যাসিড (glutamic acid)। গ্লুটামিক অ্যাসিড একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসিড। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অন্য অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন হতে পারে।

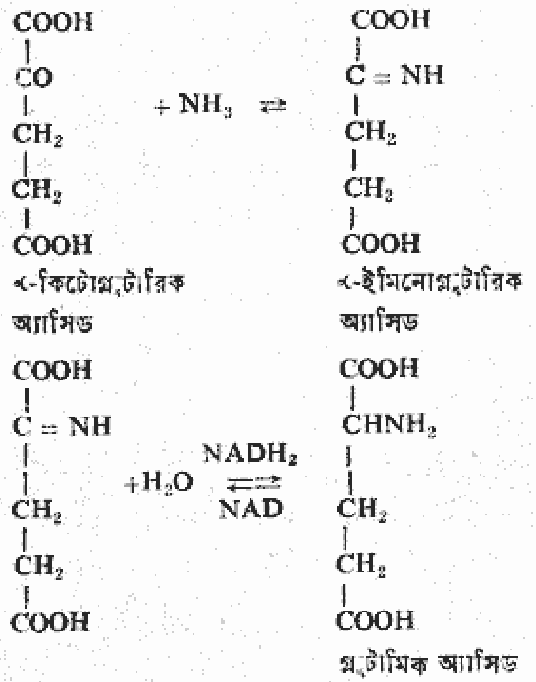


গ্লুটামিক অ্যাসিডের সঙ্গে অন্য কিটো অ্যাসিড এর বিক্রিয়া ঘটলে গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে $NH_2$ জোট ঐ কিটো অ্যাসিডে স্থানান্তরিত হয়। এবং একটি

* কিছু ব্যাকটিরিয়া আছে যারা বাতাসের নাইট্রোজেন ($N_2$) থেকে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করতে পারে এবং এই অ্যামোনিয়া থেকে প্রোটিন উৎপাদন করে। আমরা এদের কথা মৃত্তিকা ও জীবাণু অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

banglainternet.com

নতুন অ্যামাইনো অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। গ্লুটামিক অ্যাসিড নিজে রূপান্তরিত হয় আলফা-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিডে (α-ketoglutaric acid)।

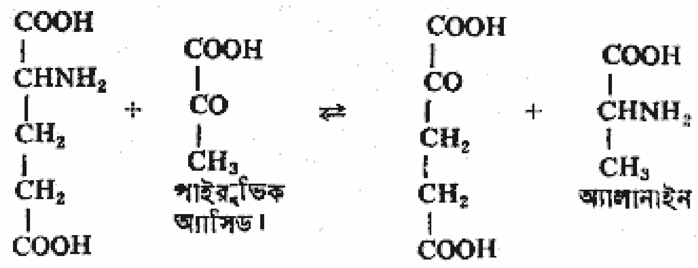


উপরের গ্লুটামিক অ্যাসিড পাইরুভিক অ্যাসিডে অ্যাসিডের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে $NH_2$ জোট নিয়ে যুক্ত হয়েছে পাইরুভিক অ্যাসিডের সঙ্গে। পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়েছে অ্যালানাইন (alanine) নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড। এরকমভাবে যেকোন অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে $NH_2$ জোট এক আলফা-কিটো অ্যাসিডে (α-keto acid) স্থানান্তরিত হতে পারে এবং তার ফলে উৎপন্ন হতে পারে একটা নতুন আলফা-অ্যামাইনো অ্যাসিড ও একটা নতুন আলফা-কিটো অ্যাসিড।

$$R_1-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-COOH + R_2-\underset{}{\overset{NH_2}{\overset{|}{CH}}}-COOH \rightleftharpoons R_1-\overset{NH_2}{\overset{|}{CH}}-COOH + R_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-COOH$$

**অ্যামাইনো অ্যাসিড ঘনীভবন**

আমরা বলেছি, অ্যামাইনো অ্যাসিড অণুরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এরকম ভাবে যুক্ত হবার সময় পানি বিযুক্ত হয়। এরকমভাবে পানি বিযুক্ত হয়ে অণুরা একত্রিত হওয়াকে বলে ঘনীভবন (condensation)।

banglainternet.com



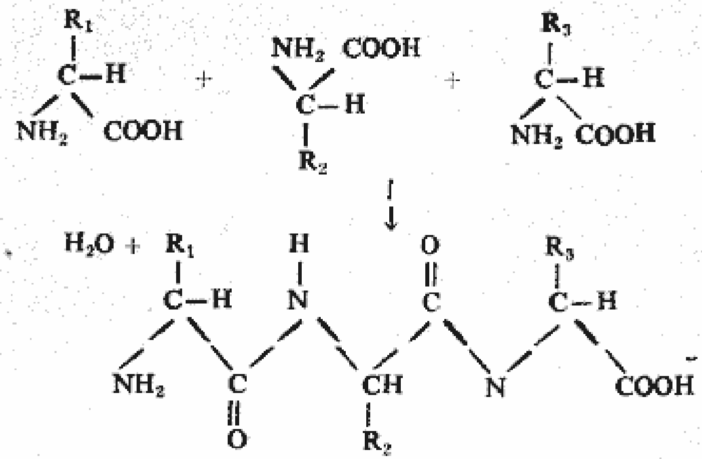


**প্রোটিন পচন বা পিউট্রিফ্যাকশন**

ব্যাকটিরিয়া এবং অন্যান্য জীবাণু কোন জীবের মৃত্যুর পর, তার দেহের প্রোটিন পদার্থ পচিয়ে ফেলতে থাকে। প্রোটিন পচনকে বলে পিউট্রিফ্যাকশন (putrefaction)। কারণ, এই পচনের সময় বিভিন্ন দুর্গন্ধ যুক্ত বস্তুর উদ্ভব হয়ে থাকে। যেমন হাইড্রোজেন সালফাইড ও অ্যামাইন। প্রোটিনের আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে প্রথমে উৎপন্ন হয় ছোট প্রোটিন বা পেপটোন (peptone)। পেপটোন থেকে উৎপন্ন হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং দুর্গন্ধ যুক্ত অ্যামাইন (amine)।

অ্যামাইন উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া বেশির ভাগ অবায়ুজীব (anaerobic) এরা প্রোটিনের আর্দ্র-বিশ্লেষণ ঘটাবার উপযোগী যেসব এনজাইম উৎপাদন করে তার প্রভাবে কিছু প্রোটিন ভেঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিডে এবং কিছু ভেঙ্গে পরিণত হয় অ্যামাইনে (amine)। যেসব অবায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া প্রোটিন থেকে অ্যামাইন উৎপাদন করে, তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ হল ক্লসট্রিডিয়াম (clostridium) গণভুক্ত।

বায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া সাধারণতঃ প্রোটিন ভেঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করে।

ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু প্রোটিন ভেঙ্গে যে অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড এরা নিজ দেহের প্রোটিন উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারে অথবা তাকে জারিত করে শক্তি লাভ করতে পারে :

$$\underset{\text{আমাইনো অ্যাসিড}}{H-\overset{R}{\underset{COOH}{C}}-NH_2} + \tfrac{1}{2}O_2 \xrightarrow[\text{অ্যাসিড অক্সিডাজ}]{\text{অ্যামাইনো}} \underset{\text{কিটো অ্যাসিড}}{\overset{R}{\underset{COOH}{C}}=O} + NH_3$$

যেসব বায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া প্রোটিন পচনে অংশ নেয় তাদের মধ্যে প্রোটিয়াস ভালগারিস ( Proteus vulgaris )-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাকটিরিয়াম সিসটেইন (cysteine) নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড ভেঙ্গে হাইড্রোজেন সালফাইড ($C_2S$) উৎপন্ন করে। পচা ডিমের বৈশিষ্ট্যময় দুর্গন্ধের কারণ, হাইড্রোজেন সালফাইড।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

# নিউক্লিক অ্যাসিড ও বংশগতি

নিউক্লিক অ্যাসিড খুব জটিল ধরনের জৈব যোগ। এদের প্রথম পাওয়া যায় কোষকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস থেকে। তাই এদের এরকম নামকরণ করা হয়েছে। ব্যাকটিরিয়া কোষে প্রধানত দুই প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিডকে বলে ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড ( deoxy ribomucleic acid )। সংক্ষেপে এদের বলে D N A। আর এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিডকে বলা হয় রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Ribonucleic acid)। সংক্ষেপে এদের বলে R N A। R N A-এর ক্ষেত্রে যেখানে থাকে রাইবোজ ($C_5H_{10}O_5$) সেখানে D N A-র ক্ষেত্রে থাকে ($C_5H_{10}O_4$)। অর্থাৎ এই দুই প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল পেনটোজ চিনি রাইবোজ নিয়ে। আরো অবশ্য অনেক পার্থক্য আছে এই দুই প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে। যেমন D N A-তে যেখানে থাকে থাইমিন (thymine) নামক নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারবস্তু, সেখানে D N A-তে থাকে ইউরাসিল (uracil) নামক ক্ষারবস্তু।

উভয় বিধ নিউক্লিক অ্যাসিডকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় তিন প্রকার যোগ। এরা হল পেনটোজ চিনি (৫-কার্বন চিনি) নাইট্রোজেন যুক্ত জৈব ক্ষার বস্তু (Nitrogen-containing base) ও ফসফরিক অ্যাসিড। ফসফরিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিডে থাকে ফসফেট জোট ($PO_4$) হিসাবে। নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষার বস্তুরা দুটি বিভিন্ন বিভাগে পড়ে। একটি বিভাগকে বলে পাইরিমাইডিন ( Pyrimidine ) আর অন্য বিভাগকে বলে পিউরিন ( Purine )। পাইরিমাইডিনে থাকে মাত্র একটি যুক্ত শৃংখল ( ring ), সেখানে পিউরিনে থাকে দুইটি যুক্ত শৃংখল। পাইরিমা ইডিনের একটি দৃষ্টান্ত হল সাইটোসিন (cytosine)।

banglainternet.com

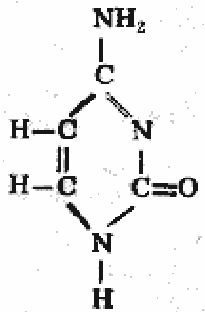

পিউরিনের একটা দৃষ্টান্ত হল অ্যাডিমাইন (ademine) ঃ

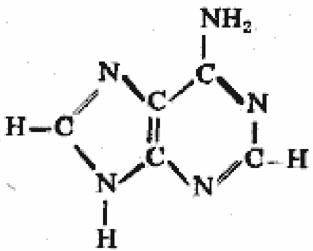

নিউক্লিওটাইড বলতে বোঝায় ফসফেট, পেনটোজ চিনি ও নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষার বস্তু সহযোগে গঠিত যৌগ। নিউক্লিক অ্যাসিড বা একাধিক নিউ-ক্লিওটাইড সহযোগে গঠিত। প্রত্যেক নিউক্লিওটাইড-এর চিনি অংশের ফস-ফেট জোট যুক্ত থাকে ঃ

ফসফেট----চিনি---বেস
|
ফসফেট---চিনি---বেস
|
ফসফেট---চিনি---বেস
প্রভৃতি।

এভাবে বিরাট নিউক্লিক অ্যাসিড অণু গড়ে ওঠে। R N A ও D N A-এর মধ্যে একটি পার্থক্য হল R N A একাধিক নিউক্লিওটাইড দিয়ে তৈরী একটা লম্বা তন্তু (strand) বিশেষ। কিন্তু D N A সাধারণতঃ দুইটি নিউক্লিও-টাইড তন্তু দ্বারা গঠিত। এরা পরস্পরের সঙ্গে প্যাঁচ খেয়ে থাকে। জীবের বংশ-গতিতে (heridity) এবং জীবকোষে বৈশিষ্ট্যময় প্রোটিন উৎপাদনে নিউ-ক্লিক অ্যাসিড খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



### ট্রান্সফরমেশন (Transformation)

ট্রান্সফরমেশন বলতে বোঝায় এক ব্যাকটিরিয়াকুল থেকে D N A নিয়ে অন্য ব্যাকটিরিয়াকুলে প্রদান করে বংশগত গুণ স্থানান্তরণ। যেমন মসৃণ নিউমো ককাই (smooth pneumococci) থেকে D N A নিয়ে যদি অমসৃণ নিউমো-ককাই-এ (rough pneumococci) প্রদান করা যায়, তবে তা থেকে যেসব ককাই উৎপন্ন হতে থাকে, তারা সকলেই হয় মসৃণ প্রকৃতির। কেবল যে তারা মসৃণ প্রকৃতির হয় তাই নয়, তারা অন্য গুণও লাভ করতে পারে। যেমন অ্যান্টি-বায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা। ট্রান্সফরমেশন পরীক্ষা থেকেই প্রথম প্রমাণিত হয় জীবের বংশগতিতে D N A-এর গুরুত্ব। আগে মনে করা হত বংশগতির বাহক হল প্রোটিন। কিন্তু এখন ধরা হয় D N A।

### প্রোটিন সংশ্লেষণ

প্রোটিন সংশ্লেষণে R N A বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অনেক এনজাইম আছে, যারা সাধারণ অবস্থায় ব্যাকটিরিয়াদেহে উৎপাদিত হয় না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় হয়। যে সব এনজাইম বিশেষ বস্তুর উপস্থিতিতে উৎপন্ন হয়, এবং সাধারণভাবে কোন ব্যাকটিরিয়ামের দেহে সর্বাবস্থায় থাকে না, তাকে বলা হয় অভিযোজক এনজাইম (adaptive enzyme)। অ্যাডাপটিপ বা অভি-যোজক এনজাইম উৎপাদনের সময় ব্যাকটিরিয়া দেহে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বাড়তি R N A উৎপন্ন হতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে ইসচেরিচিয়া কোলাই ব্যাক-টিরিয়ার বিটা-গ্যালাকটোসিডাজ (B-galactosidase) এনজাইমের কথা উল্লেখ করা চলে। আবাদ মাধ্যমে গ্যালাকটোজ থাকলেই ইসচেরিচিয়া কলাই (Escherichea coli) এই বিশেষ এনজাইমটি তৈরী করতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে এই বিশেষ এনজাইম তৈরীর সময় ইসচেরিচিয়া কোষে বৈশিষ্ট্য সূচক R N A-র উদ্ভব হয়, যা অন্য সময় ইসচেরিচিয়া কোষে থাকে না।

এখন সাধারণভাবে মনে করা হয় জীবন বা কোষকেন্দ্রের D N A অণুর বিশেষ বিশেষ অংশ বিশেষ বিশেষ R N A উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে। আর R N A প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

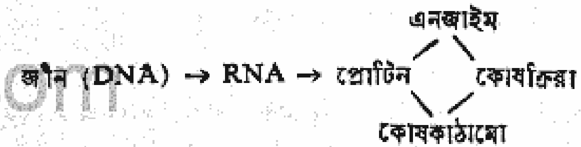


banglainternet.com

সপ্তদশ অধ্যায়

# ভাইরাস ঃ ব্যাকটিরিয়া থেকে ছোট রোগ উৎপাদক বস্তু

ভাইরাসদের (virus) ঠিক সাধারণ অর্থে জীবাণু বলা যায় না। কিন্তু অন্যান্য জীবাণুর সঙ্গে তাদের কথাও আলোচনা করতে হয়। কারণ রোগজীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েই হয়েছে তাদের আবিষ্কার এবং বাস্তবক্ষেত্রে ভাইরাসদের অনেক আচরণই সংক্রামক রোগ জীবাণুদের মত। কিন্তু যাদের এখন সাধারণতঃ বলা হয় ভাইরাস, তাদের সঙ্গে অন্যান্য জীবাণুদের একাধিক পার্থক্য আছে ঃ

১। অধিকাংশ ভাইরাস কণিকার ব্যাস ০·১ মাইক্রোমিটারের কম। সাধারণ আলোক মাইক্রোসকোপের সাহায্যে তাদের দেখা যায় না।

২। ভাইরাসরা অন্যান্য জীবাণুর মত কোষ (cell) দ্বারা গঠিত নয়।

৩। ভাইরাসরা প্রধানত নিউক্লিওপ্রোটিন (Nucleoprotein) কণিকা।

৪। এই নিউক্লিও প্রোটিনে হয় R N A নতুবা D N A থাকে। প্রকৃত ভাইরাসে R N A ও D N A একত্রে থাকতে দেখা যায় না (খুব বেশী ভাইরাসের রাসায়নিক বিশ্লেষণ অবশ্য এখনও করা হয়নি)।

৫। ভাইরাস কেবলমাত্র তার নিউক্লিক অ্যাসিড (nucleic acid) অংশের সাহায্যে বংশবিস্তার করতে পারে।

যে সব ভাইরাস ব্যাকটিরিয়া আক্রমণ করে, তাদের বলে ব্যাকটিরিওফাজ (Bacteriophage)। সংক্ষেপে ফাজ (phage) নিয়ে গবেষণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। উপযুক্ত ব্যাকটিরিয়ার উপর ফাজ প্রয়োগ করলে, ব্যাকটিরিয়া কোষে ফাজ সহজেই বহুগুণিত হতে পারে। ইচ্ছামত ফাজ উৎপাদন করে অনুসন্ধান চালান যায়। ফাজ নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণার ফলে সাধারণভাবে ভাইরাসদের সম্পর্কে অনেক কিছু জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়েছে। আমরা প্রথমে ফাজ সম্পর্কে ও পরে প্রাণী ও উদ্ভিদ ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করবো। ভাইরাস সম্পর্কে সমগ্রভাবে একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করবো।

## ব্যাকটিরিওফাজ

যাদের আমরা বলি ব্যাকটিরিও ফাজ তারা প্রধানত প্রোটিন ও D N A দ্বারা গঠিত। কিছু ফাজের কথা জানা আছে, যারা প্রোটিন ও R N A দ্বারা গঠিত।

banglainternet.com



কিন্তু D N A ফাজ নিয়েই হয়েছে অধিক গবেষণা। এদের মধ্যে $T_2$ ব্যাকটিরিও ফাজই আবার হল সবচেয়ে পরিচিত। আমরা $T_2$ ফাজের জীবনচক্র নীচে বর্ণনা করছি।

## ফাজের জীবনচক্র

$T_2$ ফাজ নিয়ে গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে এদের D N A অংশই কেবল ব্যাকটিরিয়া কোষে প্রবেশ করে আর প্রোটিন অংশ থেকে যায় ব্যাকটিরিয়া কোষের বাইরে। D N A থাকে $T_2$ ফাজের মাথার মত অংশে। ব্যাকটিরিয়া কোষের গায় লেজের মত অংশ নিয়ে যুক্ত হয়। এই অংশ থেকে এক প্রকার এনজাইম ক্ষরিত হয়, যা ব্যাকটিরিয়া কোষের প্রাচীরে রন্ধ্রের সৃষ্টি করে। মাথার মত অংশের ভিতর যে D N A থাকে তা লেজের মত অংশের মধ্য দিয়ে ব্যাকটিরিয়া কোষে প্রবেশ করে। ব্যাকটিরিওফাজের আবরণ এক্ষেত্রে কতকটা তুলনা করা যায় ইনজেকসন সিরিঞ্জের (syringe) সঙ্গে। ফাজ যেন তার দেহের D N A ব্যাকটিরিয়া দেহে জোর করে ঢুকিয়ে দেয়। এ সময় ফাজের আকৃতি কিছুটা সংকুচিত হয় বলে মনে হয়। এই সংকোচন-শক্তি তারা অবশ্য লাভ করে ব্যাকটিরিয়া কোষ থেকে। ফাজ জীবনচক্রের এই পর্বকে বলে ইনজেকসন ফাজ (Injection phage)। তারপর ফাজ D N A ব্যাকটিরিয়া কোষের মধ্যে কিভাবে অবস্থান করে তার কথা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থাকে বলে লীন অবস্থা (latent period)। এর পরের অবস্থায় ফাজ কণিকাদের উৎপন্ন হতে দেখা যায়। এদের কোন 'লেজ' থাকে না। পরে ব্যাকটিরিয়া কোষটি ফেটে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ ফাজকণিকারা বেরিয়ে আসে। এই পর্বকে বলে বিস্ফোরণ দশা ( bust period ) (চিত্র নং ৫)। ব্যাকটিরিয়া কোষ ভেঙে ফাজ বেরিয়ে আসার পদ্ধতিকে সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় লাইসিস (lysis) হিসাবে।

অর্থাৎ অন্য জীবাণুরা যেভাবে কোষ বিভক্ত হয়ে বংশবিস্তার করতে পারে, ফাজের ক্ষেত্রে তা হয় না। ফাজের ক্ষেত্রে বংশবিস্তার হয় কেবল মাত্র নিউক্লিক অ্যাসিডের মাধ্যমে। ফাজ নিউক্লিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া কোষে প্রবেশ করায় ব্যাকটিরিয়া কোষের বিপাকক্রিয়াকে বিশেষভাবে বদলে দেয়। যার ফলে ফাজ প্রোটিন উৎপাদিত হয়। ফাজ নিউক্লিক অ্যাসিড যেন কাজ করে কো-এনজাইম-এর মত। ঠিক কিভাবে ফাজ প্রোটিন ব্যাকটিরিয়া কোষে উৎপন্ন হতে থাকে সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে এখন কিছু জানা সম্ভব হয়নি। $T_2$

ফাজের D N A-এর সঙ্গে ব্যাকটিরিয়ার D N A-র কিছু পার্থক্য আছে। যেমন ব্যাকটিরিয়া দেহে D N A-তে যেখানে থাকে সিটোসিন (cytosine) সেখানে ফাজ D N A-তে পেনটা-মিথাইল-সিটোসিন (5-methyl cytosine)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যাকটিরিয়া দেহে উৎপন্ন হতে হয় এমন D N A যা তার দেহে থাকে না। একটা নতুন নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষার পদার্থের সৃষ্টি হতে হয় ব্যাকটিরিয়া কোষের মধ্যে।

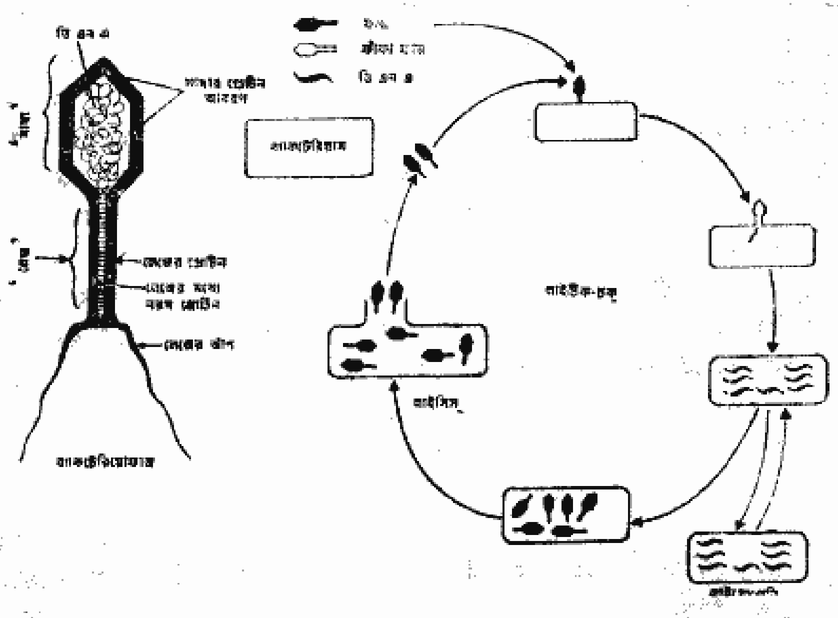

রেখাচিত্র ৫ : ব্যাকটিরিওফাজ। লাইটিক-চক্র। লাইসোজেনি। লাইসিস।

অনেক সময় ফাজ ব্যাকটিরিয়া আক্রমণ করে। কিন্তু ফাজ নিউক্লিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া দেহের মধ্যে বৃদ্ধি পেলেও পূর্ণাঙ্গ ফাজ সৃষ্টি হয় না। এসব ক্ষেত্রে ফাজ নিউক্লিক অ্যাসিড বংশপরম্পরায় নিউক্লিক অ্যাসিড হিসাবে ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে থেকে যায়। এই ঘটনাকে বলা হয় লাইসোজেনি ( lysogeny )। লাইসোজেনি-র ফলে অনেক সময় দেখা যায় ব্যাকটিরিয়া কোষের আচরণ পরিবর্তিত হতে। যেমন সাধারণতঃ যেসব ডিপথেরিয়া ব্যাকটিরিয়া ডিপথেরিয়া রোগ উৎপাদন করে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে লাইসোজেনিক



(lysogenic)। লাইসোজেনিক ডিপথেরিয়া ব্যাকটিরিয়া এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করে যা ডিপথেরিয়া রোগের কারণ। লাইসোজেনি ঘটনাটিকে কতকটা তুলনা করা চলে মিথোজীবিতার (symbriosis) সঙ্গে। মনে হয় এ ক্ষেত্রে ফাজ ও ব্যাকটিরিয়া উভয়েই পরস্পরের দ্বারা কিছুটা উপকৃত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ ফাজের আক্রমণে ব্যাকটিরিয়া মারা যায়। তাই অনেক সময় এদের আক্রমণের জন্য ব্যাকটিরিয়াকে ভালভাবে কাজে লাগান যায় না। যেমন ফাজের আক্রমণে ব্যাকটিরিয়া মারা যাবার জন্য দই ভালভাবে জমে না। পনির তৈরির জন্য যেসব ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করা হয় তারা ফাজের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। কোন পনির কারখানায় যদি অধিক সংখ্যক ব্যাকটিরিওফাজের উদ্ভব হয় তবে তাদের আক্রমণে পনির তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাকটিরিয়া মারা যেতে থাকে। ফলে পনির প্রস্তুতের কাজ ব্যাহত হয়। মাটিতে ব্যাকটিরিওফাজ অনেক ব্যাকটিয়াকে মেরে ফেলে। যেসব ব্যাকটিরিয়ায় সীমজাতীয় গাছের (leguminous) শিকড়ে হয় ও বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে গাছের পুষ্টি বিধান ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে তারাও ফাজের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কোন জমিতে তাই যদি এসব ব্যাকটিরিয়া আক্রমণকারী ফাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে সীমজাতীয় গাছ চাষের ক্ষতি হতে পারে।

ফাজ-রা ব্যাকটিরিয়া আক্রমণ করে মেরে ফেলে। তাই প্রথম যখন এদের বিষয় জানা যায়, তখন অনেকে মনে করেন ফাজের সাহায্যে অনেক প্রকার রোগ দমন করা যাবে। কিন্তু মানুষের শরীরে ফাজ প্রয়োগ করে এখনও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। ফাজ যখন মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হয় তখন মানুষের দেহে জীবাণুকে তারা আক্রমণ করতে পারে না। মানুষের রক্তের মধ্যে ফাজ যে এন্টিবডি (antibody) সৃষ্টি করে তার সাথে একত্রিত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তবে অনেকেই মনে করেন ব্যাকটিরিওফাজরা পানিতে ও মাটিতে রোগজীবাণু ধ্বংস করে। ব্যাকটিরিওফাজ না থাকলে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পেতে পারত।

সব ফাজ সব কুলের (strain) ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে না। ফাজের সাহায্যে তাই একটি বিশেষ প্রজাতির ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে বিভিন্ন কুলকে সনাক্ত করা যেতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে একটি ব্যাকটিরিয়া প্রজাতির বিভিন্ন কুল থাকতে পারে। যেসব ব্যাকটিরিয়া মানুষের রোগ উৎপাদন করে তারা এক

banglainternet.com

অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে মহামারী সৃষ্টি করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ফাজের সাহায্যে কোন কুলের ব্যাকটিরিয়াকে সনাক্ত করে বলা যেতে পারে কোন উৎস থেকে ঐ রোগের সংক্রমণ প্রথম আরম্ভ হয়েছে। ফাজের সাহায্যে ব্যাকটিরিয়া সনাক্তকরণ পদ্ধতি তাই অনেক সময় রোগবিস্তার-উৎস সন্ধানে সহায়ক হতে পারে। ফাজের সাহায্যে একটি ব্যাকটিরিয়ামের বিভিন্ন উপদল বা কুলের (strain) বর্ণনা করাকে বলা হয় ফাজ টাইপিং (Phage typing)। ফাজ টাইপিং রোগজীবাণু সনাক্ত করার কাজে সহায়তা করে।

### ট্রান্সডাকশন

সব ফাজ সব ব্যাকটিরিয়াকে মেরে ফেলে না। কোন বিশেষ ফাজ কোন বিশেষ কুলের ব্যাকটিরিয়াকে মেরে ফেলতে পারে। আবার অন্য কুলের ক্ষেত্রে আচরণ করতে পারে অনুগ্রভাবে। এক্ষেত্রে ফাজ দ্বারা আক্রান্ত ব্যাকটিরিয়া মারা যায় না। কোন ফাজ যখন কোন ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে না। তখন তাকে বলা হয় টেমপারেট বা অনুগ্রভাজ (Temparate phage)। টেমপারেট ফাজরা লাইসোজেনিকভাবে ব্যাকটিরিয়া কোষে অবস্থান করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ফাজ এক কুলের ব্যাকটিরিয়া থেকে এক অথবা একের অধিক বংশগত গুণ অন্য ব্যাকটিরিয়া কুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনাকে বলা হয় ট্রান্সডাকশন (transduction)। সম্ভবতঃ ফাজ এক ব্যাকটিরিয়ার DNA অংশ অন্য ব্যাকটিরিয়ায় নিয়ে যায় বলেই এরকম ঘটে। তবে ফাজ খুব বেশি গুণকে এক ব্যাকটিরিয়া কুল থেকে অন্য কুলে স্থানান্তরিত করতে পারে।

### প্লাজমিড

প্লাজমি (plasmid) কতকটা ফাজের মত। কিন্তু এরা ব্যাকটিরিয়ার কোন ক্ষতি করে না। প্লাজমিড ব্যাকটিরিয়ার সাইটোপ্লাজমে থাকে এবং প্রধানত DNA দ্বারা গঠিত। এরা এক ব্যাকটিরিয়া কোষ থেকে অন্য ব্যাকটিরিয়া কোষে যেতে পারে। এদের মাধ্যমেও ব্যাকটিরিয়ার বিশেষ গুণ স্থানান্তরিত হতে পারে। যেমন কোন বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিকের ক্রিয়া প্রতিরোধের ক্ষমতা।

### প্রাণী ও উন্নত উদ্ভিদের রোগ উৎপাদক ভাইরাস

বড় ব্যাকটিরিওফাজের গঠন যথেষ্ট জটিল। কিন্তু অধিকাংশ ভাইরাসের সংগঠন এত জটিল নয়। যাদের আমরা ভাইরাস বলে চিহ্নিত করি, তাদের

banglainternet.com



প্রধান ঐক্য হল, তারা কেউই কোষ দ্বারা গঠিত নয়; তারা কেউই উপযুক্ত পোষক কোষের সাহায্য ছাড়া বংশবিস্তার করতে পারে না এবং সকলেই বংশ বিস্তার করে কেবলমাত্র তাদের নিউক্লিক অ্যাসিডের সাহায্যে। ভাইরাস কণিকা প্রথম উপযুক্ত জীবন্ত পোষক কোষের উপর অধিশোষিত (adsorb) হয়। তারপর তাদের নিউক্লিক অ্যাসিড অংশ কোষের ভিতরে প্রবেশ করে এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর কোষের মধ্যে উৎপন্ন হয় পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস কণিকা। পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস কণিকা (যাদের অনেকে উল্লেখ করেন 'ভিরিয়ন' বলে) অনেক সময় পোষক কোষ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে এক সঙ্গে। আবার অনেক ক্ষেত্রে (প্রধানত প্রাণীদের ক্ষেত্রে) তারা একের পর এক 'বেরিয়ে আসতে থাকে কোষ আবরণ ভেদ করে, ধীরে ধীরে। আমরা নীচে কতগুলি অতি পরিচিত উদ্ভিদ ও প্রাণী আক্রমণকারী ভাইরাসের সাধারণ বিবরণ প্রদান করছি :

| নাম | ওজন (ডালটন) | আকার (ন্যানো মিঃ | আকৃতি | নিউক্লিক অ্যাসিড | প্রোটিন | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| তামাকের সাধারণ-মোজেইক (TMV) | ৪০×১০$^{৬}$ | ১৮×৩০০ | দণ্ডাকৃতি | RNA | ৯৪% | পলি অ্যামাইন ০·০০৩% |
| টমেটো বুশিস্টান্ট | ৯×১০$^{৬}$ | ৩০ | গোলাকৃতি | RNA | ৮০% | |
| গাজরের হলুদ মোজেইক | ৫×১০$^{৬}$ | ২২ | গোলাকৃতি | RNA | ৬৫% | |
| পোলিও | ১০×১০$^{৬}$ | ২৭ | গোলাকৃতি | RNA | ৭৫% | |
| খর-গোসের প্যাপি-লোমা | ৫০×১০$^{৬}$ | ৪৫ | গোলাকৃতি | DNA | ৯০% | |
| ইন-ফ্লুয়েঞ্জা | ২৮০×১০$^{৬}$ | ৮০ | গোলাকৃতি | RNA | ৭০% | কার্বো-হাইড্রেট ২০% লিপিড ৫% |
| গোবসন্ত | ৩×১০$^{৬}$ | ২৮×২২×২২ | ইষ্টকাকৃতি | DNA | ৯০% | লিপিড ৬% |

১ ডালটন = হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন।
১ ন্যানো মিটার = ১০$^{-৯}$ মিটার।

সাধারণভাবে যাদের বলা হয় গোলাকৃতি, তাদের ভালভাবে পরীক্ষা করলে ধরা পড়ে যে তারা আইকোসাহেড্রন (Ichosahedron)। আইকোসাহেড্রন বলতে বোঝায় ২০-সমতলবিশিষ্ট(plane)। প্রত্যেকটি সমতল এক একটি সমবাহু ত্রিভুজ।

প্রত্যেক ভাইরাসের প্রোটিন আবরণকে বলে ক্যাপসিড (capsid)। এক্স-রে বিচ্ছুরণ (x-ray deffraction) থেকে বোঝা যায় যে এই প্রোটিন একক (unit) দিয়ে তৈরি। এসব একক-কে বলা হয় ক্যাপসোমার (capsomer)।* বিভিন্ন ভাইরাস প্রোটিনের ক্যাপসোমার বিন্যাস হতে পারে ভিন্ন। নিউক্লিক অ্যাসিড গোল ভাইরাসের ক্ষেত্রে থাকে ভিতরে। তার উপরে থাকে প্রোটিন আবরণ। কতকটা বাক্সের মত (ক্যাপসিড মানে বাক্স)। কিন্তু তামাকের মোজেইক রোগের ভাইরাসের ক্ষেত্রে তা থাকে কিছুটা ভিন্নভাবে। তামাক গাছের এই ভাইরাস দণ্ডাকৃতি। এই দণ্ডের মধ্য ভাগ হল ফাঁপা। সাধারণ এর মধ্যে পানি পোরা থাকে। এই ফাঁপা অংশের ব্যাস ৪ ন্যানোমিটারের কাছাকাছি। এই ফাঁপা কেন্দ্রের চারদিক দিয়ে প্যাঁচানো (helical) ভাবে সাজান থাকে ক্যাপসোমার। প্রতি ভাইরাস কণায় থাকে প্রায় ২১ হাজার ক্যাপসোমার। এই ক্যাপসোমার দিয়ে ঢাকা থাকে R N A। তামাকের মোজেইক কণিকায় তন্তুর মত একটা লম্বা R N A অণু ভাইরাস কণিকার নীচে থেকে উপর দিকে প্যাঁচালভাবে থাকে।

প্রাণীর ভাইরাসের ক্ষেত্রে থাকতে পারে লিপোপ্রোটিন। ক্যাপসিডের উপরে থাকে এই লিপোপ্রোটিনের আবরণ। যেসব ভাইরাসের ক্যাপসিডের উপর লিপোপ্রোটিনের (Lipoprotein) আবরণ থাকে তাদের ইথারের (ether) সাহায্যে ধৌত করলে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

### ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি

ভাইরাসরা সাধারণতঃ সজীব পোষক কোষের সহায়তা ছাড়া বংশবিস্তার অর্থাৎ সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে পারে না। কিন্তু তামাক গাছের মোজেইক ভাইরাস থেকে R N A পৃথক করে তাকে তামাক গাছের কোষ থেকে প্রাপ্ত সজীব

* ভাইরাস নিয়ে গবেষণার কাজে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় ৪০ কিলোভোল্ট পটেনশিয়াল বিদ্যুৎ। এই পরিমাণ ভোলটে যে ধরনের এক্স রশ্মি উৎপন্ন হয়, তা প্রোটিন কণিকারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহত করে ফিরিয়ে দিতে পারে। তাই এক্সরে চিত্রাঙ্কন

banglainternet.com



ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast) ও নিউক্লিয়াস-এর মিশ্রণের মধ্যে প্রদান করে দেখা গিয়েছে যে ঐ মিশ্রণের মধ্যেও ভাইরাস উৎপাদন সম্ভব।* অর্থাৎ ভাইরাস উৎপাদনের জন্য গোটা একটা উদ্ভিদ কোষের প্রয়োজন করে না।*

ভাইরাসদের জীবন্ত বস্তু না এনজাইম (enzyme) জাতীয় বিরাট অণু তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এ ক্ষেত্রে সব ভাইরাসকে এক করে দেখা যায় না। কিছু ভাইরাস আছে, যারা এনজাইম উৎপাদন করতে পারে। এদের দেহ গঠনও যথেষ্ট জটিল। যারা এনজাইম উৎপাদন করতে পারে, তাদের ভাবা চলে জীবন্ত বলে। কিন্তু অধিকাংশ উদ্ভিদ-রোগ উৎপাদক ভাইরাস খুব ছোট। তারা নিজেরা কোন এনজাইম উৎপাদন করতে পারে বলে প্রমাণিত হয়নি। তাদের আবরণ বিরাট জৈব অণু বা পরা-অণুর (Macromolecule) মত। এসব ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি, মনে হয়, কেবলই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। কিন্তু প্রাণীদের রোগ উৎপাদক বড় ভাইরাসদের আচরণ এ ক্ষেত্রে অনেক স্বতন্ত্র।

সব রকম ভাইরাস উপযুক্ত পোষক কোষের মধ্যে কিভাবে সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও খুবই অপূর্ণ আছে। ভাইরাসদের সংখ্যাবৃদ্ধিকে সাধারণতঃ সাতটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হয় :

১। পোষক কোষের সঙ্গে সংযুক্তি ;
২। কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ ;
৩। প্রোটিন আবরণ বিযুক্তি ;
৪। কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরিবর্তন ;
৫। ভাইরাসের অংশসমূহের সংশ্লেষণ ;
৬। অংশের একত্রীকরণ এবং
৭। পোষক কোষ থেকে ভাইরাস নির্গমন।

চিত্র পাওয়া যায়। হাসপাতালে সাধারণতঃ ছবি তোলায় সময় ব্যবহার করা হয় ৮০ থেকে ১০০ কিলোভোল্ট পোটেনশিয়াল। ভাইরাস নিয়ে গবেষণার কাজে এত তীব্র এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয় না।

* G. W. Cochran (1966) ; The Cell-Free Synthesis of Whole Tobaacoo-Mosaic Virus by Chloroplast–Nuclear Mixture from healthy plant, In Viruses of plants. PP. 195–305. Ed. A.B.R. Beemsterk and J. Dijksta. North Holland Publishing Co. Amsterdam.

ব্যাকটিরিওফাজ ও উদ্ভিদ ভাইরাসদের ক্ষেত্রে নিউক্লিক অ্যাসিডের সঙ্গে সম্ভবতঃ খুব কম মাত্রায় কিছু প্রোটিন বস্তু কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। এই প্রোটিন বস্তু খুব সহজেই নিউক্লিক অ্যাসিড থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়। উদ্ভিদ ভাইরাসের ক্ষেত্রে নিউক্লিক অ্যাসিড পৃথক করে তার সাহায্যে উদ্ভিদ কোষে ভাইরাস উৎপাদন করে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে এই সব ভাইরাস নিউক্লিক অ্যাসিডের সাহায্যে বংশবিস্তার করে। কিন্তু প্রাণীদের রোগ উৎপাদক বড় ভাইরাসদের ক্ষেত্রে এরকম কিছু এখনও প্রমাণ করে দেখান সম্ভব হয়নি। এসব ভাইরাস থেকে নিউক্লিক অ্যাসিড পৃথক করলে তা তার সক্রিয়তা হারায়। কোষের উপর এদের প্রয়োগ করলে তা পোষক কোষে প্রবিষ্ট হয়ে ভাইরাস উৎপাদন করতে পারে না। অধিকাংশ প্রাণী ভাইরাসের ক্ষেত্রে ভাইরাস কণিকারা প্রোটিনসহ পোষক কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। ভাইরাস যখন কোন উপযুক্ত পোষক কোষের সংস্পর্শে আসে তখন পোষক কোষ তাকে ভিতরে নিয়ে গ্রাস করতে চায়। কতকটা ফ্যাগোসাইটদের মত। ভাইরাস পোষক কোষের মধ্যে যাবার পর তার প্রোটিন আবরণ (capsid) আসতে আসতে দ্রবীভূত হয়ে যায়। নিউক্লিক অ্যাসিড অংশ কোষবস্তুর মধ্যে মনে হয় যেন বিশেষভাবে মিশে যায়। ঠিক কি ঘটে সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও সুস্পষ্ট নয়। পোষক কোষের বিপাক ক্রিয়ায় (metabolism) বিশেষ পরিবর্তন আসে এবং তার মধ্যে ভাইরাস প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদিত হতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে এই সব দ্রব্য একত্রিত হয়ে গড়ে উঠতে থাকে পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস কণিকা (ভিরিয়ন)। এর পর এইসব কণিকা কোষ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে।

অর্থাৎ যাদের আমরা বলি ভাইরাস তাদের বংশ বৃদ্ধি অথবা সংখ্যা বৃদ্ধি সবার ক্ষেত্রে ঠিক একভাবে ঘটে না। ছোট ভাইরাসদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে মনে হয় বিশেষভাবেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। কিন্তু বড় ভাইরাসদের ক্ষেত্রে সংখ্যাবৃদ্ধির ঘটনাটি অনেক পরিমাণে অন্য জীবাণুদের মত। এমন হতে পারে যে যাদের আমরা এখনও ভাইরাস হিসাবে একত্রে আলোচনা করি তারা আসলে খুবই বিভিন্ন জাতীয় বস্তু (heterogeneous group)। খুব ছোট ভাইরাসরা আচরণ করে জৈব পরাঅণুর (Macromolecule) মত। কিন্তু বড় ভাইরাসরা আসলে অনেক পরিমাণে অন্য জীবাণুদের মত। ভাইরাসদের এক প্রান্তে সাজাতে হয় ছোট ভাইরাসদের অন্য প্রান্তে বড় ভাইরাসদের।

banglainternet.com



### ভাইরাসের শ্রেণীবন্ধন

কোন বিষয় গুছিয়ে আলোচনা করতে হলে আলোচ্য বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ করতে হয়। ভাইরাসদের সাধারণতঃ প্রথমে দুটি বড় বিভাগে (sections) ভাগ করা হয়। একটি বিভাগকে বলা হয় ডিওকসি ভাইরা (deoxy vira) আর অপর বিভাগকে বলা হয় রাইবো ভাইরা (ribo vira)। ডিওকসি ভাইরা বিভাগে স্থাপন করা হয় সেই সব ভাইরাসদের, যাদের নিউক্লিক অ্যাসিড হল DNA আর রাইবো ভাইরা বিভাগে স্থাপন করা হয় সেই সব ভাইরাসদের যাদের নিউক্লিক অ্যাসিড হল RNA। নিউক্লিক অ্যাসিড-এর পর ভাইরাস শ্রেণীবন্ধনের সময় বিশেষভাবে বিচার করা হয়। ক্যাপসিডের প্রতিসাম্য (symmetry), ভাইরাসের ক্যাপসিডে সাধারণতঃ দু রকম প্রতিসাম্য দেখা যায়। গোল বা আইকোসাহেড্রন ভাইরাসে ক্যাপসোমার সাজান থাকে ঘনকের মত করে (cubical symmetry) আর দণ্ডাকৃতি ভাইরাসে ক্যাপসোমার থাকে কতকটা দড়ির মত প্যাচানভাবে (helical symmetry)। বড় ব্যাকটিরিওফাজের 'মাথা'-র প্রতিসাম্য হয় ঘনকাকৃতির আর "লেজে"র প্রতিসাম্য হয় প্যাচান। এজন্য এদের বলা হয় দ্বি-প্রতিসাম্য মূলক ভাইরাস (bisymmetrical virus)। তবে অনেক ভাইরাস ঠিক কোন সিমেট্রির শ্রেণীতে ইপড়ে না। যেমন বসন্ত গোষ্ঠীর ভাইরাস। প্রতি সাম্যের পর গোল ভাইরাসদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিচার করা হয় ক্যাপসোমারের সংখ্যা। কারণ এসব ভাইরাসের ক্যাপসোমারের সংখ্যার উপর ওদের গঠনের জটিলতা নির্ভর করে। এছাড়া বিচার করে দেখা হয়, ভাইরাস কণিকাদের উপর কোন লিপিড আবরণ আছে কিনা। এভাবে বিচার করে ভাইরাসদের ৫-টি শ্রেণী (class), ৮-টি বর্গ (order) ও ২১-টি পরিবারে (family) বিভক্ত করা হয়েছে। এইসব পরিবারকে আবার ভাগ করা হয়েছে গণ (genus) ও প্রজাতিতে (species)। কিন্তু এই বিভাগ খুবই প্রাথমিক বিভাগ। বহু বিশেষজ্ঞ এই বিভাগ রীতির সঙ্গে মোটেই একমত নন। কারণ, বিভিন্ন ভাইরাসের মধ্যে কার সম্পর্ক, তাদের উদ্ভবের ইতিহাস (phylogeny), আমরা বিশেষভাবেই জানি না। কিন্তু উপরের ধারায় শ্রেণী বিভাগ, ভাইরাস নামকরণের আন্তর্জাতিক অস্থায়ী কমিটির স্বীকৃতি পেয়েছে। আমরা এই শ্রেণী-বন্ধনের সংক্ষিপ্তরূপ রেখা পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদান করছি :

ভাইরাস (ভাইরা)

ডিওকসি ভাইরা (D N A-ভাইরাস) — রাইবো ভাইরা (R N A-ভাইরাস)

শ্রেণী

| ডিওকসি হেলিকা (সিমেট্রি হেলিক্যাল) | ডিওকসি কিউবিকা (সিমেট্রি কিউবিক্যাল) | ডিওকসি বিমালা (সিমেট্রি দুরকম) | রাইবো কিউবিকা (সিমেট্রি কিউবিক্যাল) | রাইবো হেলিকা (সিমেট্রি হেলিক্যাল) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ডিওকসিহেলিকা শ্রেণীর দৃষ্টান্ত পতঙ্গ আক্রমণকারী কতগুলি ভাইরাস। ডিওকসি কিউবিকার একটি ভাল দৃষ্টান্ত হল মানুষের রোগ উৎপাদক অ্যাডিনোভাইরাস। আর ডিওকসিবাইনালার সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত হল $T_2$ ব্যাকটিরিওফাজ।

রাইবো কিউকা শ্রেণীতে পড়ে সাধারণ সর্দি'র ভাইরাস (Rhinovirus) এবং উদ্ভিদের রোগ উৎপাদক গোলাকৃতি ভাইরাসসমূহ। রাইবোহেলিকার সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত হল তামাক গাছের সাধারণ মোজেইক ভাইরাস (TMV)।*

## ভাইরয়েড

গোল আলু গাছের বিশেষ রোগ "পটাটো স্পিন্ডিল ব্লাইট" (Potato spindle blight) নামক রোগের কারণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ডিয়েনার (Theodor O. Diener) ভাইরয়েড (viroid) আবিষ্কার করেন (১৯৭১)। ভাইরয়েড-রা খুবই ছোট। এ পর্যন্ত যে-সব ভাইরাসের কথা জানা আছে, তাদের মধ্যে Q-বিটা (Q-bita) ভাইরাস সবচেয়ে ছোট। এরা হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে মাত্র ১০ লক্ষ গুণ ভারী। কিন্তু গোল আলু গাছের রোগ উৎপাদক ভাইরয়েড এর চাইতেও ছোট। এর ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ৫০ হাজার গুণ মাত্র। অর্থাৎ Q বিটা ভাইরাসের ২০ গুণ ছোট ভাইরয়েডদের আচরণ ভাইরাসের মত। কিন্তু এরা কেবলই R N A দ্বারা গঠিত। এদের কোন প্রোটিন

* Lowff. A. K. P. Turnier (1966) : The classification of viruses. Ann. Rev. Microbiol. 20, 45—74.



আবরণ থাকে না। এদের ভাব চলে ক্যাপসিডবিহীন (capsid) অতিক্ষুদ্র R N A ভাইরাস হিসাবে। নারকেল গাছের "কাডাঙ্গ কাডাঙ্গ" রোগ ও শসার বিবর্ণ ফল রোগ (Cucumber pale fruit) রোগও হয় ভাইরয়েড এর জন্য।*

## ভাইরাসদের উৎপত্তি সম্পর্কিত মত

ভাইরাসদের উদ্ভব সম্পর্কে তিনটি মত প্রচলিত আছে :

১। ভাইরাসদের উদ্ভব হয়েছে অতি আদিম জীবন্ত বস্তু থেকে। এইমত বিশেষভাবে প্রচার করেন হলডেন ও ওপারিন। এদের মতে ভাইরাস হল খুবই আদিম জীবন্ত বস্তু। পৃথিবীর বুকে এ রমক জীবন্ত বস্তুর আবির্ভাব হয় সর্বপ্রথমে। ভাইরাসরা প্রথমে পরজীবী ছিল না। পরে পরজীবীতে পরিণত হয়েছে।

২। ভাইরাসরা জটিল জীবাণু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই মত অনুসারে ভাইরাসদের ভাবা যায় এমন পরজীবী জীবাণু হিসাবে, যারা তাদের কোষের বিভিন্ন অংশ ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। কেবল পরজীবী হিসাবে বাঁচবার জন্য এসব জীবাণু তাদের দেহের অধিকাংশ অংশের আর প্রয়োজন করেনি। প্রাণীদের রোগ উৎপাদক অনেক ভাইরাস যথেষ্ট বড়। যেমন বসন্ত গোষ্ঠীর ভাইরাস। এদের তুলনা করা চলে প্রোটোজোয়া কোষের কোষ-কেন্দ্রের সঙ্গে। এইমত বিশেষভাবে প্রচার করেন লেডল (Laidlaw), বার্নেট (Burnet) প্রমুখ প্রাণী-রোগ উৎপাদক ভাইরাসের গবেষকবৃন্দ।

৩। অনেকের মতে ভাইরাস, বিশেষ করে গাছের রোগ উৎপাদক ভাইরাসদের উদ্ভব হয়েছে উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত কোন প্রকার কণিকা থেকে। এ-সব কণিকা কোষের মধ্যে অর্ধ স্বাধীনভাবে বিভক্ত হতে পারে। কিন্তু কোন কোষ থেকে যখন এরা বিযুক্ত হয়ে অন্য কোন কোষে যেতে আরম্ভ করে, অথবা তাদের আবরণ হয়ে ওঠে ভাইরাসের মত। স্মিথ (Smith), বাওডেন (Bawden) প্রমুখ উদ্ভিদ ভাইরাস নিয়ে গবেষণাকারী এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু উপরের তিনটি মতের কোনটি এখনও সাধারণভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। সম্ভবতঃ আমরা যাদের ভাইরাস বলি

* T. O. Diener (1979) : Viroid and Viroid Diseases. John Willey & Sons. Newyork.

banglainternet.com

তাদের সবার উদ্ভব একভাবে হয়নি। তাদের সবার উৎপত্তির ইতিহাস (phylogeny) এক নয়। খুব ছোট ভাইরাসরা উৎপন্ন হয়েছে একভাবে। বড় ভাইরাসরা উৎপন্ন হয়েছে আর একভাবে। উদ্ভিদ ভাইরাসরা, তাদের বংশ বিস্তার অথবা সংখ্যার বৃদ্ধি পাবার জন্য পোষক-কোষের উপর এত বেশি নির্ভর-শীল যে তাদের অতি আদিম প্রাণ-বস্তুর পরিচায়ক বলে মনে করা যায় না।* অন্যদিকে কিছু ভাইরোলজিস্ট মনে করেন, মৃতজীবী (saprophytic) ভাইরাসও আছে। আমরা তাদের কথা জানতে পারি না। কারণ, ভাইরাসদের কথা আমরা কেবলমাত্র জানতে পারি তাদের রোগ-উৎপাদন ক্ষমতার ফলে। মৃতজীবী ভাইরাসরা যেহেতু রোগের লক্ষণের মত কোন লক্ষণ সৃষ্টি করে না, তাই তারা থাকে আমাদের অজ্ঞাত। একজন রুশ বিশেষজ্ঞ বিশেষভাবে দাবী করেছেন মৃতজীবী ভাইরাসের কথা। তিনি মাটির মধ্যে এদের অস্তিত্বের কথা ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের ছবির সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।**

হলডেন-অপারিন তত্ত্ব অনুসারে, আদিম পৃথিবীর সমুদ্রে অজৈব বস্তু থেকে বিভিন্ন প্রকার জৈব বস্তুর উৎপত্তি হতে পেরেছিল। প্রথমে এইসব জৈব বস্তু বিশেষভাবে একত্রিত হয়ে উদ্ভব হয়েছিল খুব বড় এক ধরনের জৈব-অণু, যাদের তুলনা করা চলে ভাইরাসদের সঙ্গে। রুশ বায়োকেমিস্ট ওপারিন প্রথম প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রুশ-বিজ্ঞানীরা প্রধানত ওপারিনের দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই অধিক প্রভাবিত। তারা ভাইরাসকে খুব আদিম প্রাণবস্তু হিসাবে প্রমাণ করতে চান।

উপরের তিনটি মতই খুব বেশী দূর-কল্পনা-মূলক (speculative)। তবে ক্লোরোপ্লাস্টের সঙ্গে উদ্ভিদ রোগ উৎপাদক ভাইরাসদের সম্পর্ক থেকে মনে হয়, এসব ভাইরাস সম্ভবতঃ এক সময় ছিল কোন উদ্ভিদ কোষেরই অংশ। পরে কোনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাইরাসে পরিণত হয়েছে।

* F. C. Bawden (1964) : "Plant Viruses and Virus Diseases." PP. 313–316, The Roland Press Co. Newyork.

** A. E. Protsenko (1966) : The Origin of Phytopathogenic Viruses in, Viruses of Plants. PP. 313–316.

banglainternet.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

# সংক্রামক ব্যাধি

## রোগ জীবাণু মতবাদ

সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রবার্ট বয়েল (R. Boyle) গণনা করেন, যদি পচন ক্রিয়ার কারণ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, তবে ছোঁয়াচে রোগ কি কারণে হয়, তাও বোঝা সম্ভব হবে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর (১৮২২—১৮৯৫) প্রথম পচন ক্রিয়ার যথার্থ ব্যাখ্যা দেন। তিনি প্রমাণ করেন, বস্তু পচে আণুবীক্ষণিক জীবাণুদের কার্যের ফলে। তিনি আরো প্রমাণ করেন, কেবল জীবাণু থেকেই জীবাণুদের উদ্ভব ঘটে। পচা জিনিসের মধ্যে জীবাণুরা আপনা থেকেই গজায় না, জীবানুরাই জৈববস্তু পচনের কারণ। জীবাণুরা আছে সর্বত্র। বাতাসে, পানিতে, মাটিতে। সেখান থেকে তারা সমস্ত জৈব বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। বাতাসে ভাসমান এক প্রকার জীবাণু যখন ফলের রসে যেয়ে যুক্ত হয়, তখন তা পচে অ্যালকোহলে পরিণত হয়। পাস্তুর প্রথম প্রমাণ করতে চান, ফলের রস থেকে আলকোহল উৎপাদিত হয় এককোষী উদ্ভিদ ইস্ট–এর জন্য (ফরাসী ভাষায় লেভুর)। পাস্তুর প্রথম বোঝাতে চান, মানুষের ছোঁয়াচে রোগের কারণ জীবাণু (microbe)। কিন্তু রোগ জীবাণু মতবাদ বিশেষভাবে প্রমাণ করে দেখান জার্মান জীবাণু তত্ত্ববিদ রবার্ট কক্‌-(১৮৪৩—১৯১০)। তিনি যেভাবে বিষয়টি প্রমাণ করে দেখান, তা আজো কক্‌-এর স্বীকার্য (Koch's postulate) হিসাবে বিখ্যাত হয়ে আছে। কক্‌ এর প্রথম স্বীকার্য হল, কোন জীবাণুকে কোন রোগের কারণ হিসাবে গণ্য করতে হলে প্রথমে দেখাতে হবে, রোগ জীবাণুটি সব সময় রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ও প্রাণীর শরীরে থাকে। যদি এরকম দেখা যায়, তবে জীবাণুটিকে পৃথক করে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে চাষ করবার চেষ্টা করতে হবে। সেখান থেকে জীবাণুটি সুস্থ ব্যক্তি বা প্রাণী দেহে অনুপ্রবিষ্ট করে দেখতে হবে প্রাণী বা ব্যক্তি রোগক্রান্ত হচ্ছে কিনা। যদি হয়, তবে তার দেহ থেকে রোগ জীবাণুটি আলাদা করে দেখতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, যে জীবাণু রোগীর দেহে রোগ হবার আগে যোগ করা হয়েছিল, তার সঙ্গে পরের প্রাপ্ত জীবাণুর কোন পার্থক্য নাই। কক্‌ গরুর অ্যানথ্রাক্স (anthrax) রোগ নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন। তিনি গরুর রক্ত থেকে অ্যানথ্রাক্স রোগের ব্যাকটিরিয়া (Bacillus anthreis) পৃথক করে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে

আবাদ (culture) করেন। সেখান থেকে অ্যানথ্রাক্স ব্যাকটিরিয়াম সুস্থ গরুর রক্তে ইনজেক্ট করেন। গরু রোগাক্রান্ত হবার পর, তার রক্ত থেকে অ্যানথ্রাক্স ব্যাকটিরিয়া পৃথক করে দেখান। অ্যানথ্রাক্স কেবল গরুর হয় না। মানুষেরও হতে পারে। এ থেকেই প্রথম প্রমাণিত হল, অনেক রোগ হতে পারে জীবাণু-জনিত কারণে। কক্ পরে প্রমাণ করেন, কলেরা রোগ হয় কলেরা জীবাণুর জন্য। এই রোগ ছড়ায় প্রধানত পানি, খাদ্য বস্তুর মাধ্যমে। তাই এই রোগ নিবারণ করতে হলে পানি বিশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখতে হবে। পাস্তুর ও ককের ধারণা সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানেই যুগান্তর আসে। ককের আবিষ্কারের মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া-জনিত সংক্রামক রোগের ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কৃত হয়।

## মানুষের কতকগুলি জীবাণুজনিত রোগ

জীবাণুতত্ত্বের একটা বিরাট অংশই গড়ে উঠেছে রোগজীবাণু নিয়ে গবেষণার ফলে। জীবাণুদের কথা সাধারণ মানুষের কাছে এসে পৌঁছায় প্রধানত তার নিজের রোগকে কেন্দ্র করে। তাই জীবাণুতত্ত্ব বলতে সাধারণভাবে মনে আসে চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা। কিন্তু খুব কম সংখ্যক জীবাণুই আসলে মানুষের রোগ উৎপাদন করে। অধিকাংশ জীবাণুই মানুষের রোগ উৎপাদন করে না। আমরা এখানে মানুষের কয়েকটি ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগ নিয়ে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করছি। এই রোগগুলি নানা সময়ে মানুষের ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতিকর রূপ ধারণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে, একটা জাতির ইতিহাসের ধারা।

১। **প্লেগ (Plague)**: প্লেগের কারণ হল ব্যাকটিরিয়া, পাসতুরেলা পেসটিস (Pasteurella pestis)। এরা দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া। লম্বায় ১ মাইক্রোমিটার আর চওড়ায় ২ মাইক্রোমিটার। প্রত্যেকটি ব্যাকটিরিয়া কোষ পৃথক পৃথকভাবে থাকে। গ্রাম-নেগেটিভ। মানুষ ও ইঁদুরের রোগ উৎপাদন করে। ইঁদুর থেকে মানুষের শরীরে আসে প্রধানতঃ এক প্রকার পতঙ্গের (Xenopsylla cheopsis) মাধ্যমে ছড়ায়। এরা রোগগ্রস্ত ইঁদুরের রক্ত খাবার পর যখন মানুষকে কামড়ায়, তখন প্লেগের জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। প্লেগ এখন আগের মত আর মহামারী আকারে হয় না। কিন্তু এক সময় বিরাট মহামারী আকারে হত। ১৩৪৮ ও ১৬৬৮ সালে ইউরোপে প্লেগে বহু লক্ষ লোক মারা যায়, বিশেষ করে বিলাতে। বিলাতের ইতিহাসে এই

banglainternet.com



মড়ক 'ব্ল্যাক ডেথ' হিসাবে খ্যাত হয়ে আছে। এই রোগে ১৩৪৮—৫০ মধ্যে তখনকার ইউরোপের এক-চতুর্থাংশ লোক মারা যায়। ১৬৬৫ সালে প্লেগে লণ্ডন শহরে দশ ভাগের এক ভাগ লোক মারা যায়। এর ফলে বিলাতে শ্রমিকের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পায় ও মজুরীর হার বৃদ্ধি পায়। বিলাতে বিশেষ আইন পাশ করা হয় যে, একবার কাজে যোগ দিলে কেউ কাজ ছাড়তে পারবে না এবং মজুরীও বেশী দাবী করতে পারবে না। এর ফলে বিলাতে দেখা দেয় কৃষক বিদ্রোহ।

১৮৯৬ সালে প্লেগ রোগ এই উপমহাদেশে মহামারীর আকারে দেখা দেয়। একটা হিসাব অনুসারে ১৮৯৮ সালের মধ্যে এই রোগে এই উপমহাদেশে মারা যায় প্রায় ১ কোটির মত লোক।

২। **কলেরা**: কলেরার জন্মভূমি বাংলাদেশ ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল। এখান থেকে তা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে বিরাট মৃত্যু ঘটিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ১৮১৭ সালে কলেরা জাপানে গিয়ে অনেক লোকের মৃত্যু ঘটায়। সেখান থেকে তা সংক্রমিত হয় রাশিয়ায় এবং পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে। ১৮৯২ সালে কলেরায় জার্মানির হামবুর্গ শহরে ১৭০০০ লোক কলেরা আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে মারা যায় অর্ধেকের বেশী লোক। কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন জার্মান জীবাণুবিদ রবার্ট কক্ ১৮৮৩ সালে। তিনি দেখান ব্যাকটিরিয়া ভিবরিও কমা (Vibrio comma; ককের দেওয়া নাম Spirillum cholerae) কলেরা রোগের কারণ। রোগীর মল দ্বারা দূষিত পানির মাধ্যমে প্রধানতঃ এই রোগ মহামারীর আকারে ছড়ায়। অনেক লোক আছে যারা কলেরা জীবাণু বহন করে। কিন্তু যাদের কলেরা হয় না, এদের মলের মারফতও কলেরা জীবাণু ছড়াতে পারে। ইউরোপে এখন কলেরা অতীত কালের স্মৃতি। কারণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও খাদ্য প্রস্তুতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ সেখানে আর এই রোগ ছড়াতে দেয় না।

৩। **সিফিলিস (Syphilis)**: এই রোগের কারণ, একরকম স্পাইরোকিট। শোনা যায় কলম্বাসের নাবিকরা প্রথম হাইতে দ্বীপ থেকে এই রোগের জীবাণু নিয়ে আসে ইউরোপে এবং স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপে ও পরে এশিয়ায়। যত রোগ আছে সিফিলিস তার মধ্যে অন্যতম মারাত্মক রোগ। এই রোগের জীবাণু ট্রেপনিমা প্যালিডাম (Treponema pallidum) রোগগ্রস্ত মানুষের দেহ থেকে নীরোগ দেহে যৌন মিলনের সময়

যেয়ে পেঁছায়। যৌন মিলন এবং রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে চুম্বন ছাড়া এই রোগ অন্য আর কোন উপায়ে সচারচর ছড়াতে পারে না।

(৪) **কুষ্ঠ** (Leprosy) এক সময় মানুষ মনে করত, কুষ্ঠ হয় পাপের ফলে। কুষ্ঠ হল বিধাতার প্রদত্ত শাস্তি। কিন্তু কুষ্ঠ একটি জীবাণুজনিত রোগ। রোগটি হয় মাইক্রোব্যাকটিরিয়ার লেপরি ( Mycobacterium leprae ) নামক ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে। যক্ষ্মা রোগের ব্যাকটিরিয়াম-এর সঙ্গে এর মিল আছে নানাদিক থেকে। এই ব্যাকটিরিয়াম অ্যাসিড ফাস্ট। অর্থাৎ এর দেহে কারবল ফুকসিস (carbol fuchsin) রং লাগিয়ে শতকরা ২৫ ভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড ($H_2SO_4$) দিয়ে ধুলে তা চলে যায় না। এরা কেবলমাত্র মানুষের দেহেই বেঁচে থাকতে পারে। এদের এখনও কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে চাষ করা যায়নি। কুষ্ঠরোগকে আগে যত ছোয়াচে বলে মনে করা হত, আসলে এই রোগ তেমন ছোয়াচে নয়। কুষ্টরোগীর স্ত্রীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৫ জনের এ রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। এ রোগে মানুষ মারা যায় না কিন্তু বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। কিছুদিন আগের একটি হিসাব অনুসারে পৃথিবীতে প্রায় দেড় কোটির মত লোক এই রোগে ভুগছে। এই রোগের এখন ভাল চিকিৎসা বের হয়েছে। কিন্তু যেসব দেশে এই রোগের প্রকোপ বেশী, সেসব দেশের মানুষ পারছে না চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে। তা ছাড়া রোগটার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণাও মানুষের মনে থেকে গিয়েছে।

(৫) **টিউবারকুলোসিস** ( Tuberculosis ) টিউবারকুলসিস হয় মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকুলোসিস ( mycobacterium tuberculosis ) নামক ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে। এই ব্যাকটিরিয়া দেহের নানা স্থানকে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু যখন ফুসফুস (lung) আক্রমণ করে তখন তাকে বলা হয় যক্ষ্মা (phthisis)। টিউবারকুলোসিস ব্যাকটিরিয়া মানুষ, গরু ও পাখিকে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু পাখিতে এই ব্যাকটিরিয়ার যে কুল (strain) হয়, মানুষের তা রোগ উৎপাদন করতে পারে না। অর্থাৎ পাখিদের থেকে মানুষের দেহে এই রোগজীবাণু আসতে পারে না। কিন্তু গরুর থেকে মানুষের দেহে এসে রোগ উৎপাদন করতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের। গরুর থেকে আগত টিউবারকুলোসিস ব্যাকটিরিয়া শিশুদের গ্ল্যান্ড আক্রমণ করে রোগ উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু মানুষের শতকরা ৯৯ ভাগ যক্ষ্মার কারণ হল মানুষের দেহে সাধারণভাবে যে যক্ষ্মার জীবাণু হতে পারে তাই। যে টিউবারকুলোসিস অন্যত্র হয়, ফুসফুসে

banglainternet.com



হয় না তার শতকরা ৭৫ ভাগ হয় মানুষের টিউবারকুলোসিস জীবাণু থেকেই। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ টিউবারকুলোসিস আসতে পারে গরু থেকে।

আগে যক্ষ্মাকে বলা হত রাজরোগ। হলে, মানুষ কষ্ট পেয়ে মরত। কিন্তু এখন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হবার পর থেকে রোগটার প্রকোপ অনেক কমে গিয়েছে।

টিউবারকুলসিস রোগজীবাণু পৃথিবীতে বহুকাল আগে থেকেই আছে। বার-তের কোটি বছর আগে ফসিল হয়ে যাওয়া ডাইনোসরের (dinosaur) হাড়ের মধ্যেও বোন-টিবি হবার লক্ষণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

(৬) **ডিপথেরিয়া** (Diptheria) ঃ আগে রোগটা শিশুদের জন্য ছিল খুবই মারাত্মক। এই রোগ হলে মৃত্যু ছিল প্রায় অবধারিত। পরে এর চিকিৎসা বের হয়। কিন্তু বর্তমানে রোগটা টিকা দেবার ফলে অনেক উন্নত দেশেই বিরল হয়ে পড়েছে, কিন্তু অনুন্নত দেশে এ রোগ এখনও ব্যাপক। আর চিকিৎসার অভাবে মারা পড়ে অনেক শিশু। ডিপথেরিয়া করেনি ব্যাকটি-রিয়াম ডিপথেরি (Coryne beacterium diptheriae) নামক ব্যাকটিরিয়া-এর আক্রমণে হয়। এরা দণ্ডাকৃতির ব্যাকটিরিয়া। লম্বায় ৮ মাইক্রোমিটারের কাছাকাছি হতে পারে। গ্রাম-পজেটিভ। তবে খুব জোরালভাবে নয়।

(৭) **টাইফয়েড** (Typhoid fever) ঃ এক সময় এ রোগেও বহুলোক মারা যেত। কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক বের হবার পর থেকে এ রোগের জন্য মৃত্যুর হার কমে গিয়েছে। টাইফয়েড হয় সালমোনিলা টাইফি (Salmonilla typhi) নামক দণ্ডাকৃতি গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে। এ রোগের বিস্তার ঘটে প্রধানতঃ জীবাণুযুক্ত পানির মাধ্যমে। বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ তাই উন্নত দেশসমূহে এই রোগের মাত্রা বিশেষভাবে কমিয়ে দিয়েছে।

(৮) **ধনুষ্টঙ্কার** (Tetanus) ঃ এ রোগ ক্ষতের মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। এই রোগের কারণ হল ক্লসট্রিডিয়াম টিটেনি (Clostridium tetani) নামক দণ্ডাকৃতি গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়ার জন্য। এরা স্পোর উৎপাদন করতে পারে। স্পোর এক মাথায় থাকে এবং মাথাটা তখন ফুলে ওঠে। এই ব্যাকটিরিয়া একান্তভাবেই অবায়ুজীবী (stricly anaerobic)। বাতাসের মুক্ত অক্সিজেনে বৃদ্ধি পেতে পারে না। তাই ক্ষত গভীর না হলে এই রোগের জীবাণু তার মধ্যে বৃদ্ধি পেতে পারে না। এই ব্যাকটিরিয়া একরকম বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে। যা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর কাজ করে অবশ করে দেয়।

এখন এ রোগের চিকিৎসা আছে। কিন্তু আগে ছিল না বলে বহুলোক মারা যেত। বিশেষকরে যুদ্ধের সময়। এই রোগজীবাণু মাটিতে থাকে। সেখান থেকে দেহে ক্ষতের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে। আগেকার দিনে যুদ্ধে ঘোড়া বিশেষ ভূমিকা পালন করত। ঘোড়ার গোবরে এই রোগজীবাণু খুব বেশী থাকে। কারণ, এই রোগজীবাণু ঘোড়ার ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঘোড়ার গোবর থেকে এই রোগজীবাণু সহজেই মানুষের শরীরে যেতে পারে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ পর্যন্ত ধনুষ্টংকার ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের খুবই ক্ষতিকর রোগ। আমাদের দেশে গ্রামে বাচ্চাদের নাড়ী কাটবার সময় অনেকসময় টিটেনাস জীবাণু ক্ষতে প্রবিষ্ট হয়ে শিশুর রোগ ও মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু গ্রামদেশে অজ্ঞতা-বশতঃ একে বলে প্যাঁচায় ধরা।

রোগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বহু জীবাণুজনিত রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলবার সময়। যুদ্ধের সময় বা তার পরে অনেক রোগকেই মহামারীর আকার ধারণ করতে দেখা যায়। কারণ এসময় জীবাণু বিস্তার লাভ করতে পারে সহজে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এক বিশেষ ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে এবং অন্যত্র। এতে যুদ্ধে যত লোক মারা যায়, তার চাইতে এ রোগে মারা যায় অনেক বেশি।

জীবাণু সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থার অভাবে প্রতিবছর মারা যাচ্ছে অনেকে। মারা যাচ্ছে অনেকে অর্থাভাবে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে না পারবার ফলে। চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে না পারার আর একটা কারণ হল রোগ সম্পর্কে মানুষের সাধারণ অজ্ঞতা। সচেতনার অভাব।

## জীবাণুযুদ্ধ

যুদ্ধ মানব ইতিহাসের একটা অতি আদিম ঘটনা। শত্রুকে পরাভূত করে বিজয়ী হবার ইচ্ছা মানুষের সনাতন। এখন অনেক দেশে গবেষণা চলেছে, রোগজীবাণুকে যুদ্ধের কাজে লাগাবার সম্ভাব্যতা নিয়ে। জীবাণুযুদ্ধের একটা যুক্তি হল, এতে যত লোক মারা যাবে, তার চেয়ে অসুস্থ হয়ে কষ্ট পাবে অনেকে। থাকবে না শত্রু পক্ষের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা। শত্রু সৈন্যের অসুস্থতা, তাদের যুদ্ধে অক্ষম করে তুলবে। জীবাণু প্রয়োগ করে যদি গৃহ-পালিত জন্তু ও ফসলের ক্ষতি করা যায়, তবে তার ফলে ঘাটতি দেখা দেবে খাদ্য



সরবরাহে। খাদ্যাভাবে শত্রু পক্ষ পারবে না যুদ্ধক্ষম থাকতে। জীবাণুযুদ্ধের খরচ ও ক্ষয়ক্ষতি হবে পরমাণুযুদ্ধের চাইতে অনেক কম। এতে ভাঙবে না ঘরবাড়ী, নষ্ট হবে না কলকারখানা। এ সবই অক্ষত অবস্থায় দখল করা সম্ভবপর হবে। যদি এমন জীবাণু আবিষ্কার করা যায়, যাতে শত্রুরা মরবে না, কেবল অসুস্থ হয়ে পড়বে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, তবে জীবাণুযুদ্ধ হবে অন্য যুদ্ধের চাইতে অনেক মানবিক। কিন্তু জীবাণুযুদ্ধের বড় সমস্যা হল জীবাণুর প্রয়োগ কৌশল সমস্যা। যে জীবাণু শত্রুর রোগ উৎপাদনে সক্ষম, তা ছড়িয়ে পড়তে পারে নিজেদেরও মধ্যে। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবাণু প্রয়োগ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। শত্রুর ক্ষতি করতে যেয়ে নিজেদেরও হতে পারে প্রচণ্ড ক্ষতি।

## ২। গৃহপালিত পশু-পাখির রোগ

জীবাণুজনিত কারণে বন্য পশু-পাখিদেরও অনেক রকম রোগ হয়। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা তার খোঁজ রাখি না। তবে সাধারণতঃ বন্য-পাখির চাইতে গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে অনেক রোগের প্রকোপ খুব বেশি হতে দেখা যায়। এর একটা বড় কারণ, গৃহপালিত পশু-পাখি এক জায়গায় অনেকে একত্রে থাকে। ফলে রোগাক্রান্ত প্রাণী থেকে সংক্রামক ব্যাধি সহজেই সুস্থ প্রাণীতে যেতে পারে। তাছাড়া বন্য প্রাণীরা বাস করে খোলামেলা জায়গায়। উপযুক্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থার (Ventilation) অভাবে পশু-পাখিদের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধী শক্তি অনেক ক্ষেত্রেই কমে যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে দুর্বল প্রাণীরা বাঁচে না। সবলরাই বাঁচে। তাই বন্য প্রাণীদের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বা-চনের (Natural selection) ফলে গড়ে উঠতে পারে কোন প্রাণীর শক্ত রোগ প্রতিরোধী ধারা। কিন্তু মানুষের যত্নে প্রতিপালিত পশু-পাখিদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটতে পারে না।

### হাঁস-মুরগির রোগ

গৃহপালিত হাঁস-মুরগির একটি বিশেষ রোগ হল কলেরা। এই রোগে মুর-গির ভয়ংকর ক্ষতি হয়। মড়কে অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ৮০/৯০ ভাগের মৃত্যু হতে পারে। এই রোগ পাস্তুরিলা মালতোসিদা (Pastuerilla multo-cida) নামক এক প্রকার হ্রস্ব দণ্ডাকৃতি গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার আক্র-মণে হয়। আক্রান্ত মোরগ-মুরগী কিছু খেতে চায় না। হঠাৎ অনেকে মারা

banglainternet.com

খেতে থাকে। মোরগ-মুরগির পায়খানার রঙ হয় সবুজ-হরিদ্রাভ বর্ণের। এই রোগের প্রতিষেধক টিকা আছে। যথাসময়ে টিকা প্রদান করে এই রোগের হাত থেকে হাঁস-মুরগিকে রক্ষা করা যায়। রোগাক্রান্ত মুরগিকে অ্যান্টি-বায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করা যায়। কিন্তু এরকম চিকিৎসা ব্যয়বহুল। হাঁস-মুরগির কলেরা আমাদের দেশে হাঁস-মুরগি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অনেক এলাকায় অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায় খুবই অন্তরায়।

মোরগ-মুরগীর অনেক সময় স্যালমোনেলা পুলোরাম (Salmonella pullorum) নামক ব্যাকটিরিয়াম-এর আক্রমণে এক ধরনের পেটের পীড়া হয়। এই রোগ হলে পায়খানার রঙ সাদা-চুনের মত হয়। একারণে ইংরাজিতে এই রোগকে বলে "হোয়াইট ডাইরিয়া"। মুরগির দেহ থেকে এই জীবাণু ডিমের মাধ্যমে বাচ্চা মোরগ-মুরগীর দেহে সংক্রামিত হয়। এই রোগে বাচ্চা মরতে থাকলে, রোগগ্রস্ত মুরগি বেছে খেয়ে ফেলা ভাল। এই রোগজীবাণু টাইফয়েড রোগজীবাণুর মত। তবে মানুষের কোন রোগ উৎপাদন করে না। কোন্ মুরগির এই রোগ আছে, তা বেছে বের করা সহজ। রক্ত পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ে।

আমাদের দেশে মুরগির একটি খুব মারাত্মক রোগ হল রানীক্ষেত। এই রোগ উত্তর ভারতের রানীক্ষেত নামক স্থানে (কুমায়ুন) প্রথম ধরা পড়ে বলে এই উপমহাদেশে রোগটি রানীক্ষেত নামেই খ্যাত। এই রোগের কারণ এক প্রকার বড় গোলাকৃতি R N A ভাইরাস। এই রোগ মোরগ-মুরগীর জন্য খুবই ক্ষতিকর। রোগ হলে অধিকাংশ মোরগ-মুরগীই মারা যায়। রোগটি ভয়ংকর রকমের সংক্রামক।* তবে এই রোগের ভাল টিকা আছে। এই রোগের কিছু লক্ষণ সাদা-কলেরার মতন। যেমন সাদা চুনের মত পায়খানা। রানী-খেত রোগের টিকা দেওয়া সত্ত্বেও যদি কোন মুরগির সাদা চুনের মত পায়-খানা ঘন ঘন হয়, তবে বুঝতে হবে তার রানীখেত রোগ হয়নি। রানীখেত রোগ হলে মুরগি খুব ঝিমাতে থাকে।

প্রোটোজোয়ার আক্রমণে মোরগ-মুরগীর কক্সিডিওসিস (coccidiosis) নামক রোগ হয়। এই প্রোটোজোয়া কতকটা ম্যালেরিয়া রোগের প্রোটোজোয়ার

* রানীখেত রোগের ইংরেজী নাম Newcastle Disease. কারণ Newcastle এই রোগ বিলাতে প্রথম ধরা পড়ে। সংক্ষেপে এই ভাইরাসকে বলে NDV ভাইরাস। এর উপর লিপো-প্রোটিন আবরণ থাকে। প্যারামিকসো ভাইরাস দলভুক্ত (Para nuyxo virus group)।

banglainternet.com



মত। এই প্রোটোজোয়ার আক্রমণে অনেক মোরগ-মুরগী মারা যেতে পারে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এই রোগ নিবারণের বিশেষ উপায়। অনেক সময় সালফোনামাইড গোষ্ঠীর ঔষধে ভাল কাজ দেয়।

## গবাদি পশুর ব্যাধি

ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে গবাদি-পশুর যে সমস্ত রোগ হয় তার মধ্যে গলাফুলো (Haemorrhagic septicaemia), বাদলা (Black quater) ও তড়কা (Anthrax) প্রধান। আমাদের দেশে গবাদি-পশুর (cattle) ক্ষেত্রে এই তিনটি রোগ যথেষ্ট হতে দেখা যায়।

**গলাফুলা :** এই রোগের কারণ পাস্তুরিলা মালতোসিদা ( Pasteurilla multocida) নামক ব্যাকটিরিয়াম। হাঁস-মুরগি, মহিষ, ছাগল ভেড়া ঘোড়া ইত্যাদিকে আক্রমণ করে। গলাফুলা রোগে প্রথমে প্রবল জ্বর হয় ও পরে গলদেশ ফুলে যায়। ফলে গরু কিছু খেতে পারে না; খেলেও জাবর কাটে না। বাছুর এই রোগের আক্রমণে সহজেই মারা যায়। অ্যান্টিবায়োটিক, স্ট্রেপটো-মাইসিন ইনজেকশন করলে এই রোগ সারে। তবে চিকিৎসা প্রথমাবস্থাতেই হওয়া প্রয়োজন। অন্য প্রাণী, যেমন খরগোসের এই রোগ হলে ডিহাইড্রো স্ট্রেপটোমাইসিন প্রয়োগ করতে হয়। এই রোগের প্রতিষেধক টিকা আছে। আমাদের দেশে গরুর চাইতে মহিষ গলাফুলা রোগে অধিক আক্রান্ত হয়।

**বাদলা :** বাদলা রোগ হয় ক্লসট্রিডিয়াম সোভই (Closteridium chauvoei) দণ্ডাকৃতি, স্পোর-উৎপাদক গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়াম-এর আক্রমণে। এই ব্যাকটিরিয়া অবায়ুজীবী (anaerobic)। কেবল গরু নয়, এই রোগ মহিষ, ভেড়া, হরিণ, উট প্রভৃতি প্রাণীরও হয়। আক্রান্ত প্রাণীর প্রবল জ্বর হয়। আক্রান্ত প্রাণীর পা ফুলে যায় ও খুঁড়িয়ে চলে। সাধারণতঃ পিছনের পা এভাবে ফুলে যায়। উপযুক্ত সময়ে পেনিসিলিন ইনজেকশন দিলে রোগ সারে। এ রোগেরও প্রতিষেধক টিকা আছে।

**তড়কা :** ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস (Bacillus anthracis) নামক দণ্ডাকৃতি, স্পোর উৎপাদক গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়াম-এর আক্রমণে এই রোগ হয় এই রোগ ভেড়া, ছাগল, মহিষ এবং ঘোড়ার হয়। এসব বস্তু থেকে এই রোগ মানুষেরও হতে পারে। এই রোগজীবাণুর স্পোর পশু চর্মের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে এবং এরকম চর্মের জুতা থেকেও রোগ মানুষে সংক্রমিত

হতে পারে। গরু এই রোগে আক্রান্ত হলে অল্প সময়েই মারা যায়। যেসব ক্ষেত্রে গরু আক্রান্ত হবার পর অধিকক্ষণ বাঁচে সেখানে প্রথমত প্রবল জ্বর হতে দেখা যায়। পাতলা রক্ত মিশ্রিত পায়খানা ঘন ঘন হতে থাকে। পরে গরু অচৈতন্য হয়ে মরে যায়। ঠিক সময় অ্যান্টিবায়োটিক (বেনজাইল পেনিসিলিন) প্রয়োগ করলে এই রোগ সারে। এই রোগের প্রতিষেধক টিকা আছে।

তড়কা খুবই মারাত্মক রোগ। তড়কা রোগে কোন গরু, বাছুর অথবা অন্য প্রাণী মারা গেলে তাকে মাটিতে গর্ত করে পুতে ফেলা অথবা পুড়িয়ে ফেলা উচিত। মাটিতে পুতবার সময় প্রথমে কিছু চুন দিয়ে তার উপর মৃত পশুটিকে রেখে আবার কিছু চুন দিয়ে মাটি চাপা দিতে হয়। যেহেতু তড়কা রোগের জীবাণু বাতাসের সংস্পর্শে এলে স্পোর উৎপাদন করে এবং স্পোর হিসাবে বহুদিন বেঁচে থাকতে পারে তাই স্পোর যাতে না হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। তড়কা রোগে মারা যাওয়া প্রাণীকে কখনই কেটে দেখা উচিত নয়। কারণ, তাহলে বাতাসের স্পর্শে স্পোর বেশি হবার সম্ভাবনা থাকে। কোন পশু তড়কা রোগে মারা গিয়েছে কিনা, তা বোঝা যায় শিরা থেকে সামান্য কিছু রক্ত নিয়ে মাইক্রোসকোপে পরীক্ষা করলে।

**রিণ্ডার পোস্ট :** গরুর ক্ষেত্রে ভাইরাসজনিত রোগের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগ হল রিণ্ডারপোস্ট। এই রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়ে কখনও কখনও অনেক গবাদি-পশুর মৃত্যু ঘটায়। এক রকম দণ্ডাকৃতি RNA ভাইরাসের আক্রমণে এই রোগ হয়। এই রোগ গরু ছাড়াও অন্য প্রাণীর হতে পারে। ছাগল, ভেড়া, মহিষেরও এই রোগ হয়। বন্য অনেক জন্তুরও এই রোগ হতে পারে। এই রোগের ভাইরাস মুখের লালা, নাকের শিকনি, চোখের পিচুটি ও মলমূত্রের মাধ্যমে ছড়ায়। আক্রান্ত পশুর জ্বর হয় ও পরে পাতলা পায়খানা হতে শুরু করে। আক্রান্ত পশু মারা যায়। এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। কেবল প্রতিষেধক টিকা আছে। ব্যাপকহারে টিকা প্রদান করে এই রোগের প্রাদুর্ভাব এখন কমান সম্ভবপর হয়েছে।

**পশু-পাখির সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের সাধারণ উপায়**

গৃহপালিত পশু-পাখির চিকিৎসা ব্যয়বহুল। রোগ যেহেতু আক্রান্ত প্রাণী থেকে সুস্থ প্রাণীতে সংক্রমিত হতে পারে, তাই অনেকক্ষেত্রে রোগগ্রস্থ প্রাণীকে মেরে ফেলে মাটিতে পুতে ফেলা অথবা পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

banglainternet.com



অনেক দেশে সরকার থেকে রোগগ্রস্থ পশু-পাখি কিনে নিয়ে মেরে ফেলা হয়। কারণ এর ফলে কোন অঞ্চলে পশু-পাখির রোগ যে পরিমাণে অর্থনৈতিক ক্ষতি করতে পারে তার চাইতে অনেক কম খরচ পড়ে। যেসব রোগের ক্ষেত্রে টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে যথাসময়ে টীকা প্রদানই পশু-পাখির রোগ নিবারণের সবচেয়ে উত্তম পন্থা।

মানুষের রোগ নিয়ে গবেষণার আগে পাস্তুর প্রাণীদের একাধিক জীবাণু-জনিত রোগ নিয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান করে নানাভাবে কাজে আসে মানুষের রোগ নিবারণে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাস্তুর আবিষ্কার করেন, জীবাণুদের দুর্বল করে তার সাহায্যে প্রতিষেধক টিকাদান পদ্ধতি। তিনি গবেষণা করছিলেন মুরগির কলেরা রোগের জীবাণু নিয়ে। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কোন কর্মচারীর কাজের গাফিলতিতে এই রোগজীবাণুর (Pasteurella multocida) কিছু আবাদ (culture) বারবার আবাদ (sub culture) করা হয় না। ফলে আবাদটি যথেষ্ট নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এই পুরান নিস্তেজ আবাদ থেকে জীবাণু নিয়ে পাস্তুর যখন মুরগির দেহে প্রয়োগ করেন, তখন দেখেন যে ঐ পুরান নিস্তেজ জীবাণু মুরগির কলেরা রোগ উৎপাদন করতে পারছে না। কিন্তু পরে তিনি যখন ঐ সব মুরগির দেহে সবল রোগ জীবাণু প্রয়োগ করলেন, তখনও দেখতে পেলেন রোগ হচ্ছে না। এ থেকে তিনি পান রোগজীবাণুকে দুর্বল করে (attenuated) করে পশু-পাখিদের টিকা প্রদানের ধারণা। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই তিনি আবিষ্কার করেন উত্তাপের (৪২ ডিগ্রি সেঃ) অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) রোগের জীবাণুকে দুর্বল করে ঐ রোগের টিকাদান ব্যবস্থা। পরে জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস (rabies)-কে শুকিয়ে অথবা ফিনলের সাহায্যে দুর্বল করে আবিষ্কার করেন জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা। কুকুর খেপে যাবার কারণ হল এক রকম (RNA) ভাইরাস। যাকে বলা হয় র‍্যাবিজ। খেপা কুকুর মানুষকে কামড়ালে মানুষের দেহে এই র‍্যাবিজ ভাইরাস সংক্রামিত হয়। মানুষ জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই রোগ মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীকে আক্রমণ করে। এই রোগের আগে কোন চিকিৎসাই ছিলো না। মৃত্যু ছিল অবধারিত। পাস্তুর এর চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবন করে মানুষের প্রভূত কল্যাণ করেন।*

* এখানে কিছুটা অবান্তর হলেও একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমার বাড়ির কাছের একটি ছেলেকে খেপাকুকুরে কামড়ায়। ছেলেটির বাবাকে কেউ বলেন,

## ফসলের রোগ

ছত্রাক ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসজনিত কারণে উদ্ভিদের অনেক প্রকার রোগ হয়। ব রোগের ফলে অনেকসময় কৃষি উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পেয়ে থাকে। একটা দেশে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে।

**ছত্রাকজনিত রোগ :** উদ্ভিদরোগের ক্ষেত্রে ব্যাকটিরিয়া অপেক্ষা ছত্রাক অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এসব ছত্রাক গাছের উপর পরজীবী হিসাবে বসবাস করে। অর্থাৎ গাছ থেকে এরা খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে বাঁচে। নানা কারণে পরজীবী ছত্রাকের (parasitic fungi) আক্রমণে গাছ রোগাক্রান্ত হয়। ছত্রাকরা গাছ থেকে যে পরিমাণ খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে, সাধারণতঃ তাতে গাছের খুব ক্ষতি হয় না। কিন্তু ছত্রাকরা যে এনজাইম উৎপন্ন করে তার প্রভাবে গাছে পচন ধরে। ছত্রাক অনেক বিষাক্ত দ্রব্য (toxin) ক্ষরণ করে, যা গাছের দেহক্রিয়ায় নানারকম বিঘ্ন ঘটায়। ছত্রক, ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসের আক্রমণের ফলে গাছে ক্লোরোফিল নষ্ট হতে পারে। ক্লোরোফিল নষ্ট হলে, গাছ ঠিকমত সালোকসংশ্লেষণ করতে পারেনা। ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া অনেক দ্রব্য উৎপাদন করে যা কোষ-আবরণে বিশেষভাবে পরিবর্তন আনতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তন ঘটলে কোষের মধ্যে পানি প্রবেশ করতে পারে না। ফলে গাছে পানির অভাব দেখা দেয়। গাছের পাতা ও কচি শাখা নুয়ে পড়তে থাকে। অনেক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া জাইলেমের (xylem) মধ্যে হয়। এর ফলেও গাছে পানি ওঠার বিঘ্ন ঘটে। গাছ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া পেকটিনাজ (pectinase) নামক এনজাইম ক্ষরণ করতে পারে। এই শ্রেণীর এনজাইমের প্রভাবে গাছের কোষের মধ্যবর্তী পেকটিন প্রাচীর (middle lamella) ভেঙ্গে পড়ে কোষগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। অনেক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া সেলুলোজ ভঙ্গকারী এনজাইমও ক্ষরণ করে। যার প্রভাবে কোষ-প্রাচীর ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এভাবে পরজীবী ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া গাছের বিশেষ ক্ষতিসাধন করতে পারে। গাছের ক্ষেত্রে ব্যাকটি-রিয়ার চাইতে ছত্রাক অধিক সংখ্যক রোগ উৎপাদন করে। ছত্রাক সাধারণতঃ অম্লপ্রধান বস্তু পছন্দ করে। গাছে অম্লপ্রধান বস্তু যথেষ্টই থাকে। এ কারণে প্রাণীদের চাইতে ছত্রাক গাছেই অধিক পরিমাণে হয় ও রোগ উৎপাদন করে।

---

হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাওয়ালে ছেলে খেপবে না। ছেলেটি খেপে মারা যায়। খেপাকুকুর কামড়ালে পাস্তুরের আবিষ্কার এবং পরবর্তীকালে তার যে উন্নতি হয়েছে তার সাহায্য গ্রহণই বাঁচবার নিশ্চিত উপায়। অন্যভাবে চেষ্টা না করাই ভাল। কারণ, তার মধ্যে কোন নিশ্চয়তা নেই।

banglainternet.com



মানুষ ও প্রাণীদের রক্ত সাধারণ ক্ষারধর্মী। অধিকাংশ রোগ উৎপাদক ব্যাক-টিরিয়া ক্ষারপ্রধান মাধ্যমে ভাল হয়। এ কারণে গাছের ক্ষেত্রে ব্যাকটিরিয়া কম রোগ উৎপাদন করতে পারে বলে মনে হয়।

## ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগ

যেসব ব্যাকটিরিয়া গাছের রোগ উৎপাদন করে তারা প্রধানতঃ অম্লপ্রধান মাধ্যম পছন্দ করে। এরা গাছের মধ্যে অম্লপ্রধান পরিবেশে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রার হতে পারে। মানুষের রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া সবচেয়ে ভাল-ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। কিন্তু গাছের মধ্যে যে সব ব্যাকটিরিয়া রোগ উৎপাদন করে তারা ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেই ভালভাবে হতে পারে।

যেসব ব্যাকটিরিয়া গাছের রোগ উৎপাদন করে তারা সকলেই দণ্ডাকৃতি এবং একমাত্র করেনি ব্যাকটিয়াম (Coryne bacterium) ছাড়া আর সকলেই গ্রাম-নেগেটিভ। একমাত্র ব্যাসিলাস পলিমিক্সা (Bacillus polymyxa) ছাড়া আর কেউ এন্ডোস্পোর (endospore) উৎপাদক নয়। এরা তাই মাটির মধ্যে স্পোর হিসাবে টিকে থাকতে পারে না। গাছের রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া সাধারণতঃ টিকে থাকে খেতে ফসলের আবর্জনার মধ্যে অথবা কন্দ (bulb), ভান্ডার, মূল প্রভৃতির মধ্যে। উদ্ভিদের অধিকাংশ উল্লেখ্য রোগ হয় সিউডো-মোনাস ( pseudomonas ) ও জ্যান্থমোনাস ( xanthomonas ) গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়ার জন্য। আমাদের দেশে ধান গাছে জ্যানথোমোনাস অরাইজি (Xanthomonas oryzae) নামক একটি ব্যাকটিরিয়াম-এর আক্রমণে রোগ হতে দেখা যায়। রোগটিকে বলে ধানের মড়ক ( bacterial blight of rice )। সিউডোমোনাস সোলানী (pseudomonas solani) নামক ব্যাকটিরিয়াম-এর আক্রমণে গোল আলু গাছে রোগ হয় ও গোল আলু পচে নষ্ট হয়। এই ব্যাকটিরিয়াম তামাক গাছকেও আক্রমণ করে। আক্রান্ত গাছের পাতা ও কচি শাখা নুইয়ে পড়ে (wilting)। জ্যানথোমোনাস ভাসকুলোরাম (X. anthomonas vasculorum) নামক ব্যাকটিরিয়াম-এর আক্রমণে অনেক দেশে আখের রোগ হয়। এই রোগে আক্রান্ত আখ গাছের মধ্যে এক রকম আঠালো বস্তুর সৃষ্টি হয়। রস নষ্ট হয়ে যায়। জ্যানথোমোনাস ভাসকুলোরাম (X. vasculorum)-এর আক্রমণে কার্পাস তুলা গাছের রোগ হয়। যার জন্য ফল মরে যায়। এই রোগ অনেক অঞ্চলে কার্পাস চাষের যথেষ্ট ক্ষতি করে।

### ভাইরাসজনিত রোগ

ভাইরাসজনিত কারণে উদ্ভিদের বহু রোগ হয়। ছত্রাকের পরেই সম্ভবত ভাইরাস জনিত রোগ ফসলের সবচাইতে বেশি ক্ষতি করে। ধানে খুঙরো নামে ভাইরাসের আক্রমণে যে রোগ হয়, তার ফলে অনেক অঞ্চলে ধান চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ভাইরাস সবচাইতে ক্ষতি করে সোলানেসি (Solanaeceae) পরিবার-ভুক্ত ফসলের। গোল আলু ও মরিচ গাছে একাধিক ভাইরাস হয়। এসব রোগের ফলে গোল আলু ও মরিচ চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কলা গাছে বাঞ্চিটপ নামে একটি রোগ হয়। এই রোগ অনেক সময় কলা চাষের যথেষ্ট ক্ষতি করে। পেঁপে গাছে একাধিক ভাইরাস রোগ হতে দেখা যায়। এর ফলে আমাদের দেশে পেঁপে চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। যেসব ভাইরাস ফসলের রোগ উৎপাদন করে তারা প্রায় সকলেই R N A বিভাগভুক্ত। ভাইরাসরা খুব ছোট বলে তারা সহজেই আক্রান্ত গাছের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে আক্রান্ত গাছের কোন অংশকে অঙ্গজ বিস্তারের (vegetative propagation) জন্য ব্যবহার করলে, তার মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে। গোল-আলু গাছের একাধিক ভাইরাস রোগ আক্রান্ত গোল আলুকে 'বীজ' হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য ছড়ায়। এছাড়া উদ্ভিদ ভাইরাস পতঙ্গের মাধ্যমেও খুব বেশি ছড়ায়। যেসব পতঙ্গ গাছের রস চুষে খায়, যেমন আফিডস (Aphides) ও জ্যাসিড (Jassides), অনেক ভাইরাস রোগ বিস্তার করে থাকে। পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ তাই উদ্ভিদের ভাইরাস রোগ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়।

### সংক্রমণ চক্র

ফসলের রোগ নিবারণের ক্ষেত্রে যা প্রথমত জানতে হয়, তাহল কোন একটি রোগ জীবাণুজনিত কারণে হচ্ছে কিনা। জীবাণুজনিত কারণে রোগটি হলে জানতে হয়, জীবাণুটি অসুস্থ গাছ থেকে সুস্থ গাছে কিভাবে ছড়ায়। রোগ জীবাণুটি কি কি গাছে হয়ে থাকে। খেতে যখন আক্রমণযোগ্য কোন ফসল থাকে না তখন জীবাণুটি কিভাবে বেঁচে থাকে। এভাবে অনুসন্ধান করবার ফলে জানা যায় কোন জীবাণুর সংক্রমণ-চক্র (infection cycle)। জীবাণুজনিত উদ্ভিদ রোগ নিবারণের মূল কথা হল জীবাণুর উৎস (source of infection)-সমূহকে নষ্ট করা। সংক্রমণ চক্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাছ রোগাক্রান্ত হলে আর কোন কিছু করণীয় থাকে না। বহুবর্ষজীবী মূল্যবান ফলের গাছ, কাঠ উৎপাদক গাছ ছাড়া কোন গাছকে

banglainternet.com



চিকিৎসা করতে হলে যে পরিমাণ খরচ পড়বে তাতে ফসল উৎপাদন কখন সম্ভব নয়। ফসলের ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত গাছকে উপড়ে মাটিতে পুঁতে ফেলে অথবা পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলাই সহজ পন্থা। তাছাড়া গাছের ক্ষেত্রে ঠিক প্রাণীদের মত কোন সংবহনতন্ত্র (circulatory system) নাই। গাছে ঔষধ প্রয়োগ করলে তা গাছের সর্বত্র যেয়ে পেঁছাতেও পারে না। গাছের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা উৎপাদন করা চলে না। গাছের ক্ষেত্রে প্রতিষেধক টিকা সম্ভব নয়। গাছের ক্ষেত্রে কোন রোগ যদি বীজের মারফৎ ছড়ায় তবে বীজে ঔষধ প্রয়োগ করে এসব জীবাণু মেরে ফেলা চলতে পারে। যেমন কোন অঞ্চলে ধান গাছে যদি ব্যাকটিরিয়াজনিত মড়ক (blight) বেশি হতে দেখা যায়, তবে বীজকে স্ট্রেপটোমাইসিন (streptomycin)-এর সাহায্যে শোধন করে নেওয়া চলতে পারে। স্ট্রেপটোমাইসিন, ধানের মধ্যে যেসব ব্যাক-টিরিয়া থাকে তাদের মেরে ফেলে ঐ বীজের মাধ্যমে রোগ-বিস্তারের সম্ভাবনাকে দূর করে।

### ফসলের রোগ নিবারণের সাধারণ উপায়

উদ্ভিদ রোগ নিবারনের জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বিশেষভাবে মেনে চলতে হয় :

১। খেত্রে প্রথমে কতকগুলি গাছে রোগ দেখা দেয়। পরে এসব গাছ থেকে অন্য গাছে রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। তাই খেতে কোন রোগাক্রান্ত গাছ চোখে পড়ামাত্র তাকে তুলে মাটিতে পুতে অথবা পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা উচিত।

২। খেতে আবর্জনার মধ্যে অনেক রোগ জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে। তাই পরিচ্ছন্নভাবে চাষ আবাদ করতে চেষ্টা করা উচিত। ফসল কেটে নেবার পর খেতে নাড়া পুড়িয়ে ফেলা ভাল।

৩। একই খেতে কোন ফসল বছরের পর বছর লাগালে সেই খেতে ঐ ফসলের কোন রোগ জীবাণু খুব বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই কোন খেতে কোন বিশেষ ফসলের রোগ অধিক হতে দেখা গেলে, ঐ খেতে ঐ বিশেষ ফসলের আবাদ কিছু দিন না করা উচিত।

৪। ফসলের অনেক রোগ জীবাণু আগাছাকেও আক্রমণ করে। খেতে ফসলের অবর্তমানে এরা আগাছার মধ্যে বেঁচে থাকে। আগাছা থেকে পরে আবার ফসলে সংক্রমিত হয়। এ ধরনের আগাছা নষ্ট করে ফেলতে পারলে রোগের মাত্রা কমে।

৫। খেতে ঘন করে চারা লাগালে রোগ হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। মাটি ভালভাবে চাষ করে সারিবদ্ধভাবে কম গাছ লাগালে খেতে রোগের পরিমাণ কম হয়। খেতে খুব বেশী গাছ থাকলে তারা পুষ্টিহীনতায় ভুগে। সাধারণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল গাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। কাছাকাছি গাছে রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনাও বেশী থাকে।

৬। জমিতে নাইট্রোজেন সার বেশী দিলে গাছপালায় জীবাণুজনিত রোগ বেশি হয়। কারণ এতে গাছের কোষপ্রাচীর নরম হয়ে পড়ে। ছত্রাক ও অন্যান্য জীবাণু সহজেই গাছের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। অন্যদিকে পটাশ সার গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। জমিতে সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, তা যেন ভারসাম্য রক্ষা করে।

৭। যেহেতু অনেক উদ্ভিদরোগ বীজ ও লাগাবার জন্য ব্যবহৃত গাছের বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করতে পারে, যতদূর সম্ভব নীরোগ গাছ থেকে বীজ ও লাগাবার প্রয়োজনীয় অংশ সংগ্রহ করা উচিত।

### ঊনবিংশ অধ্যায়

## প্রাণীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

সব রোগজীবাণু কোষের রোগ উৎপাদন ক্ষমতা এক রকম নয়। একই প্রজাতিভুক্ত (species) রোগ জীবাণুর মধ্যে কিছুসংখ্যক কোষের রোগ-উৎপাদনের ক্ষমতা হতে পারে অন্যদের তুলনায় বেশি। যেসব রোগজীবাণু কোষের রোগ উৎপাদন ক্ষমতা বেশী, তাদের বলা হয় উগ্র (virulint)। কোন বিশেষ প্রজাতির জীবাণুর রোগ উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে তার মধ্যেকার উগ্র জীবাণুকোষের সংখ্যার উপর। যদি কোন প্রজাতির জীবাণু উগ্রকোষ দেহের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রবেশ করতে পারে, তবেই কেবল রোগ হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। রোগজীবাণু নানাভাবে মানুষের দেহে রোগ উৎপাদন করে থাকে। তবে অধিকাংশ রোগজীবাণুই বিষাক্ত বস্তু বা টকসিন (toxin) উৎপাদন করে, যার প্রভাবে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু টকসিনরা ঠিক কিভাবে মানবদেহে কাজ করে, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনও সুস্পষ্ট নয়। বিষাক্ত বস্তুরা বিষাক্ত, কেবল এইটুকুই বলা যায়। জীবাণু-জনিত কারণে মানুষের রোগ হবার সম্ভাবনাকে এভাবে প্রকাশ করা চলে :

$$P = \frac{NV}{R}$$

উপরের সূত্রে, 'P' হল রোগ হবার সম্ভাবনা। 'N' হল রোগজীবাণুর সংখ্যা। 'V' হল জীবাণুর উগ্রতার পরিমাণ এবং 'R' হল দেহের রোগ প্রতি-রোধ ক্ষমতা বা রেজিস্ট্যান্স (resistance)।

উপরের সূত্র অনুসারে রোগ হবার সম্ভাবনা নির্ভর করে কি পরিমাণে রোগ-জীবাণু শরীরে এক সঙ্গে প্রবেশ করছে তার মাত্রার উপর; যেসব রোগজীবাণু কোষ দেহে প্রবেশ করছে তার উগ্রতার (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষাক্ত বস্তু উৎপাদন এবং উপর ক্ষমতা) যে দেহে প্রবেশ করছে, রোগজীবাণুকে বাধা দেবার ক্ষমতা তার কতটা আছে তার উপর। অর্থাৎ কেবলমাত্র রোগজীবাণুই কোন রোগ উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। যে দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করে, সেই দেহের অবস্থার উপরও রোগ হওয়া না হওয়া বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শরীরে রোগ জীবাণু প্রবেশ করলেই রোগ হয় না। জীবাণু প্রবেশ করতে হয় যথেষ্ট মাত্রায়। বহুরকম রোগজীবাণু আমাদের শরীরে নানাভাবে প্রতিনিয়ত প্রবেশ করতে

banglainternet.com

পারে। কিন্তু শরীরে রোগ জীবাণু প্রবেশ করলেই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি না। অদৃশ্য জীবাণুপূর্ণ এই বিশ্বে আমরা সুস্থ থাকি।

## রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্ভর করে অ্যান্টিবডি (antibody) উৎপাদন ক্ষমতার উপর। অ্যান্টিবডি বলতে বোঝায়, মানুষের রক্তে উৎপাদিত এক প্রকার প্রোটিন পদার্থ, যা অ্যান্টিজেন (antigen)-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে তার ক্ষতিকর প্রবণতাকে প্রশমিত করতে পারে। অ্যান্টিজেন বলতে সাধারণতঃ বোঝায় এমন বাহ্যিক প্রোটিন বস্তু, যা মানবদেহে (অথবা অন্য কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহে) প্রবেশ করলে, রক্তে অ্যান্টিবডি উৎপাদিত হতে থাকে। যেসব জীবাণু (প্রধানতঃ ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস) মানুষের রোগ সৃষ্টি করে, তাদের দেহের একাধিক প্রোটিন অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করতে পারে। অনেক জীবাণু যেসব 'বিষাক্ত বস্তু উৎপাদন করে, তারাও রক্ত-অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে। শরীরে অ্যান্টিবডি উৎপাদন যদি যথেষ্ট দ্রুত হয়, তবে রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে না। কিন্তু তা না হলেই মানুষ বিশেষভাবে পীড়িত হয়ে পড়ে ও রোগ হতে পারে মৃত্যুর কারণ।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তে এক ধরনের (plasma cells)।* এরা এক ধরনের প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে, যাকে বলা হয় গামা-গ্লোবিউলিন (γ-globulin)। এখনকার মত অনুসারে, অ্যান্টিবডিরা হল বিশেষ বিশেষ প্রকারের গামাগ্লোবিউলিন। এক এক রকম অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে এক এক রকম গামাগ্লোবিউলিন উৎপন্ন হয় রক্তের প্লাজমাকোষে এবং পরে তারা ছাড়া পায় রক্তের তরল অংশের মধ্যে। কয়েকদিন অতিবাহিত না হলে রক্তে যথেষ্ট অ্যান্টিবডি ছাড়া পায় না। কোন রোগ জীবাণু যদি খুব দ্রুতহারে বিষাক্ত বস্তু উৎপাদন করে,তবে রক্তে তাদের প্রসারিত করতে পারবার মত যথেষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদিত হতে পারে না। আর তার ফলে রোগীর ঘটতে পারে মৃত্যু। বিউবনিক প্লেগের ক্ষেত্রে এরকম হতে দেখা যায়। অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন পরস্পরের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়। অ্যান্টিবডি ব্যাকটিরিয়া দেহে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যখন যুক্ত হয়, তখন তারা মারা যায় অথবা তাদের বিভাজন ও চলৎশক্তি হারায়। নিষ্ক্রিয়

* এরা বেসোফিলিক (Basophilic), অর্থাৎ খুব বেশী পরিমাণে ক্ষত প্রধান রঞ্জক (strain) গ্রহণ করে। যেসব কোষের সাইটোপ্লাজম খুব বেশি করে প্রোটিন উৎপাদন করে, তারা বেসোফিলিক।



হয়ে পড়ে। অ্যান্টিবডি অনেকক্ষেত্রে বিষাক্ত বস্তুর সঙ্গে একত্রিত হয়ে, তাদের বিষক্রিয়াকে নষ্ট করে।

## সক্রিয় রোগ প্রতিরোধিতা

রোগ জীবাণুকে অথবা তার দেহমিশ্রিত বিষকে নানাভাবে পরিবর্তিত করে তা সুস্থ মানবদেহে ঢুকিয়ে দিলে মানুষের দেহে অ্যান্টিবডি উৎপাদিত হতে পারে। কিন্তু মানুষ পীড়িত হয়ে পড়ে না। এভাবে সুস্থ দেহে জীবাণু অথবা জীবাণু উৎপাদিত বিষাক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করে অ্যান্টিবডি উৎপাদনকে বলা হয় টিকা দেওয়া ( vaccination )। টিকা দিলে মানুষের শরীরে অ্যান্টিবডি উৎপাদিত হয়ে ঐ বিশেষ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়। আগে থেকে উৎপাদিত বিশেষ অ্যান্টিবডি, ঐ বিশেষ রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে তাদের মেরে ফেলে অথবা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আজকাল বহু জীবাণুজনিত রোগের বিরুদ্ধেই বিশেষ বিশেষ টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। টিকা প্রদানের জন্য অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব বিশেষভাবে কমে গেছে। যেমন ডিপথেরিয়া। ডিপথেরিয়া জীবাণু থেকে মিশ্রিত বিষাক্ত দ্রব্যকে (toxin) বিশেষ পদ্ধতিতে (যেমন ফরমালডিহাইডের সাহায্যে ) পরিবর্তিত করলে এর বিষক্রিয়া থাকে না।* কিন্তু বিশেষ অ্যান্টিবডি উৎপাদন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় না। যেসব ক্ষেত্রে জীবাণুর অ্যান্টিজেনকে টিকাদানের জন্য ব্যবহার করা হয়, সেসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উত্তাপ প্রয়োগ করে জীবাণুকে মেরে ফেলা হয় অথবা তাদের নিষ্ক্রিয় করে তোলা হয়। সেসব ক্ষেত্রেই মৃত জীবাণুর সাহায্যে টিকা প্রদান করা যায়। যেখানে উত্তাপ দ্বারা জীবাণুকে মেরে ফেলে জীবাণুর অ্যান্টিজেন (antigen) অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু এমন অনেক জীবাণু আছে, যাদের বেশি উত্তাপ প্রয়োগ করলে তাদের অ্যান্টিজেন ঠিক থাকে না। এসব ক্ষেত্রে তাদের অল্প উত্তাপ বা অন্য কোন উপায়ে দুর্বল করে ফেলা হয়। এরা বেঁচে থাকলেও মানবদেহে বৃদ্ধি পেতে অথবা রোগ উৎপাদনে সক্ষম হয় না। টিকার সাহায্যে মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করাকে বলা হয় সক্রিয় রোগ প্রতিরোধিতা (active immunisation)।

## নিষ্ক্রিয় রোগ প্রতিরোধিতা

এক্ষেত্রে রোগ জীবাণু মানুষের দেহে প্রবিষ্ট না করে অন্য কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর (যেমন ঘোড়ার) দেহে প্রবেশ করান হয়। এর ফলে তার দেহে যে

* এভাবে পরিবর্তিত টক্সিনকে টক্সয়েড (toxid) বলে।

banglainternet.com

অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়, তা নিয়ে পরে অসুস্থ মানবদেহে প্রদান করা হয়। অন্য প্রাণীর দেহে উৎপাদিত অ্যান্টিবডির সাহায্যে মানুষের রোগ চিকিৎসাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় রোগ প্রতিরোধিতা (passive immunization)। ঘোড়ার দেহে ডিপথেরিয়া এবং ধনুষ্টংকার রোগের পরিবর্তিত বিষাক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে তার সাহায্যে মানুষের ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টংকার (Tetenus) রোগ চিকিৎসা করা হয়। ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টংকার রোগের জীবাণুরা মানুষের শরীরে দ্রুত বিষাক্ত দ্রব্য উৎপাদন করতে থাকে এবং এর বিপক্ষে অ্যান্টিবডি উৎপাদিত হতে সময় নেয়। এভাবে অন্য প্রাণীর দেহে উৎপাদিত অ্যান্টিবডির সাহায্য ছাড়া এসব রোগের চিকিৎসা সম্ভব ছিল না।

## ফ্যাগো সাইটোসিস

মানুষের দেহে একাধিক প্রকার কোষ আছে, যারা কতকটা এককোষী প্রাণী অ্যামিবার (amaeba) মত। এদের দেহবস্তু অর্ধ-তরল। যখন এরা কোন জীবাণুর কাছাকাছি আসে, তখন এরা অ্যামিবার মত সিউডোপোডিয়া (pseudopodia) বিস্তার করে তাকে আটকে ফেলে ও পরে তাকে হজম করে। এসব কোষকে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয় ফ্যাগোসাইট (phagocyte) হিসাবে। অ্যান্টিবডির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার বলে জীবাণুরা যখন বিশেষভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, ফ্যাগোসাইটরা তখন তাদের অনেক সহজে সিউডোপডিয়ার সাহায্যে ঘিরে ধরে হজম করতে পারে। জীবাণুকে এভাবে ধরে হজম করবার ঘটনাকে বলা হয় ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis)। অর্থাৎ মানবদেহে একাধিক প্রকার রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা বিদ্যমান। অ্যান্টিবডি মানুষের রক্তে সব সময় থাকে না। বিশেষ অবস্থায় সৃষ্টি হয়। কিন্তু ফ্যাগোসাইটরা রক্তে সব সময়েই থাকে।

## ফ্যাগোসাইট ও অ্যান্টিবডি সম্পর্কিত বিতর্ক

ফ্যাগোসাইট (phagocyte) আবিষ্কার করেন ফ্রান্সে বসবাসকারী রুশ জীবাণুতাত্ত্বিক এমিল মেচনিকফ (Emil Mechnikoff, ১৮৪৫–১৯১৬)। তিনি প্রথম ফ্যাগোসাইট আবিষ্কার করেন পানির মাছি ডাফনিয়ার (Daphnia) দেহে। ডাফনিয়ার একটি বিশেষ রোগ হয় ইস্টের (Yeast)-এর জন্য। কোন কোন ডাফনিয়ার ক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্য করেন, তার দেহের মধ্যকার অ্যামিবার মত এক রকম কোষ, ইস্ট কোষকে চারপাশ থেকে সিউডোপোডিয়ার সাহায্যে ঘিরে

banglainternet.com



ফেলে হজম করে ফেলতে পারছে। পরে তিনি এ ধরনের কোষ মানুষের শরীরে রক্তের মধ্যে দেখতে পান।

অ্যান্টিবডি সম্পর্কে প্রথম ধারণা প্রদান করেন বিখ্যাত জার্মান জীবাণুবিদ পল এহ্‌রলিখ্ (Paul Ehrlich, ১৮৫৪–১৯১৫)। তিনি তাঁর মতের পিছনে দেখান, কোন জীবাণুজনিত রোগ থেকে মানুষ যখন সেরে ওঠে, তখন তার রক্তের মধ্যে এমন কিছু থাকে, যা ঐ জীবাণুদের মেরে ফেলতে অথবা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। যেমন যে রোগী টাইফয়েড থেকে সেরে উঠেছে, তার রক্ত থেকে ছেঁকে কেবলমাত্র যদি জলীয় অংশ নেওয়া হয় এবং তার মধ্যে যদি টাইফয়েড রোগের জীবাণুদের প্রদান করা হয়, তবে দেখা যায়, তারা একত্রে দলা পাকিয়ে থিথিয়ে পড়ছে (agglutinate)। তেমনি যে রোগী কলেরা থেকে সেরে ওঠে তার রক্তের জলীয় অংশে এমন কিছু থাকে, যা ঐ একইভাবে কলেরা জীবাণুদের একত্রে দানা পাকিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু কলেরা রোগীর রক্তের মধ্যে টাইফয়েড জীবাণু প্রয়োগ করলে, অথবা টাইফয়েড রোগীর রক্তে কলেরা রোগের জীবাণু প্রদান করলে জীবাণু কোষেরা একত্রিত হয়ে দানা পাকিয়ে (clump) যায় না। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার রোগজীবাণু তাদের নিজেদের বিরোধী কোন বস্তু রক্তের মধ্যে উৎপাদন করে।

মানুষের রোগজীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা ফ্যাগোসাইটের উপর নির্ভর করে, না অ্যান্টিবডির উপর নির্ভর করে, তা নিয়ে অনেক দিন ধরে বিতর্ক চলে। কিন্তু আমরা এখন জানি, এই উভয়বিধ ভাবেই আমাদের দেহ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী রোগ জীবাণুর বিরোধিতা করতে পারে।

ভাইরাসের আক্রমণে মেরুদণ্ডী উষ্ণ রক্তসম্পন্ন প্রাণীর দেহে এক প্রকার প্রোটিন বস্তুর উদ্ভব হয়। এদের বলে ইনটারফেরন (interferon)। এরা ভাইরাসদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। তবে এরা ঠিক অ্যান্টিবডির মত নয়। এক ভাইরাস জাপানী জীবাণুবিদ কিতাসাতো (Kitasato) দেখান, কেবল যে জীবাণুরাই রক্তের মধ্যে বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন করে তাই নয়। ব্যাকটিরিয়া নিঃসৃত বিষাক্ত রস (toxin) অনেকক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সৃষ্টি করে, যার সঙ্গে বিষাক্ত বস্তুর ক্রিয়া ঘটে এবং বিষাক্ত বস্তু পরিণত হয় নিষ্ক্রিয় বস্তুতে। এহ্‌রলিখ-এর তত্ত্বকে ইংরেজিতে বলা হয় হিউমোরাল ইমমিউনিটি (humoral immunity)। অনেক দিন ধরে মেচনিকফ-এর মতের সমর্থক এবং এহ্‌রলিখ-এর সমর্থকদের মধ্যে বিতর্ক চলে।

কিন্তু আমরা এখন জানি, উভয় প্রকার রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়াই সত্য। রক্তে ফ্যাগোসাইটদের মত কোষও আছে এবং অ্যান্টিবডিও উৎপন্ন হয়। আমাদের শরীর ঠিক এভাবে জীবাণুদের প্রতিরোধ করতে চায় না। এর একাধিক ব্যবস্থা আছে।

ভাইরাসের আক্রমণে মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহে কেবল অ্যান্টিবডি উৎপাদিত হয় না, আর এক ধরনের প্রোটিন পদার্থও উৎপাদিত হয়। এই প্রোটিন পদার্থকে বলা হয় ইনটারফেরন ( interfron )। ইরটাফেরন ভাইরাসদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়। কিন্তু এদের ক্রিয়া ঠিক অ্যান্টিবডির অনুরূপ নয়। কোন ভাইরাসের উপস্থিতি উৎপাদিত অ্যান্টিবডি কেবল সেই ভাইরাস অথবা তার নিকট সম্বন্ধযুক্ত ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। কিন্তু ইনটারফেরন একবার উৎপাদিত হবার পর অন্য যেকোন ভাইরাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে।

## জীবাণু প্রতিরোধে পরিবেশের প্রভাব

আমাদের দেহে অ্যান্টিবডি উৎপাদন ক্ষমতা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ঠাণ্ডা লাগলে অ্যান্টিবডি উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। অ্যান্টিবডিরা প্রোটিন বস্তু। যারা পুষ্টিহীনতায় ভোগে, তাদের দেহে অ্যান্টিবডি উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পায়। মানুষের ক্ষেত্রে মানসিক অবস্থার উপরও অ্যান্টিবডি উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভরশীল। উদ্বেগ, ভয়, দেহের অ্যান্টিবডি উৎপাদনের হার কমিয়ে দেয়। চিন্তাগ্রস্ত লোকের চাইতে প্রফুল্লমনা লোকে জীবাণুজনিত রোগে অধিক ভোগে।

ধুলাবালিপূর্ণ বাতাসে, কারখানায় যারা কাজ করে, তারা সাধারণতঃ শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এর একটা কারণ, ধুলবালিপূর্ণ বাতাসের ঘষায়, ফুসফুসের মধ্যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং রোগজীবাণু ক্ষতের মধ্যে দিয়ে সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

পাকস্থলীতে অম্লের কমবেশির উপরও রোগজীবাণুর দ্বারা রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি-কম নির্ভর করে। কারণ, অম্লতা অনেক রোগজীবাণুর বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার রোধ করে। আমাদের দেহে যেসব ব্যাকটিরা রোগ উৎপাদন করে তারা সাধারণতঃ ক্ষারপ্রধান অবস্থায় দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও বংশবিস্তার করে। আমাদের রক্ত ক্ষার প্রধান। মেচনিকফ্ এ কারণে বেশি করে দই খাবার কথা বলেন। তিনি বলেন দই খেলে পাকস্থলীতে অম্লতা বাড়ে। রোগ জীবাণু

banglainternet.com



সংখ্যা বাড়তে পারে না। ফলে মানুষের দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব। কিন্তু তাঁর এই মত প্রমাণ করা যায়নি।

## অ্যান্টিবডির সাহায্যে ভাইরাস সনাক্তকরণ

কোন ভাইরাসকে যদি খরগোশ অথবা গিনিপিগের শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়, তবে ঐ ভাইরাস বিরোধী অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। যদি দেখা যায় ঐ খরগোশ বা গিনিপিগ থেকে নেওয়া রক্তের সিরামের সঙ্গে কোন ভাইরাসকে মিশালে তা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে, তবে বুঝতে হবে ঐ ভাইরাস ও আগে যে ভাইরাস রক্তে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তারা একই, অথবা খুবই নিকট সম্বন্ধ যুক্ত।

যা কিছু, রক্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হলে অ্যান্টিবডির উদ্ভব হয়, তাকে বলা হয় অ্যান্টিজেন (antigen)। অনেক ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন থাকে জীবাণুদের বিশেষ অংশে, সব অংশে নয়। ভাইরাসরা অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে। যেসব ভাইরাসের অ্যান্টিজেনে মিল থাকে তারাই কেবল এদের উৎপাদিত অ্যান্টিবডির সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহৎ কণিকার আকারে অধঃক্ষেপ (precipitation) সৃষ্টি করে। যেসব ভাইরাস উদ্ভিদের রোগ উৎপাদন করে, প্রাণীদের রোগ উৎপাদন করে না এবং ব্যাকরিওফাজ উষ্ণ মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহের রক্তে অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে। এই উৎপাদিত অ্যান্টিবডির সাহায্যে এদের বিশেষভাবে সনাক্ত (identify) করা সম্ভব।

বিংশ অধ্যায়

# ক্ষুদ্র মৃতজীবী ছত্রাক বা চিতি

### ছত্রাকের সংজ্ঞা

ছত্রাক বলতে বোঝায় সেসব জীবকে, যারা স্পোর ( spore ) বা জীবকণা মারফত বংশবিস্তার করে, যাদের দেহে কোষকেন্দ্র আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে, যাদের দেহে কোন ক্লোরোফিল থাকে না, এবং সাধারণতঃ যাদের দেহ তৈরি লম্বা সুতার মত নালিকা বা হাইফি ( hyphae ) দিয়ে ( একবচনে, হাইফা )। এসব হাইফা একত্র হয়ে যে শক্ত স্তূপের সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় মাইসেলিয়াম ( mycelium ), বহুবচনে মাইসেলিয়া, ( mycelia )। ছত্রাকের হাইফা নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এরা দুই ধরনের। একদল ছত্রাকের হাইফার মধ্যে দেখা যায় আড়াআড়ি প্রাচীর ( cross wall )। যাকে বলা হয় সেপটা [septa, একবচনে সেপটাম, (septum)]। যেসব হাইফাতে আড়াআড়ি প্রাচীর থাকে তাদের ক্ষেত্রে হাইফাকে ভাবা চলে একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত। যেসব ছত্রাকের ক্ষেত্রে হাইফা আড়াআড়ি প্রাচীর দিয়ে বিভক্ত নয়, তাদের মনে করা চলে এককোষী বলে। যেহেতু আড়াআড়ি প্রাচীরবিহীন ছত্রাক দেহ কম জটিল তাই এসব ছত্রাকের উল্লেখ করা হয় সাধারণতঃ নিম্নস্তরের ছত্রাক ( lower fungi ) হিসাবে। আর যারা আড়াআড়ি প্রাচীরযুক্ত হাইফা দিয়ে গঠিত সেসব ছত্রাকদের ভাবা হয় উচ্চ স্তরের ( higher fungi ) বলে।

যেসব ছত্রাক সাধারণতঃ খুব ছোট এবং যারা মৃত জৈব-পদার্থের উপর হয়, তাদের বলা হয় চিতি বা মোল্ড ( mould )। আমরা বর্ষাকালে ভেজা জুতোর উপর যে সাদা বোয়ার মত জিনিস গজাতে দেখি তা চিতির একটি দৃষ্টান্ত। চিতি বলতে যাদের বোঝায় তাদের মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন উভয় স্তরের ছত্রাকই আছে।

### ছত্রাকের স্পোর

আমরা উল্লেখ করেছি ছত্রাকের একটি বৈশিষ্ট্য হল স্পোর দ্বারা বংশবিস্তার। স্পোর বলতে ছত্রাকের ক্ষেত্রে বোঝায় বিশেষ ধরনের কোষ, যা ছত্রাকের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও যা অঙ্কুরিত হয়ে নূতন ছত্রাকের জন্ম দেয়। স্পোরের ক্ষেত্রে অঙ্কুরণ বলতে বোঝায়, স্পোর থেকে লম্বা এক বা একাধিক সরু ছোট



হাইফা বা জার্ম-টিউব ( germ-tube ) সৃষ্টি হওয়া। এসব জার্ম-টিউব বা বীজনল ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছত্রাক নালিকা বা মাইসেলিয়াম সৃষ্টি করে। অনেক সময় দু'ধরনের স্পোরে মিলিত হয়ে সৃষ্ট কোষ বা জায়গোট (zygote)-কেও উল্লেখ করা হয় স্পোর বলে। কিন্তু ছত্রাকের ক্ষেত্রে এই জায়গোট জটিল ভ্রূণের জন্ম দেয় না। স্পোরকে তুলনা করা চলে কতকটা গাছের বীজের সাথে। স্পোর কথাটার শব্দগত মানে গ্রীক ভাষায় হল বীজ (seed)। কিন্তু বীজের সাথে স্পোর-এর তফাৎ হল যে, বীজের মধ্যে গাছ থাকে ভ্রূণ (embryo) অবস্থায়।* কিন্তু স্পোরের মধ্যে কোন ভ্রূণ থাকে না। তা এককোষী। এছাড়া স্পোরের চারধারে কোন জৈব-কোষের স্তর থাকে না। অর্থাৎ স্পোর একটি স্বতন্ত্র এককোষী প্রজনন একক (propagative unit)। অনেক সময় অনেক ছত্রাকের স্পোর একাধিককোষী হয়ে থাকে। কিন্তু অঙ্কুরণের সময় প্রত্যেক কোষ থেকে আলাদা করে হাইফি নির্গত হয়। অর্থাৎ কাজের দিক থেকে এরা সকলেই স্বতন্ত্র।

ছত্রাকের স্পোর সাধারণতঃ বাতাসের দ্বারা এক স্থান থেকে অপর স্থানে নীত হয়। যখন তারা উড়ে গিয়ে কোন উপযুক্ত বস্তুর উপর পড়ে এবং অন্যান্য অবস্থা অনুকূলে থাকে তখন অঙ্কুরিত হয়ে ছত্রাক জালিকা বা মাইসেলিয়াম সৃষ্টি করে (চিত্র ৭)।

### চিতির শ্রেণীবিভাগ

চিতি-রা উচ্চ ও নিম্ন, উভয় স্তরের ছত্রাকদের দলেই পড়ে। অর্থাৎ একদল চিতি আছে যাদের হাইফা আড়াআড়ি প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত এবং অন্য দলের হাইফা আড়াআড়ি প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত নয়।

যাদের দেহ আড়াআড়ি প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত নয় সেসব ছত্রাকের উল্লেখ করা হয় ফাইকোমাইসেটিস (Phycomycetes) বলে। যাদের দেহ আড়াআড়ি প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত সেসব ছত্রাককে সাধারণতঃ ভাগ করা হয় তিন ভাগে। যাদের ক্ষেত্রে কোন প্রকার যৌন-স্পোর হয় না তাদের বলা হয় অপরিণত ছত্রাক বা ফাঞ্জাই ইম্পারফেক্টি (Fungi imperfecti)। যাদের যৌন-স্পোর হয়, তাদের এক শ্রেণীকে বলে ব্যাসিডিওমাইসেটিস ( Basidiomycetes ) ও অপর শ্রেণীকে বলে অ্যাসকোমাইসেটিস ( Ascomycetes )। যাদের আমরা সাধারণতঃ চিতি বলি তারা ফাইকোমাইসেটিস, অ্যাসকোমাইসেটিস ও ফাঞ্জাই

* স্পোর শব্দটির বাংলা অনেক সময় করা হয় বীজগুটি।

banglainternet.com

ইস্পারফেকটিতে পড়ে। ব্যাসিড ও মাইসেটিসরা সাধারণতঃ অনেক বড়। যারা ছোট তারা অধিকাংশই পরজীবী। এদের সাধারণতঃ মোল্ড বা চিতি হিসাবে উল্লেখ করা হয় না। নীচে চিতির একটি শ্রেণী বিন্যাস প্রদান করা হেলা ঃ

**ক্ষুদ্র মৃতজীবী (sparophyte) ছত্রাক বা চিতি (mould)**

- হাইফা অবিভক্ত
  - ফাইকোমাইসেটিস
- হাইফা বিভক্ত
  - এসকোমাইসেটিস (যৌন-স্পোর এসকোস্পোর)
  - ফাঞ্জাই ইস্পারফেকটি (যৌন-স্পোর হয় না)

## চিতির দৃষ্টান্ত

ফাইকোমাইসেটিস শ্রেণীর চিতির সাধারণ উদাহরণ, (চিত্র ৬ ) ও মিউকর (Mucor) ও রাইজোপাস (Rhizopus)।

এসকোমাসেটিস শ্রেণীর সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা চলে অ্যাস-পারজিলাস ( Aspergillus ) ও পেনিসিলিয়াম ( Penicillium )।* ফাঞ্জাই ইস্পারফেকটি শ্রেণীর চিতির উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম (Cladosporium) ও অলটারনারিয়া (Alternaria) কথা (চিত্র ৭)।

মিউকর আর রাইজোপাস-এর মধ্যে পার্থক্য হল মিউকর-এর মাইসেলিয়াম যার উপর হয় তার গায়ে বিশেষভাবে লেগে থাকে, হাইফা থেকে শিকড়ের মত সরু সরু হাইফি যাকে বলা হয় রাইজয়েড ( rhizoid ) তা হয় না। কিন্তু, রাইজোপাসদের হয়। রাইজোপাস ও মিউকর উভয়ের ক্ষেত্রেই কিছু সংখ্যক হাইফি উপর দিকে উঁচু হয়ে ওঠে। এসব উলম্ব হাইফিদের বলা হয়

* সব অ্যাসপারজিলাস ও সব পেনিসিলিয়াম-এর ক্ষেত্রে এসকোস্পোর হবার কথা জানা নাই। তাই অনেক সময় এদের অনেক বইতে উল্লেখ করা হয় ফাঞ্জাই ইস্পারফেকটি বলে।

banglainternet.com



স্পোরেনজিওফোর (sporangiophore)। এদের মাথা ফুলে গোলাকার বলের মত হয়ে ওঠে এবং এর মধ্যে স্পোর তৈরি হয়। এই ফুলে ওঠা গোলাকার অঙ্গকে

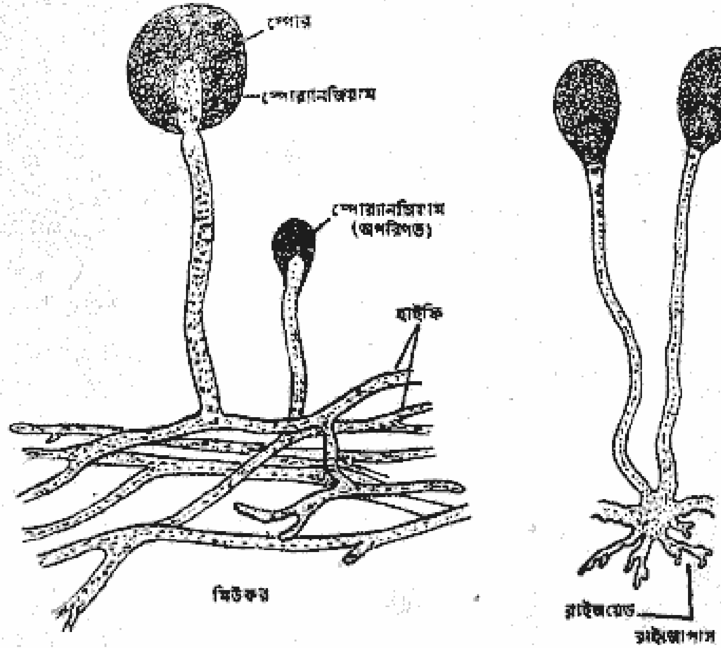


( ক ) ( খ )

রেখাচিত্র ৬ কঃ মিউর রেখাচিত্র ৬ খঃ রাইজোপাস

বলা হয় স্পোর‍্যানজিয়াম। মিউকর-এর ক্ষেত্রে স্পোর‍্যানজিওফোর মাইসেলিয়াম-এর যে কোন অংশ থেকে হতে পারে। কিন্তু রাইজোপাস-এর ক্ষেত্রে তার উদ্ভব হয় কেবলমাত্র যেসব জায়গায় রাইজয়েড আছে ঠিক সেখানে থেকে (চিত্র ৬ খ)।

ছত্রাকের অযৌন স্পোর, যা স্পোর‍্যানজিয়াম (sporangium)-এর মধ্যে হয় না তাদের বলা হয় কনিডিয়া [ conidia ; একবচনে কনিডিয়াম (conidium) ]। কনিডিয়া উল্লম্ব (erect) হাইফির মাথায় সৃষ্টি হয়। এসব হাইফির মাথায় একের পর এক কোষ-প্রাচীর সৃষ্টি হয়ে কনিডিয়ার উদ্ভব হয়। যেসব হাইফির মাথা থেকে কনিডিয়া হয় তাদের বলা হয় কনিডিওফোর (conidiophore)। অ্যাসপারজিলাস ও পেনিসিলিয়াম চেনা যায় তাদের বৈশিষ্ট্যসূচক কনিডিওফোর

থেকে। এসপারজিলাস-এর কনিডিওফোর-এর মাথা গোল হয়ে ফুলে ওঠে। এই ফুলে ওঠা মাথার উপর আবার খুব ছোট লম্বা সরু সরু হাইফির সৃষ্টি হয়। যাদের বলা হয় স্টেরিগমেটা। এসব স্টেরিগমেটার উপর কনিডিয়া সৃষ্টি

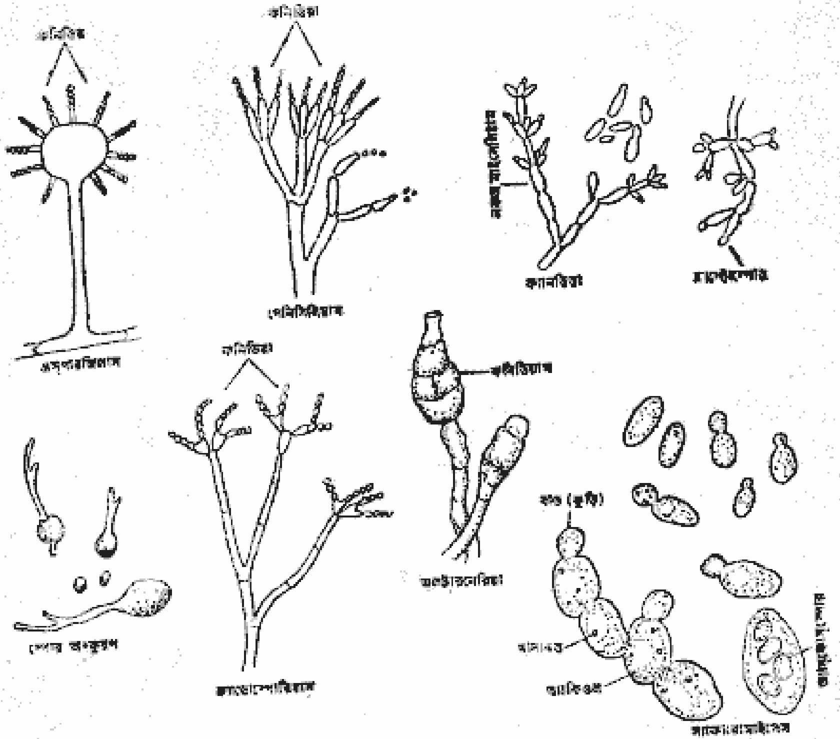

রেখাচিত্র ৭ঃ বিভিন্ন প্রজাতির চিতি, স্পোর-অংকুরণ ও খামির বা ঈস্ট।

হয় (চিত্র ৭) কিন্তু পেনিসিলিয়াম-এর ক্ষেত্রে এ রকম হয় না। পেনিসিলিয়াম-এর কনিডিওফোর তার আগার দিকে অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। আর এই প্রশাখার উপর কনিডিয়া সৃষ্টি হয় (চিত্র ৬)।

ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম ও অলটারনারিকেও তাদের স্পোরফোর ও কনিডিয়ার বৈশিষ্ট্য দিয়ে চেনা যায়। ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম-এর কনিডিয়া উপবৃত্তাকার। অলটারনারিয়ার কনিডিয়া অনেক বড় ও বিশেষ ধরনের উপবৃত্তাকার (muri-form)। এরা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত। কনিডিয়ার মধ্যে আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি কোষ-প্রাচীর থাকে চিত্র ৬)।

banglainternet.com



চিতিদের বর্ণনা ও সনাক্ত করা বেশ কঠিন কাজ, অনেক অভিজ্ঞতা লাগে। চিতিদের চিনবার জন্য তাদের হাইফা, স্পোরফোর ( sporophore ) অর্থাৎ স্পোরবাহী হাইফি, স্পোরের আকার-আকৃতি, কিভাবে গঠিত হয়, সজ্জিত থাকে, রঙ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত হতে হয়।

## চিতির দেহক্রিয়া

কোন চিতি তাদের সব খাদ্যবস্তু উৎপন্ন করতে পারে না। চিতিরা নানা প্রকার এনজাইম দ্বারা তাদের চারপাশের বস্তুতে পরিবর্তন ঘটায় ও তাদের থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। চিতির ক্রিয়ার ফলে সংঘটিত এসব পরিবর্তন আমাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে হয় ক্ষতিকর আবার অনেক সময় এই পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন দ্রব্য আমাদের জন্য হয় প্রয়োজনীয়। ব্যাকটিরিয়ার মত ছত্রাককেও কাজে লাগিয়ে অনেক অর্থকরী দ্রব্যের উৎপাদন করা চলে।

দেহ-ক্রিয়ার দিক থেকে ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হল ছত্রাক অনেক ঘন বস্তুর মধ্যে (যেমন ঘন চিনির রসের) মধ্যে হতে পারে। কিন্তু ব্যাকটিরিয়া সাধারণতঃ পারে না। তারা ছত্রাকের চাইতে কম আস্রবণ চাপ ( osmotic pressure ) সহ্য করতে পারে। আর একটি তফাৎ হল ব্যাকটিরিয়া সাধারণতঃ অম্লপ্রধান স্থান পছন্দ করে না। কিন্তু ছত্রাক সাধারণতঃ অম্লপ্রধান স্থানে হয়। ছত্রাক অম্লতা পছন্দ করে। ছত্রাক এমন কি pH ১ হতে পারে। অধিকাংশ ছত্রাক pH ৩ থেকে ৬ মধ্যে ভালভাবে বৃদ্ধি পায়। সব ছত্রাকই বায়ুজীবী (aerobic)। অধিকাংশ ছত্রাক ২৪° থেকে ৩০° সেন্টি-গ্রেড তাপমাত্রায় ভালভাবে হতে পারে। সবচেয়ে বেশী তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে মিউকর (৫০° সে.)। অনেক ছত্রাক আছে যারা খুব কম তাপমাত্রায়ও (০° সে.) হতে পারে। যেহেতু ছত্রাক অধিক মাত্রায় আস্রবণ চাপ সহ্য করতে পারে এবং অম্লতা পছন্দ করে, তাই যখন এদের আবাদ করবার প্রয়োজন হয় তখন যতদূর সম্ভব আবাদ মাধ্যমের (culture medium) ঘনতা বেশী ও pH কম রাখবার চেষ্টা করা হয়। কারণ এর ফলে ব্যাকটিরিয়া হতে পারে না।

## অ্যাকটিনোমাইসেটিস

আমরা ব্যাকটিরিয়া নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অ্যাকটিনোমাইটিস ( Actino-mycetes )-এর কথা উল্লেখ করেছি। অ্যাকটিনোমাইসেটিস-এর দেহও হাইফি

দিয়ে গঠিত। কিন্তু এই হাইফিরা ব্যাসে (diameter) অনেক ছোট। ছত্রাকদের হাইফি যেখানে ব্যাসে ৫ থেকে ১৫ মাইক্রন-এর মত, সেখানে অ্যাকটিনোমাইসিস-এর হাইফার ব্যাস ০'৩ থেকে ১'২ মাইক্রন (মিউ)-এর বেশী হয় না। এই হাইফি ভেঙ্গে ব্যাকটিরিয়াদের মত ছোট ছোট কোষে পরিণত হতে পারে। এদের তখন দেখে মনে হয় ব্যাকটিরিয়া। অবশ্য অনেক ছত্রাকের হাইফিও এভাবে ভেঙ্গে গোলাকৃতি অথবা দণ্ডাকৃতি কোষ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এইসব কোষকে বলা হয় আরথ্রোস্পোর ( arthrospore ) অথবা অয়িডিয়া [oidia; একবচনে অয়িডিয়াম, (oidium) ]। কিন্তু যেহেতু এদের দেহ-প্রাচীরে উপাদান ব্যাকটিরিয়ার সাথে মেলে, এবং যেহেতু এরা প্রক্যারিওটিক তাই এদেরকে অনেকে বর্ণনা করেন ব্যাকটিরিয়া হিসাবে।* কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে এদের যখন খাদ্য-মাধ্যমে উৎপাদন করা হয় তখন এদের উপনিবেশ দেখে বোঝা যায় না এরা ছত্রাকদের থেকে আলাদা। এদের অনেকেই কনিডিয়ার দ্বারা বংশ বিস্তার করে, এদের মধ্যে একদলের স্পোর স্পোর‍্যানজিয়ামের মধ্যে হয়। তাই বাস্তব দিক থেকে এদের চিতিদের সাথে একত্র করে বিচার করাই ভাল।

অ্যাকটিনোমাসিসদের নূতনভাবে এখন শ্রেণী বিভাগ করেছেন ওয়াকসম্যান ও হেনরিসি (Waksman ও Henrici)। যেসব অ্যাকটিনোমাইসেটিস মাটিতে থাকে এবং যাদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী তাদের এরা একটি নূতন পরিবারে ফেলেছেন। এই পরিবারকে বলা হয় স্ট্রেপটোমাইসেটেসি (Streptomycetaceae)। এই পরিবারের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকটিনোমাইসেটিসদের ফেলা হয় স্ট্রেপটোমাইজেস (Streptomyces) গণ (চিত্র ৮)।

অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়ার মত অধিকাংশ অ্যাকটিনোমাইসেটিস ক্ষার-প্রধান ( alkaline ) মাধ্যম পছন্দ করে।** ব্যাকটিরিয়া থেকে তাই এদের পৃথক করতে অনেক সময় বেগ পেতে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ আবাদ মাধ্যমে পুষ্টি (nutrient) কম থাকলে, তাতে ব্যাকটিরিয়ার চাইতে অ্যাকটিনোমাইসেটিস

* ছত্রাকরা ইউক্যারিওটিক। কিন্তু এসব কোষকেন্দ্র বিভক্ত হবার পদ্ধতি মাইটোটিক নয়। এরা বিভক্ত হয় সরাসরি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে।

** মাটিতে কিছু অ্যাকটিনোমাইসেটিস আছে যারা অত্যন্ত অম্ল-প্রধান অবস্থাতেও বৃদ্ধি পেতে পারে। এবং pH ৪-২-এর কাছাকাছি ভালভাবে বৃদ্ধি পেতে ও বংশবিস্তার করতে পারে।

banglainternet.com



ভাল হয়, এবং অ্যাকটিনোমাইসিস পৃথক করা সহজ হয়। অ্যাকটিনোমাইসেটিস-এর মাইসিলিয়াম মাধ্যমের উপর অনেক সময় এত শক্ত হয়ে জমে থাকে যে ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার মত তাদের সহজে স্থানান্তরিত করা যায় না। প্রায়ই তাদের স্প্যাচুর সাহায্যে কেটে স্থানান্তরিত করতে হয়। ব্যাকটিরিয়া ও অ্যাকটিনোমাইসেটিসকে একই প্রকার রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে রঞ্জিত করে দেখা চলে। যেহেতু অ্যাকটিনোমাইসেটিস-এর হাইফিরা খুব সরু সরু। তাই তাদের দেখতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় ১০০০ গুণ বড় করে দেখতে হয়। দেখবার সময় নিডল দিয়ে ভাল করে ছড়িয়ে নিতে হয়।

### চিতি সনাক্তকরণ ব্যাখ্যা

১। মাইসেলিয়াম তরুণ অবস্থায় বিভক্ত থাকে না (aseptate)। স্পোর‍্যানজিয়া (sporangia) উৎপন্ন হয়।

(ক) স্টোলন (stolons) থাকে। স্টোলনের গিট থেকে স্পোর‍্যানজিওফোর (sporangiophores) উত্থিত হয়।

—রাইজোপাস (Rhizopus)

(খ) স্টোলন থাকে না। জায়গোস্পোর (Zygospors) উৎপাদন করে।

—মিউকর (Mucor)

২। মাইসেলিয়াম আড়াআড়ি প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত (septate)। কৃষ্ণকায়। কোনিডিয়া ( condia ) সৃষ্টি করে। কনিডিয়া ২ বা তার অধিক কোষে বিভক্ত।

(ক) পরিণত কনিডিয়া ২-কোষী।

—ক্ল্যাডো স্পোরিয়াম (cladosporium)

(খ) কনিডিয়া দুয়ের অধিক কোষ বিশিষ্ট। মিউরিফর্ম (Muriform)।

—অলটারনেরিয়া (Alternaria)।

৩। মাইসেলিয়াম বিভক্ত। সাদা অথবা উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত। এক কোষী কনিডিয়া উৎপাদন করে।

(ক) কনিডিয়া দলবদ্ধভাবে থাকে। মালার আকারে সজ্জিত নয়।

—ট্রাইকোডারমা (Trichoderma)।

(খ) কনিডিয়া মালার আকারে সজ্জিত (conidia in chains)।

(খ১) কনিডিওফোর ( conidiophores ) শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত নয়। কনিডিয়ার মাথা বিশেষভাবে ফুলে ওঠে (vesicle)। ফুলে ওঠা মাথায় স্টেরিগমেটার (sterigmeta) উপর কনিডিয়া (conidia) উৎপন্ন হয়।
—অ্যাসপারজিলাস (Aspergilius)

(খ২) কনিডিওফোর মাথার দিকে একাটিক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। কনিডিয়া শাখার স্টেরিন মেটাতে মালার আকারে উৎপন্ন হয়।
—পেনিসিলিয়াম (Penicilium)

৪। মাইসেলিয়াম ভেঙ্গে কনিডিয়া বা অয়িডিয়া (oidia) উৎপন্ন হয়।
—অয়িডিয়াম (Oidium)।

একবিংশ অধ্যায়

# ঈস্ট বা খামির

## দেহ-সংগঠন

ঈস্ট বা খামির-রা এককোষী। এদের কোষ গোলাকার অথবা অর্ধবৃত্তাকার হয়ে থাকে।* আয়তনে এরা ব্যাকটিরিয়া থেকে অনেক বড়। ব্যাকরিয়ামদের দৈর্ঘ্য গড়-পড়তায় ৪ মাইক্রোমিটার থেকে ছোট, সেখানে খামির-কোষ ৫ থেকে ১৫ মাইক্রোমিটার মত হয়ে থাকে। কেবল আকারের দিক থেকে খামির যে ব্যাকটিরিয়ামদের থেকে বড় তা নয়, এদের কোষ-প্রাচীরের উপাদানও আলাদা।! খামির-এর কোষ-প্রাচীরের দুইটি স্তর থাকে। এরা গ্লুকান (glucan) ও ম্যানান (manan) এবং সামান্য পরিমাণ প্রোটিন স্নেহ, গ্লাইকোজেন ও ধাতব পদার্থের সমবায়ে গঠিত। ইস্টের কোষের কোষকেন্দ্র আছে কি নেই তা নিয়ে এখন মত-পার্থক্য আছে। তরুণ ইস্টকোষে প্রোটপ্লাজম সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে। কিন্তু পুরাতন কোষে এক অথবা একাধিক ভ্যাকুওল (vacuole) থাকতে পারে। অধিকাংশ ঈস্টকোষের মধ্যভাগে একটা করে বিরাট ভ্যাকুওল বা জলীয় পদার্থপূর্ণ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ স্থানের সৃষ্টি হয়।

## প্রজনন

উপযুক্ত অবস্থায় ঈস্ট-রা বাডিং বা কলিকা-পদ্ধতিতে (চিত্র ৬) বিভক্ত হয়। ঈস্ট-কোষের একদিকে অথবা একাধিক দিকে সামান্য কিছু অংশ ফুলে উঠে। ক্রমশঃ এই ফুলে উঠা অংশ (কুঁড়ি) আকারে বাড়তে থাকে ও গোড়ার দিকে চিকন হয়ে ধীরে ধীরে আগের কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক সময় অনেকগুলি তরুণ ঈস্ট-কোষ পর পর সৃষ্টি হয়ে মাতৃকোষের (আগের ঈস্ট) গায়ে লেগে থাকতে পারে। এইভাবে যে লম্বা কোষমালার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় সিউডোমাইসেলিয়াম (pseudomycelium) (চিত্র ৬)। ঈস্টরা অক্সিজেন এর উপস্থিতিতে ভালভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু অক্সিজেন ছাড়াও এরা বাঁচতে পারে জৈব অণুদের গাঁজিয়ে।

* গাঁজন ঘটায় বলে খামিরকে গাঁজ বলেও অনেক সময় উল্লেখ করা হয়। খামির শব্দটা আরবী খামর শব্দ থেকে। খামর মানে মদ। আরবরা খেজুর গাঁজিয়ে মদ বানায়।

banglainternet.com

## ঈস্টের গুরুত্ব

সাধারণতঃ ফলের রসে, গাছের রসে প্রচুর খামির দেখতে পাওয়া যায় তাল ও খেজুরের রসে বা তাড়িতে একাধিক প্রজাতির খামির মিশ্র অবস্থায় থাকে। এইসব খামির চিনির অণুকে তাদের এনজাইমের সাহায্যে ভেঙ্গে অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড-এ পরিণত করে। পাউরুটি বানাবার সময় ময়দার মধ্যে তাল বা খেজুরের রস দেওয়া হয়।* কারণ ময়দার মধ্যে খামির যখন তাল অথবা খেজুর রসের চিনিকে ভেঙ্গে গ্যাস উৎপাদন করতে থাকে, তখন সেই গ্যাস উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই উপরের দিকে উঠবার সময় রুটি ফুলে ওঠে ও ভিতরে ফাঁপা হয়। যে ঈস্ট রুটি তৈরি ও অ্যালকোহল তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে প্রচুর ভাইটামিন বি (B) থাকে, যা রুটিতে খাদ্য-প্রাণ (vitamin) যোগ করে। এছাড়া খামিরকে কাজে লাগিয়ে অ্যালকোহল, উৎকৃষ্ট মদিরা, খাদ্য-প্রাণ ও বিভিন্ন প্রকার এনজাইম যথা ল্যাকটেজ, ইনভার্টেজ ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। তাই খামির-এর অর্থনৈতিক মূল্য খুবই বেশী।

## ঈস্টের শ্রেণীবিভাগ

উদ্ভিদবিদরা খামিরকে সাধারণতঃ ছত্রাকের দলে ফেলেন। এর কারণ অনেক ছত্রাককে যদি গাঢ় চিনির রসের মধ্যে রাখা যায় তবে তাদের হাইফা ভেঙ্গে খামিরের মত কোষে পরিণত হয় ও তারা তখন কলিকা পদ্ধতিতে বিভক্ত হতে থাকে।

যেমন মিউকরকে যদি চিনির রসের মধ্যে দেওয়া যায় তবে তার হাইফিরা ভেঙ্গে খামিরের মত কোষে পরিণত হয়। গাছের রোগ উৎপাদক ছত্রক আসটিলাগো (Ustilago) ও টাফরিনা যখন গাছের মধ্যে হয় তখন তার হাইফিরা ঠিক থাকে। কিন্তু চিনির রসে ও কৃত্রিম মাধ্যমে যখন তাদের আবাদ করতে যাওয়া হয় তখন তা হয়ে ওঠে খামিরের অনুরূপ। এই ঘটনাটিকে বলা হয় দ্বিরূপতা বা ডাইমরফিজম (dimorphism)। বহু কিছুর উপর ডাইমরফিজম নির্ভর করে; যেমন আবাদ মাধ্যমে (culture medium) চিনির পরিমাণ উত্তাপ মাত্রা ইত্যাদি। অনেক ছত্রাকের ক্ষেত্র মাধ্যমে সামান্য কর্পূর যোগ করলে তা পরিণত হয় ঈস্টের মত কোষে। আবার অনেক ছত্রাকের ক্ষেত্রে উল্টোটা

* এই ধরনের রুটি বানাবার পদ্ধতি সম্ভবতঃ পর্তুগীজরা আমাদের দেশে প্রচলন করেন। পর্তুগীজ ভাষায় পাউ মানে রুটি।

banglainternet.com



ঘটতে দেখা যায়। এরা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এককোষী। কিন্তু কৃত্রিম মাধ্যমে হাইফি সৃষ্টি করে।

ঈস্ট সাধারণতঃ কলিকা-পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। কিন্তু অনেক ঈস্ট বিশেষ ধরনের স্পোর, যাকে বলা হয় অ্যাসকোস্পোর (ascospore), তা সৃষ্টি করতে পারে। অ্যাসকোস্পোর সৃষ্টি হবার আগে দুটি ঈস্ট কোষে মিলন ঘটে। অবশ্য মিলন ঘটার পরেই যে অ্যাসকোস্পোর সৃষ্টি হয় তা নয়। অনেক পরেও অ্যাসকোস্পোর সৃষ্টি হতে পারে। কিছু সংখ্যক ঈস্ট ব্যাকটিরিয়ামদের মত মাঝখানে আড়াআড়িভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়ে অর্থাৎ দ্বিভাজন (binarry fission) পদ্ধতির সাহায্যে বংশবিস্তার করে। এসব ঈস্টের ক্ষেত্রেও অ্যাসকোস্পোর হবার কথা জানা আছে।

সাধারণ খামির-এর মধ্যে সাধারণতঃ চারটে করে অ্যাসকোস্পোর তৈরি হয়। কিন্তু যে-সব ঈস্ট দ্বিভাগ পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়, যাদের সাধারণতঃ বলা হয় দ্বিভাজন ঈস্ট ( fission yeast ), তাদের ক্ষেত্রে অ্যাসকোস্পোর-এর সংখ্যা হল আট।

যে সব ঈস্টের মধ্যে অ্যাসকোস্পোর হয় তাদের শ্রেণীবদ্ধ করা হয় অ্যাসকোমাইসেটিস শ্রেণীতে। ঈস্ট বলতে সাধারণতঃ এদেরই বোঝায়। এদের সবাইকে একটি পরিবার, এন্ডোমাইসেটেসি ( endomycetaceae ) পরিবারে সাজান হয়।

অ্যাসকোস্পোর সৃষ্টিকারী ঈস্ট, সাধারণ অবস্থায় কলিকা-পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে ও যৌনভাবে অ্যাসকোস্পোর উৎপাদন করে। এদের বলা হয় আসল ঈস্ট। আসল ঈস্ট-এর সবচাইতে পরিচিত দুটি প্রজাতি হল :

**স্যাকারোমাইসেস সিরিভিসি** (Saccaromyces cereviciae) **এবং স্যাকারোমাইসেস ইলিপজইডিআস** ( S. ellipsoideus)। বিদেশে রুটি তৈরির কাজে প্রথম ঈস্টটিকে ব্যবহার করা হয় এবং তাই একে সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় রুটির ঈস্ট (bread yeast) বলে। দ্বিতীয় প্রজাতির ঈস্টকে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের মদিরা প্রস্তুতের জন্য। তাই একে বলে মদিরা-ঈস্ট (wine yeast)।

দ্বিভাজন ঈস্টের পরিচিত দৃষ্টান্ত হল, সাইজোস্যাকারোমাইসেস অক্টোস্পোরাস (Schizosaccharomyces octosporus)। এরা ফলের রসের মধ্যে থাকে। কিন্তু এরা মানুষের কোন কাজে আসে না।

সাধারণতঃ ঈস্ট বলতে আসল ঈস্টদেরই (Saccharomyces) বোঝায়। কিন্তু শিল্প-জীবাণুতত্ত্বের ক্ষেত্রে আসল ঈস্ট ছাড়াও আরো অনেক জীবাণুকে ঈস্ট নামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যাদের আসল ঈস্টের সাথে সাদৃশ্য থাকবার জন্য সাধারণতঃ আসল ঈস্টদের সাথে একত্রে আলোচনা করা হয় তাদের দুইটি পরিবারে বিভক্ত করা হয়ঃ **স্পোরবোলমাইসেটেসি** (Sporobolomycetaceae) ও **ক্রীপটোককেসী** (Cryptococcaceae)। প্রথম পরিবারের বৈশিষ্ট্য হল, এদের সৃষ্ট কুঁড়ি বা বাড (bud) সৃষ্টি হবার আগে কোষের এক পাশে একটি সরু অংশ লম্বা হয়ে ওঠে ও একটা সরু হাইফা সৃষ্টি হয়। এই হাইফার মাথা ফুলে উঠে একটি কুঁড়ি বা বাড-এর উদ্ভব হয়। এই কুঁড়িটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হবার সাথে সাথে মাতৃদেহ থেকে জোরে ছিটকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদের সাথে ব্যাসিডোমাইসেটিস শ্রেণীর ছত্রকের মিল আছে। তাই সাধারণতঃ এদের বলা হয় ব্যাসিডিও মাইসেটিস ঈস্ট। কিন্তু এদের অর্থনৈতিক কোন গুরুত্ব নেই। আর সংখ্যাতেও এরা বেশী নয়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে, ক্রীপটোককেসি পরিবারের ঈস্টদের গুরুত্ব খুবই বেশী। এদের মনে করা হয় অ্যাসকোমাইসেটিস ঈস্ট-এর সমগোত্রীয় বলে। তবে এদের সাধারণতঃ আলোচনা করা হয় ফাঞ্জাই ইম্পারফেকটি শ্রেণীর ছত্রাক রূপে। মনে করা হয়, এরা অ্যাস্কোস্পোর সৃষ্টির ক্ষমতা হারিয়ে অপূর্ণ (imperfect) ছত্রাকে পরিণত হয়েছে।

অপরিণত ঈস্টদের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গণ হল ক্যান্ডিডা (Candida)। এই গণে তিরিশটি প্রজাতি (species) ও ছয়টি প্রকার (variety) পড়ে। এদের মধ্যে অনেকে মানুষ ও প্রাণীদের রোগ উৎপাদক। এদের মধ্যে অনেকে আছে যারা কেবল বাতাসের মুক্ত অক্সিজেনের সাহায্যে বেঁচে থাকতে পারে। গাঁজন প্রক্রিয়ার (fermentaion) সাহায্যে প্রয়োজনীয় শক্তি লাভ করতে পারে না। মানুষের গায়ে যে দাদ হয় তা এই গণের ছত্রাকের জন্য। এই গণের অনেক ছত্রাক মাটিতে এবং ফল ও বীজের গায়ে মৃতজীবী হিসাবে বাঁচে। ক্যান্ডিডা গণের খামিররা কলিকা-পদ্ধতিতে (budding) বংশ বিস্তার করে ও নকল মাইসেলিয়াম (pseudomycelium) সৃষ্টি করে। অনেকে উপযুক্ত অবস্থায় আসল মাইসেলিয়ামও সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু বংশবিস্তার করে কলিকা-পদ্ধতিতে। এরা কলিকা-পদ্ধতিতে যে স্পোর উৎপন্ন করে, তাকে বলা হয় ব্লাস্টোস্পোর (blastospores) (চিত্র ৬)। যেসব



ঈস্টকে এখন মানুষ ও জন্তুর খাদ্য হিসাবে উৎপাদন করে খাদ্য-সমস্যা সমাধানের বিশেষ চেষ্টা চলেছে, তারা সবাই অপরিণত ঈস্ট। যাকে বলা হয় খাদ্য-খামির বা ফুড-ঈস্ট (food yeast) তার নাম হল ক্যান্ডিডা ইউটিলিস (Candida utilis) (চিত্র ৭)। বর্তমানে ক্যান্ডিডা লাইপোলাইটিকা (C. lypolitica) নামক অপর আর একটি প্রজাতির ঈস্টকেও মানুষের ও জন্তুর খাদ্য হিসাবে সস্তায় উৎপাদনের চেষ্টা চলেছে। এরা প্যারাফিনের মধ্যে হতে পারে। পেট্রোলিয়াম শোধনের পর যে প্যারাফিন থাকে তার মধ্যে এদের উৎপাদন সম্ভব।

### ঈস্ট সনাক্তকরণ

ব্যাকটিরিয়ার মত ঈস্টদেরও কেবলমাত্র দেহের আকার ও আকৃতি দিয়ে সনাক্ত করা যায় না। এদের সনাক্ত বা চিনবার জন্য বিভিন্ন প্রকার শর্করা পদার্থকে গাঁজিয়ে (ferment) দেখতে হয়। ঈস্টদের সনাক্ত করবার জন্য ব্যাকটিরিয়ামদের মত প্রথমে খাদ্য-মাধ্যমে উপনিবেশের (colony) চরিত্র বিচার করতে হয়। তারপর কোষের আকার ও আকৃতি এবং আস্কোস্পোর সৃষ্টি হচ্ছে কিনা বা হলে কিভাবে হচ্ছে তার অনুসন্ধান করতে হয়। তারপর দেখতে হয় গাঁজন-প্রক্রিয়া কি ধরনের। কি কি চিনিকে ঈস্টটি গাঁজাতে পারছে।

অধিকাংশ ছত্রাকের মত খামির অম্ল-প্রধান মাধ্যম পছন্দ করে, অনেক সময় তাই অন্য ছত্রাক থেকে খামির পৃথক করতে অসুবিধা দেখা দেয়। তবে যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে খামির তরল মাধ্যমের নীচের দিকে হয় এবং ছত্রাক হয় উপর দিকে, তাই সরু ক্যাপিলারি টিউব-এর সাহায্যে নীচে থেকে খামিরকে উঠিয়ে নেওয়া যায়।

আমরা নীচে খামিরের শ্রেণীবিভাগ বুঝবার সুবিধার জন্য একটা খুব সংক্ষিপ্ত ছক প্রদান করছিঃ

**খামির**

| | | | |
|---|---|---|---|
| শ্রেণীঃ | অ্যাসকোমাইসেটিস | ফাঞ্জাই ইম্পারফেকটি | ব্যাসিডোমাইসেটিস |
| পরিবারঃ | এন্ডোমাইসেটিস | ক্রীপটোককেসি | স্পোরোবোলমাইসেটিস |
| গুরুত্বপূর্ণ গণঃ | স্যাকারোমাইসেস | ক্যান্ডিডা | স্পোরোবোলমাইসেস |



banglainternet.com

### দ্বাবিংশ অধ্যায়

# কিমোথেরাপী

কিমোথেরাপী (Chemotherapy) কথাটা প্রথম ব্যবহার করেন জার্মান চিকিৎসক এহ্‌রলিখ (Ehrlich)। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন মানুষের তৈরি রাসায়নিক যৌগের সাহায্যে রোগ জীবাণুদের মানুষের শরীরের মধ্যে মানুষের কোন ক্ষতি না করে মেরে ফেলা বোঝাতে। তিনি ৬০৬ ছয় বার চেষ্টা করে ১৯১০ সালে সিফিলিস রোগের প্রথম ওষুধ সালভারসান (salvarsan) আবিষ্কার করেন। এ ছিল এক বিরাট ধৈর্যের পরীক্ষা। সালভারসান হল এক প্রকার আর্সেনিক ঘটিত জৈব যৌগ। যা মানুষের দেহে সিফিলিস ( syphilis )-এর জীবাণুকে (Treponema pallidum) মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু মানুষের ক্ষতি করে না। এরপরে আবিষ্কৃত হয় গন্ধক ঘটিত বিশেষ ধরনের ওষুধ, যাদের একত্রে বলা হয় সালফোনামাইড (sulphonamide)। সালফোনামাইড-এর পরে আবিষ্কৃত হয় বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবায়োটি (antibiotic)। সমগ্র ওষুধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ফলে ঘটে বিরাট বিপ্লব। অনেক ভয়াবহ ব্যাধিই হয়ে ওঠে চিকিৎসার যোগ্য। কিমোথেরাপী বলতে বোঝাতে থাকে সুনির্দিষ্ট যৌগের সাহায্যে রোগজীবাণু ধ্বংসের মাধ্যমে রোগ মুক্তি।

## সালফোনামাইড

সালফোমানাইড (sulphonamides) হল বিশেষ ধরনের জৈব যৌগ। এদের সবার মধ্যেই থাকে সালফোনামাইড জোট ($SO_2NH_2$) অথবা এই জোট জাত দ্রব্য। সালফোনামাইডদের মধ্যে প্রথম আবিষ্কৃত ওষুধের সাধারণ নাম হল প্রন্টোসিল (prontosil) প্রন্টোসিল একপ্রকার রঞ্জক দ্রব্য। যা লাগিয়ে রঙ করে ব্যাকটীরিয়া দেখা হত। প্রন্টোসিল সাধারণভাবে ব্যাকটীরিয়ার কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু প্রন্টোসিল মানুষের শরীরে ওষুধ হিসাবে কাজ করে। কারণ, প্রন্টোসিল -এর একাংশ মানুষের শরীরে রূপান্তরিত হয় সালফানিলামাইড-এ (sulphanilamide) নামক বস্তুতে। সালফানিলামাইডের জন্য অনেক রোগ উৎপাদক ব্যাকটীরিয়া বৃদ্ধি পেতে অর্থাৎ বিভক্ত হয়ে সংখ্যায় বাড়তে পারে না। এরকম বস্তুকে বলা হয় ব্যাকটীরিও স্ট্যাটিক (bacterio static) বা ব্যাকটীরিয়া নিষ্ক্রিয়কারক। প্রন্টোসিল আবিষ্কার করেন, জার্মান ওষুধ প্রস্তুতকারক ডোমাগ্‌ক্



(Domagk), ১৯৩৫ সালে। এরপর থেকে বহুবিধ সালফোনামাইড বিভাগের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়। বিভিন্ন সালফোনামাইড রাসায়নিক উপায়ে অনেক সহজেই প্রস্তুত করা চলতে পারে।

সালফোনিলামাইড ব্যাকটীরিয়া দেহে অ্যান্টিভিটামিন বা ভিটামিন বিরোধী হিসাবে কাজ করে। অনেক ব্যাকটীরিয়া তাদের দেহে পারা-অ্যামাইনোবেনজোয়িক (P-aminobenzoic) অ্যাসিড থেকে ফলিক অ্যাসিড উৎপাদন করে। সালফানিলামাইড ও পারা-অ্যামাইনোবেনজয়িক অ্যাসিড (PABA)-এর রাসায়নিক আকৃতি প্রায় একই ধরনের,

পারা-অ্যামাইনোবেনজয়িক অ্যাসিড (PABA)

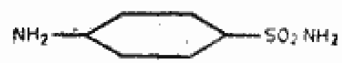


সালফানিলামাইড

যে এনজাইমের সাহায্যে ব্যাকটীরিয়া PABA থেকে ফলিক অ্যাসিড উৎপাদন করে সালফানিলামাইড অণুগুলি তার গায়ে লেগে যায়। এভাবে সালফানিলামাইড অণুগুলি এনজাইম অণুর বিশেষ জায়গায় লেগে যাবার ফলে সেই একই স্থানে PABA অণুগুলি যুক্ত হতে পারে না। ফলে PABA ফলিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হতে পারে না। ফলিক অ্যাসিড একটি ভাইটামিন। মানুষও ফলিক অ্যাসিড প্রয়োজন বোধ করে। কিন্তু মানুষ ফলিক অ্যাসিড গ্রহণ করে বাইরে থেকে। টাটকা শাক-সব্জি ও ফল মূল থেকে। কিন্তু ব্যাকটীরিয়া ফলিক অ্যাসিডের বাইরে থেকে গ্রহণ করতে পারে না। তাকে ফলিক অ্যাসিড প্রস্তুত করতে হয় নিজ দেহে, PABA থেকে। অন্যদিকে মানুষের ক্ষেত্রে PABA-এর কোন ভূমিকা নেই। তাই সালফানিলামাইড ব্যাকটীরিয়ার ক্ষতি করলেও মানুষের জন্য ক্ষতিকারক নয়।

## অ্যান্টিবায়োটিক

অ্যান্টিবায়োটিক ( Antibiotic ) ঠিক মানুষের উৎপাদিত রাসায়নিক বস্তু নয়। অ্যান্টিবায়োটিক জটিল জৈব যৌগ। এদের পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক (Mould), অ্যাকটিনোমাইসেটিস (Actinomycetes) এবং ব্যাকটিরিয়া থেকে, যারা প্রধানতঃ মৃত্তিকার বাসিন্দা। অ্যান্টিবায়োটিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ওয়াক্সমান বলেছেন, কোন জীবাণু দেহ থেকে নিঃসৃত জটিল জৈব

banglainternet.com

বস্তু (complex organic compoumd) যা তার নিজের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু খুব লঘু মাত্রাতেই অন্য কোন জীবাণু অথবা জীবাণুসমূহের ক্ষতি করতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক অনেক আছে। কিন্তু সব অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করা যায় না। কারণ, তারা কেবল রোগ জীবাণুদের মেরে ফেলে না, মানুষেরও ক্ষতিসাধন করে। কেবলমাত্র সেইসব অ্যান্টিবায়োটিককেই মানুষের রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে, যারা মানুষের শরীরে কোন রোগ জীবাণুকে মেরে ফেলতে অথবা বৃদ্ধি বন্ধ করে দিতে সক্ষম, কিন্তু মানুষের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। এ পর্যন্ত মাত্র কতিপয় অ্যান্টিবায়োটিককে মানুষের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।*

আলোচনার সুবিধার জন্য অ্যান্টিবায়োটিককে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি :

ক। চিতি (Mould) জাত;

খ। অ্যাকটিনোমাইসেটিস জাত এবং

গ। ব্যাকটিরিয়া জাত।

## ক। চিতিজাত অ্যান্টিবায়োটিক

**পেনিসিলিন :** সবচেয়ে সফল এবং মানুষের রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক হল পেনিসিলিন। পেনিসিলিন অনেক রকম হতে পারে। এদের মধ্যে পেনিসিলিন 'g' এখন রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। পেনিসিলিন এক প্রকার জটিল জৈব অম্ল (complex organic acid)। বিভিন্ন প্রকার পেনিসিলিনের মধ্যে পার্থক্য হল তার 'R' জোটের (group) জন্য। পেনিসিলিন g-র রাসায়নিক সংকেত হল :

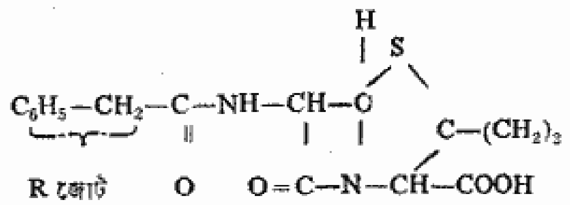

* এ পর্যন্ত ৩০০০-এর উপর অ্যান্টিবায়োটিকের কথা জানা আছে। কিন্তু মাত্র এদের কয়েকটিকেই মানুষের রোগ চিকিৎসায় প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়েছে।

banglainternet.com



পেনিসিলিন g পাওয়া যায়, পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম (Penicillium chrysogenum) নামক চিতি থেকে। এই চিতি প্রথম চষা জমি থেকে আমেরিকায় পৃথক করা হয়েছিল।

কিন্তু যে পেনিসিলিন রোগ নিরাময়ের কাজে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল তা প্রস্তুত করা হত পেনিসিলিয়াম নোটাটাম (Penicillium notatum) নামক ছত্রাকের সাহায্যে। এর থেকে প্রাপ্ত পেনিসিলিন R জোট হচ্ছে, $CH_2CH_2CH = CHCH_2$। যেহেতু পেনিসিলিন অম্ল বস্তু (acid) তাই পেনিসিলিন এর একাধিক লবণ প্রস্তুত সম্ভব। সাধারণতঃ এখন চিকিৎসার কাজে পেনিসিলিনের পটাসিয়ামলবণ (Potassium salt) ও প্রোকেন লবণ (Procane salt) ব্যবহার করা হয়।

পেনিসিলন সাধারণতঃ পুরু কোষ প্রাচীরযুক্ত গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটিরিয়ার উপর কার্যকর। পেনিসিলিন গনোরিয়ার জীবাণু ( যা গ্রাম-নেগেটিভ ) এবং সিফিলিসের জীবাণুর উপরও বিশেষভাবে কার্যকর।

পেনিসিলিন প্রথম সফল অ্যান্টিবায়োটিক। কিন্তু পেনিসিলিনই সর্বপ্রথম অ্যান্টিবায়োটিক নয়। এর আগে অন্য একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে গবেষণা হয়েছিল। এক জীবাণুর সাহায্যে অন্য জীবাণু মেরে ফেলে রোগ চিকিৎসার সম্ভাব্যতার কথা বলেন পাস্তুর (১৮৮৭)। তিনি লক্ষ্য করেন অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণুকে প্রোটিন পচক জীবাণুদের সঙ্গে মিশ্রভাবে আবাদ করলে, তারা সহজেই মরে যেতে থাকে। দু'জন জার্মান চিকিৎসক এমারিখ (Emmerich) ও লো (Loew), প্রথম ১৮৯৯ সালে ব্যাকটিরিয়াজাত একটি অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের রোগ চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস সাফল্য লাভ করে না। ১৯২৮ সালে বিলাতে আলেকজেন্ডার ফ্লেমিং (Alexender Fleming) প্রথম লক্ষ্য করেন, পেনিসিলিয়াম নোটাটাম এর জীবাণু মেরে ফেলার ক্ষমতা। ১৯৩৯ কাছাকাছি বিলাতে চেন (Chain) ও ফ্লোরি ( Florey ) আবিষ্কার করেন, পেনিসিলিয়াম নোটাটাম থেকে পেনিসিলিন উৎপাদনের প্রথম উপায়। এ সময় জার্মানির সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের প্রাণ বাঁচাবার প্রয়োজনে পেনিসিলিন বিপুলভাবে সহায়তা করতে পারে বলে, পেনিসিলিন নিয়ে সে সময় বিশেষ গবেষণা করা হয়। পেনিসিলিনের বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্ভব হয়

প্রথম আমেরিকায়। ফ্লোরি ও চেন যান আমেরিকায়। সেখানে তারা আমেরিকান ওষুধ কম্পানির সহায়তায় পেনিসিলিনের ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব করে তুলতে পারেন।

পেনিসিলিনের কার্যকর অংশ হচ্ছে ৬-অ্যামিনো পেনিসিল্যানিক অ্যাসিড ( 6-amino penicillanic acid, সংক্ষেপে 6-APA )। এর সঙ্গে রাসায়নিক উপায়ে বিভিন্ন পার্শ্ব জোট (side chain) যোগ করে একাধিক আধা সংশ্লেষিত ( semi-synthetic ) অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করা সম্ভব। এমনি একটি আধা সংশ্লেষিত পেনিসিলিন হল অ্যাম্পিসিলিন (ampicillin)।

**সেফালোস্পোরিন ঃ** অ্যান্টিবায়োটিক সেফালোস্পোরিন (cephalosporin) পাওয়া যায় সেফালোস্পোরিয়াম স্যালমোসিনেম্যাটাম ( Cephalosporium salmosynnematum) নামক চিতি থেকে। এই অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিনের নিকট সম্বন্ধীয়। সেফালোস্পোরিন একরকম জটিল জৈব অম্ল। এর কার্যকর অংশ হল ৭-অ্যামাইনো সেফালোস্পোরিক অ্যাসিড ( 7-amino cephalosporic acid, সংক্ষেপে 7-ACA )। সেফালোস্পোরিন যেসব ব্যাকটিরিয়ার উপর পেনিসিলিন কার্যকর নয়, তাদের উপর সক্রিয়। সেফালোস্পোরিন পেনিসিলিন প্রতিরোধক ( penicillin resistant ) ব্যাকটিরিয়াদের মেরে ফেলতে পারে। বিশেষ করে পেনিসিলিন রোধী স্ট্যাফাইলোকক্কাই ( staphylococci)-কে। সেফালোস্পোরিনের কোন ক্ষতিকর পার্শ্বক্রিয়া নেই। কিন্তু সাধারণ সেফালোস্পোরিন পেনিসিলিনের চাইতে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। বর্তমানে একাধিক প্রকার আধা সংশ্লেষিত সেফালোস্পোরিন উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। এদের অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় প্রয়োগ করেই ফল পাওয়া যায়।

সেফালোস্পোরিয়াম স্যালমোসিনেমাটাম ফাঙ্গাই ইমপারফেকটি ( fungi imperfecti ) বিভাগের ছত্রাক। তবে বিশেষ অবস্থায় এর অ্যাসকোস্পোর (ascospore) হতে পারে। এ অবস্থায় ছত্রাকটির নাম এমেরিসেলপসিস স্যালমোসিনেমাটা ( Emericellopsis salmosynnemata )। এই ছত্রাক আসলে তিনটি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করে। সেফালোস্পোরিন N, P ও C এই তিনটির মধ্যে C হল সবচেয়ে বেশি কার্যকর। বিভিন্ন প্রকার পেটের পীড়ার



ক্ষেত্রে সেফালোস্পোরিন ফলপ্রসূ। সেফালোস্পোরিন C রাসায়নিক সংকেত ঃ

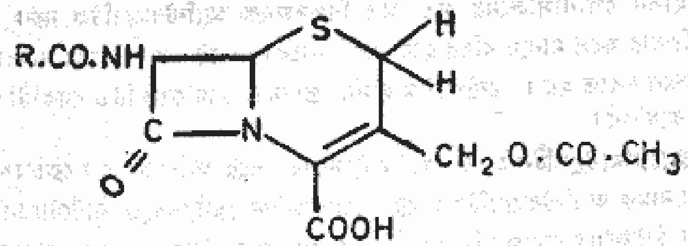


'R' জোট বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

**খ। অ্যাকটিনোমাইসেটিসজাত অ্যান্টিবায়োটিক**

অ্যাকটিনোমাইসেটিসরা সাধারণতঃ মাটির মধ্যে থাকে। দু' একটি প্রজাতির অ্যাকটিনোমাইসেটিস মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের রোগ উৎপাদন করে। তবে অধিকাংশ অ্যাকটিনোমাইসেটিস হল মৃতজীবী (saprophytic)। এরা মাটির মধ্যে জৈব বস্তু পচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মৃতজীবী অ্যাকটিনোমাইসেটিসরা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক। অ্যাকটিনোমাইসেটিসরা দেখতে অবিকল চিতির (mould) মত। এরা চিতির মত কনিডিয়া (conidia)-এর সাহায্যে বংশ বিস্তার করে। কিছু জলজ একটিনোমাইসেটিস স্পোরেনজিয়ার মধ্যে জুস্পোর (zoospore) উৎপাদন করে। কিন্তু এদের হাইফি (hyphae) হয় খুব সরু সরু। যেখানে সাধারণ চিতির গড়পড়তা হাইফির ব্যাস হয় ২ মাইক্রোমিটার, সেখানে অ্যাকটিনোমাইসেটিসদের হাইফির গড়পড়তা ব্যাস হল ১ মাইক্রোমিটারের কাছাকাছি। চিতিদের সঙ্গে অ্যাকটিনোমাইসেটিসদের বহু বিষয় সাদৃশ্য থাকলেও, এরা হল প্রোক্যারিওটিক (procaryotic)। তাই এদের অনেকে এখন শ্রেণীবদ্ধ করতে চান ব্যাকটিরিয়া হিসাবে, চিতি (mould) হিসাবে নয়।

**স্ট্রেপটোমাইসিন ঃ** আকটিনোমাইসেটিস থেকে প্রথম মানুষের রোগ নিবারণক্ষম অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন মৃত্তিকা জীবাণুবিদ ওয়াক্সমান (Waksman) ও তাঁর সহকর্মী সাটস (Schatz)। তাঁরা স্ট্রেপটোমাইসেস গ্রীসিয়াস (streptomyces griseus) নামক অ্যাকটিনোমাইসেটিস থেকে ১৯৪৪ সালে প্রথম স্ট্রেপটোমাইসিন (streptomycin) নামক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন।* স্ট্রেপটোমাইসিন জটিল জৈব ক্ষার বস্তু (complex organic base)।

* পুরান নাম, অ্যাকটিনোমাইসিস গ্রীসিয়াস (Actinomycis griseus)। গ্রীসিয়াস শব্দের অর্থ 'ধূসর'।

banglainternet.com

যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় এই অ্যান্টিবায়োটিক বিশেষ সাফল্য লাভ করে। স্ট্রেপ-টোমাইসিন পেনিসিলিনের মত অত বিপদজনক অ্যান্টিবায়োটিক নয়। এর পার্শ্বক্রিয়ার ফলে মানুষ বধির হয়ে যেতে পারে। তাই এর ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। স্ট্রেপটোমাইসিন প্রধানত গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার উপর কার্যকর।

**ক্লোরোমাইসেটিন :** স্ট্রেপটোমাইসিনের পরে আবিষ্কৃত হয় ক্লোরোমাই-সেটিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক। ক্লোরোমাইসেটিন ক্লোরিনযুক্ত নাইট্রোবেনজিন যৌগ। টাইফয়েড রোগের চিকিৎসায় এর প্রয়োগ সর্বাধিক। ক্লোরোমাইসেটিন প্রথম পাওয়া যায় স্ট্রেপটোমাইসেস ভেনিজুয়েলি (streptomyces vanezuelae) নামক অ্যাকটিনোমাইসেটিস থেকে। কিন্তু এখন এই অ্যান্টিবায়োটিক বিশুদ্ধ রাসায়নিক উপায়ে উৎপাদন করা হয়।

**টেট্রাসাইক্লিন :** অ্যাকটিনোমাইসেটিস থেকে প্রাপ্ত আরো তিনটি অ্যান্টি-বায়োটিক মানুষের রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রচলিত। এরা হল টেরামাইসিন (terramycin), অরিও মাইসিন (aureomycin) এবং নিওমাইসিন (neomycin)। এদের পাওয়া যায়, যথাক্রমে স্ট্রেপটোমাইসেস রাইমোসাস (streptomyces rimosus)। স্ট্রেপটোমাইসেস অরিওফাসিয়েন্স (s. aureo-faciens) এবং স্ট্রেপটোমাইসেস ফ্রেডি ( s. fradiae ) থেকে। রাসায়নিক দিক থেকে টেরামাইসিন ও অরিওমাইসিন হল টেট্রাসাইক্লিন (tetracycline) শ্রেণীভুক্ত। এদের প্রত্যেকের অণুতে থাকে চারটি করে যুক্ত শৃংখল (ring) এবং প্রত্যেকটি শৃংখলে থাকে ছয়টি করে কার্বন পরমাণু। এরা প্রধানত খাবার ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এরা গ্রাম-পজেটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভ উভয় প্রকার ব্যাকটিরিয়ার উপর কার্যকর। এরা ব্যাকটিরিয়া ছাড়া বড় ভাইরাস ও অ্যামিবার উপরও কার্যকর।

**নিওমাইসিন :** নিওমাইসিন অণুতে থাকে ২৯টি কার্বন পরমাণু ও অ্যামাইনো-নাইট্রোজেন। প্রধানত এর অ্যাসিড লবণ ওষুধরূপে ব্যবহার করা হয়। নিও-মাইসিন, গ্রাম-পজেটিভ, গ্রাম-নেগেটিভ, ব্যাকটিরিয়া, বড় ভাইরাস এবং অ্যামি-বার উপর কার্যকর। কিন্তু নিওমাইসিস যথেষ্ট বিষাক্ত। তাই প্রধানত স্থানীয়-ভাবে এর প্রয়োগ করা হয়। যেমন চোখের লোশন ও ঘায়ের মলম হিসাবে।

### গ। ব্যাকটিরিয়াজাত অ্যান্টিবায়োটিক

**পলিমিকসিন :** ব্যাকটিরিয়া বহুপ্রকার অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষরণ করে। কিন্তু এরা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ওষুধ হিসাবে এদের

banglainternet.com



ব্যবহার করা চলে না। যেসব ব্যাকটিরিয়াজাত অ্যান্টিবায়োটিক ঔষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তারা সকলেই ব্যাসিলাস ( bacillus ) গণভুক্ত (genus) ব্যাকটিরিয়াজাত এবং রাসায়নিক দিক থেকে এসব অ্যান্টিবায়োটিক পলি-পেপটাইট (polypeptide)। ব্যাসিলাস পলিমিকসা (Bacillus polymixa) থেকে পাওয়া যায় অ্যান্টিবায়োটিক পলিমিকসিন (polymyxin)। এই অ্যান্টি-বায়োটিক সিউডোমোনাস (pseudomonas) ও অন্যান্য অনেক গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার উপর কার্যকর। সিউডোমোনাস গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়া প্রধানত ঘায়ের মধ্যে হয়ে পচা ক্ষতের সৃষ্টি করে। এদের মেরে ফেলা অনেকক্ষেত্রে হয় কষ্টকর। ব্যাকটিরিয়াজাত অ্যান্টিবায়োটিক প্রধানত ঘায়ের মলম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেসব ব্যাকটিরিয়া থেকে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করা হয়, তারাও স্বাভাবিক অবস্থায় বাস করে মাটির মধ্যে। ঘা পচান ব্যাকটিরি-য়াও সাধারণতঃ ক্ষতে লাগে মাটি থেকেই।

## জীবাণুর উপর অ্যান্টিবায়োটিকের ক্রিয়া

অ্যান্টিবায়োটিক ঠিক কিভাবে রোগ জীবাণুদের ক্ষতিসাধন করে, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন নয়। যদিও এ-বিষয় গবেষণা হয়েছে যথেষ্ট। পেনিসিলিন কোনভাবে ব্যাকটিরিয়া কোষ প্রাচীর গঠনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে; স্ট্রেপটোমাইসিন প্রোটিন সংশ্লেষণে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের শরীরে রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়াদের ঠিক মেরে ফেলে না। অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের শরীরে ব্যাকটিরিয়াকে নিস্তেজ করে ফেলে এবং তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। ফ্যাগোসাইটরা (phagocytes) এর ফলে ব্যাকটিরিয়াদের সহজেই ধরে খেতে পারে। যেহেতু ব্যাকটিরিয়াদের বংশ বৃদ্ধি হতে পারে না, তাই ফ্যাগোসাইটরা তাদের খেয়ে শেষ করে উঠতে পারে। জীবাণুদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটলে ফ্যাগোসাইটরা তাদের খেয়ে শেষ করে উঠতে পারে না। ফলে মানুষ সহজে রোগ মুক্ত হতে পারে না অথবা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

## ওষুধ-রোধক জীবাণু-ধারার উদ্ভব

অনেক সময় দেখা যায়, একটা নতুন ওষুধ যেভাবে কোন জীবাণুর উপর কার্যকর করতে পারে, তা আর ঠিক সেভাবে কার্যকর থাকে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, সালফোনামাইড আগে যেভাবে গনোরিয়া জীবাণুকে (Neisseria

gonorrhoeae) মেরে ফেলতে পারতো, এখন আর তা পারে না। এর কারণ হল ওষুধ প্রতিরোধী (drug resistant) জীবাণুর উদ্ভব। সব সময়ই একটা প্রজাতির (species) জীবাণুর মধ্যে কিছু কোষ থাকে, যারা কোন বিশেষ ওষুধের ক্রিয়ায় মারা যায় না। কিন্তু এরা সাধারণতঃ সংখ্যায় কম থাকে। কিন্তু যখন কোন বিশেষ ওষুধের জন্য অন্যরা মারা যায়, তখন এসব কোষ দ্রুত সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কোন বিশেষ ওষুধ-প্রতিরোধী জীবাণুর উদ্ভব হয়। নানাভাবেই জীবাণুরা কোন ওষুধের ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারে। যেমন যেসব জীবাণু সালফোনামাইডে মরে না, তারা খুব বেশী পরিমাণে প্যারা-অ্যামাইনো বেনজয়িক অ্যাসিড (PABA) উৎপাদন করে। আর তাই তাদের ক্ষেত্রে সালফোনামাইড কাজ করতে চায় না। সালফোনামাইড অণু এনজাইম অণুর গায়ে যথেষ্ট পরিমাণে অধিশোষিত (adsorb) হবার আগেই PABA অণুগুলি অধিশোষিত (adsorb) হতে পারে। ফলে ব্যাকটিরিয়া কোষে ফলিক অ্যাসিড (folic acid) উৎপাদনে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে না।

অনেক ব্যাকটিরিয়া কোষ আছে, যাদের উপর পেনিসিলিন কার্যকর হয় না। কারণ, পেনিসিলিনের সংস্পর্শে আসলে এরা পেনিসিলিনাজ (penicillinase) এনজাইম উৎপাদন করতে থাকে। এই এনজাইম পেনিসিলিন-এর আর্দ্র বিশ্লেষণ (hydrolysis) ঘটায়। ফলে পেনিসিলিন এসব ব্যাকটিরিয়া কোষের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না। পেনিসিলিনাজ স্বাভাবিক অবস্থায় এসব কোষে উৎপাদিত হয় না। কিন্তু যখন পেনিসিলিনের সংস্পর্শে আসে তখন উৎপন্ন হতে থাকে। এ ধরনের এনজাইম (enzyme) যা কোষের মধ্যে সাধারণ অবস্থায় উৎপাদিত হয় না, কিন্তু বিশেষ বস্তুর সংস্পর্শে এলে কোষে উৎপন্ন হতে থাকে, তাকে বলা হয় অভিযোজক এনজাইম (adaptive enzyme)। কিন্তু অভিযোজক এনজাইমের সাহায্যে জীবাণুর ওষুধ রোধকের ঘটনা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। দেখা যায় ব্যাকটিরিয়া আবাদে খুব কম পরিমাণে পেনিসিলিন যোগ করা হয়, যাতে কোন বিশেষ ব্যাকটিরিয়াম মারা যায় না, তবে ঐ মাধ্যমের মধ্যে যেসব ব্যাকটিরিয়াকোষ উৎপাদিত হয় তাদের পেনিসিলিন সহ্যের ক্ষমতা বেড়ে যায়। যদি এসব ব্যাকটিরিয়া কোষ নিয়ে ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় পেনিসিলিন-যুক্ত আবাদ-মাধ্যমে চাষ করা হয়, তবে দেখা যায় যে তাদের পেনিসিলিন সহ্যের মাত্রা আরো বেড়ে যাচ্ছে। তবে এই সহ্যক্ষমতা স্থায়ী হয় না। যদি এদের আবার কমমাত্রায় পেনিসিলিন-যুক্ত আবাদ মাধ্যমে চাষ করা হতে থাকে, তবে এদের পেনিসিলিন সহ্যের



ক্ষমতা আবার কমে আসছে। কেন এ রকম হয়, তার কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। কেবল মিউটেশন (mutation) তত্ত্বের সাহায্যে সব রকম ওষুধ-রোধক ক্ষমতার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

কোন বিশেষ রোগজীবাণুর মধ্যে কোন বিশেষ ওষুধ-রোধক জাতের উদ্ভব হয়ে যাতে চিকিৎসার বিঘ্ন ঘটাতে না পারে সেজন্য এখন একাধিক ওষুধকে অনেক সময় একত্রে প্রয়োগ করা হয়। এ রকম রোগ চিকিৎসাকে বলা হয় মিলিত চিকিৎসা (combined therapy)। যেমন যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় স্ট্রেপটোমাইসিন-এর সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় প্যারা-অ্যামাইনো স্যালিসিলিক অ্যাসিড (PAS) এবং আইসোনিকটিনিক অ্যাসিড হাইড্রোজাইড (INH)। PAS স্ট্রেপটোমাইসিন রোধি ব্যাকটিরিয়া কোষদের মেরে ফেলতে সক্ষম।

রাসায়নিক বস্তুর উদ্ভব ঘটান রাসায়নিকরা। জীবাণুবিদরা পরীক্ষা করে দেখেন তাদের জীবাণু নিধনের ক্ষমতা। চিকিৎসকরা দেখেন মানুষের শরীরে প্রয়োগ করে তাদের রোগ চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা চলে কিনা। জীবাণুরা ঠিক এক রকম থাকে না। তারা বদলে যেতে পারে। পুরান ওষুধ তাই হয়ে পড়তে পারে অকেজো অথবা আগের চাইতে কম কার্যক্ষম। তাই করে যেতে হয় নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা। এমন অনেক ঔষধ এখন ব্যবহার করা হয়, যাদের পার্শ্বক্রিয়া (side effect) যথেষ্ট খারাপ। কিন্তু রোগ নিরাময়ের অন্য পন্থা জানা নেই বলেই গ্রহণ করা হয় এই ঝুঁকি। এই ঝুঁকি কমাবার জন্যও চেষ্টা চলেছে নতুন অপেক্ষাকৃত কম বিপদজনক ওষুধ আবিষ্কারের।

### নতুন অ্যান্টিবায়োটিক অনুসন্ধানে

সাধারণতঃ মাটি থেকে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনক্ষম জীবাণু পৃথক করা হয়। সাধারণতঃ কোন জায়গার মাটি থেকে ১ গ্রাম মাটি নিয়ে ১ লিটার পানিতে গুলান হয়। তারপর সেখান থেকে ১ মিলিলিটার করে নিয়ে পেট্রি-থালায় আবাদ-মাধ্যমে যুক্ত করা হয়। এই আবাদ-মাধ্যমে একই সঙ্গে যুক্ত করা হয় বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া। উপযুক্ত তাপমাত্রায় (সাধারণতঃ ২৬ ডিগ্রী, সেন্টিগ্রেড), ৫ থেকে ১০ দিন রাখার পর দেখা হয়, মাটিতে কোন অ্যান্টি-বায়োটিক উৎপাদক জীবাণু ছিল কিনা। অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদক জীবাণু থাকলে, উৎপাদিত অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে ঐ জীবাণুর চারধারে অন্য ব্যাকটিরিয়া হতে পারে না। অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদক জীবাণুর উপনিবেশের

banglainternet.com

(colony) চারধারে একটি গোলাকৃতি পরিষ্কার অঞ্চলের সৃষ্টি হবে। অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদক জীবাণু থাকলে সেখান থেকে নিয়ে তার বিরুদ্ধ আবাদের ব্যবস্থা করা হয় এবং উৎপাদিত অ্যান্টিবায়োটিকের গুণাগুণ বিচার করে দেখা হয়। একটি চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের নিম্নলিখিত গুণাগুণগুলি থাকা প্রয়োজন :

১। মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়।

২। খুব অল্পমাত্রাতে প্রয়োগ করলেই রোগজীবাণু মেরে ফেলতে অথবা তার বৃদ্ধি বন্ধ করে দিতে সক্ষম।

৩। সহজে সংরক্ষণ করা যায়।

৪। পানিতে, লবণাক্ত পানিতে অথবা রক্তে দ্রবীভূত হতে পারে।

সাধারণতঃ অ্যান্টিবায়োটিকের গবেষণা খুব ব্যয়বহুল। বর্তমানে তাই চেষ্টা করা হয় পুরাতন বহু পরীক্ষিত অ্যান্টিবায়োটিকদের সামান্য কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক উপাদানের। এরকম অ্যান্টিবায়োটিকদের বলা হয় আধা সংশ্লেষিত (semi synthetic) অ্যান্টিবায়োটিক। এসব অ্যান্টিবায়োটিকের মূল অণু পাওয়া যায়, ছিত্রি, অ্যাকটিনোমাইসেটিস অথবা ব্যাকটিরিয়া থেকে। পরিবর্তন ঘটান হয় প্রধানত অণুর গৌণ অংশে। অনেক অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন পেনিসিলিন) রাসায়নিকভাবে সংশ্লেষণ করা গেলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হয় না। তাই এখনও তাদের অণুর মূল অংশ ছিত্রি অথবা অ্যাকটিনোমাইসেটিস-এর সাহায্যেই উৎপাদন করে নেওয়া হয়।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

# খাদ্যের জীবাণুতত্ত্ব

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের যা খাদ্য জীবাণুদেরও তাই খাদ্য। খাদ্যদ্রব্য জীবাণুরা এনজাইম-এর সাহায্যে সহজেই পরিবর্তিত করতে পারে। এই পরিবর্তনকে এককথায় বলা যায় পচন বা ডিকম্পোজিশন (decomposition)। যখন পচন-ক্রিয়ার ফলে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস নির্গত হয় তখন তাকে বলা হয় দূষিত পচন বা পিউট্রিফ্যাকশন (putrifaction)। খাদ্যদ্রব্যের পচন নিবারণ খাদ্য-জীবাণুতত্ত্বের (food microbiology) অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। অনেক সময় খাদ্যবস্তুর মাধ্যমে অনেক রোগজীবাণু বিস্তার লাভ করতে পারে। এসব রোগজীবাণু যাতে খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা দান খাদ্য-জীবাণুতত্ত্বের আর একটি লক্ষ্য। অনেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য জীবাণুদের সাহায্য নিতে হয়, যেমন সব্জির আচার (pickle)। এসব ক্ষেত্রে জীবাণুতত্ত্বের জ্ঞান আমাদের অপেক্ষাকৃত ভালভাবে খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে জীবাণুরা যে সকল খাদ্যবস্তু পচিয়ে নষ্ট করে তাই নয় জীবাণুরা অনেক সময় খাদ্যবস্তু সংরক্ষণে সাহায্য করে। যেমন ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া যে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদন করে তা খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের কাজে সহায়ক হতে পারে। খাদ্যদ্রব্যের জীবাণুতত্ত্ব বা খাদ্য-জীবাণুতত্ত্ব উন্নত উপায়ে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ ও প্রস্তুতের কাজে বিরাট সাফল্য এনে দিয়েছে।

### ১। খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ

মানুষের আহার্যকে আলোচনার সুবিধার জন্য মোটামুটি এভাবে ভাগ করা চলে : খাদ্যশস্য ও তা থেকে প্রস্তুত দ্রব্য, শর্করা ও শর্করাজাত দ্রব্য, তরিতরকারী, ফল, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছ, মাংস ও ডিম। এদের মধ্যে খাদ্যশস্য ও শর্করাজাত দ্রব্য ছাড়া আর অন্যপ্রকার খাদ্য সহজেই জীবাণুর ক্রিয়ায় নষ্ট হয়। আধুনিক সভ্যতার একটা লক্ষ্য হল অধিক মাত্রায় সংরক্ষিত খাদ্য ভক্ষণ। খাদ্য সংরক্ষণ তাই আধুনিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাদ্যদ্রব্যকে প্রধানত ছয় ভাগে সংরক্ষিত করা চলে :

banglainternet.com

১। **জীবাণুরোধ বা অ্যাসেপসিস** (Asepsis) : এক্ষেত্রে জীবাণুদের খাদ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসতে দেওয়া হয় না।

২। **উত্তাপ প্রদান :** এক্ষেত্রে উত্তাপের দ্বারা জীবাণুদের মেরে ফেলা হয়।

৩। **ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখা :** এক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যকে খুব নিম্ন তাপমাত্রায় রাখা হয়।

৪। **বিশুষ্ককরণ (Drying) :** এক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যকে শুকিয়ে রাখা হয়।

৫। **উচ্চ আস্রবণ চাপ (Osmotic pressure) :** এক্ষেত্রে বিভিন্ন উচ্চ আস্রবণ চাপযুক্ত দ্রবণের মধ্যে খাদ্যবস্তুকে রাখা হয়।

৬। **রাসায়নিক সংরক্ষক প্রদান :** এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে জীবাণুদের রোধ করা হয়।

এছাড়া খাদ্যদ্রব্যকে আল্ট্রাভায়োলেট বা অতি বেগুনি রশ্মি, সূক্ষ্ম শব্দ-তরঙ্গ, উচ্চ চাপ ইত্যাদি সাহায্যেও অনেকক্ষেত্রে সংরক্ষিত করা হয়। খাদ্য-দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য একসাথে উপরে বর্ণিত এক বা একাধিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। খাদ্য সংরক্ষণের মূলনীতি হল যাতে বাইরে থেকে জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা এবং যেসব জীবাণু আগে থেকেই খাদ্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে তারা যাতে বেঁচে থাকতে না পারে অথবা বংশ বৃদ্ধি করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, খাদ্যবস্তুর মধ্যে যদি বাইরে থেকে জীবাণু প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়, তবে গোড়াতে খাদ্য-মধ্যে যে পরিমাণ জীবাণু থাকতে পারে, তা খাদ্যবস্তুকে অল্প সময়ে পচিয়ে তুলতে পারে না। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে খাদ্য-বস্তুর মধ্যে যদি বাইরে থেকে জীবাণু আসতে পারে তবে খাদ্যবস্তুতে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। খাদ্যবস্তুতে জীবাণুর সংখ্যা যদি বেশী থাকে তবে উত্তাপ দ্বারা তাদের মেরে ফেলতে অধিক সময় লাগে। জীবন্ত গাছ ও প্রাণীদেহের মধ্যে খুব বেশী জীবাণু থাকে না। তাই চেষ্টা করা হয় যাতে প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পরে বেশী জীবাণু বাইরে থেকে অনুপ্রবেশ না করতে পারে। এই কারণে জীবজন্তু জবাই করার অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা মেরে ফেলবার পর তাদের ছাল ছাড়ান, কেটে টুকরো টুকরো করা, ইত্যাদির সময় লক্ষ্য রাখা হয়, যাতে মাংসে যথেষ্ট জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে। সমুদ্র ও নদী থেকে মাছ চালান দেবার সময় মাছের কানকুয়া ও নাড়ীভুঁড়ি কেটে বাদ দিয়ে বরফের মধ্যে করে চালান দিলে মাছ সহজে পচে না। কারণ মাছের কানকুয়া ও নাড়ীভুঁড়ির মধ্যে অনেক জীবাণু থাকে। এরা ক্রমে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে মৃত মাছের শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নাড়ীভুঁড়ি

banglainternet.com



কেটে বাদ দিলে এই রকম হতে পারে না; যে পরিমাণ জীবাণু থাকে, ঠাণ্ডায় তারা বৃদ্ধি পেতে ও মাছকে পচিয়ে তুলতে সময় নেয়।

তাপ প্রয়োগ করে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেকার জীবাণুকে নানাভাবে মেরে ফেলা চলে। খাদ্যবস্তুকে টিনের বা অন্য কোন কিছুর কৌটার মধ্যে পুরে, হাওয়া না যেতে পারে ( air-tight ) এভাবে মুখ বন্ধ করে উত্তাপ প্রয়োগ করলে ভিতরকার জীবাণুরা মরে যায় এবং বাইরে থেকে আর জীবাণুরা যেতে পারে না। এভাবে সংরক্ষিত খাদ্যবস্তু বহুদিন ভাল থাকে। এইভাবে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ করাকে বলা হয় ক্যানিং ( canning ) বা পাত্রকরণ।

অনেক সময় খাদ্যবস্তুকে গাঢ় চিনির সিরা অথবা গাঢ় লবণ-গোলা পানির মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। কারণ এভাবে গাঢ় দ্রবণের মধ্যে রাখলে যেহেতু বাইরের দ্রবণের আস্রবণ চাপ ( osmotic pressure ) বেশী তাই তার মধ্যে জীবাণুরা বেঁচে থাকতে ও বংশবিস্তার করতে পারে না। গাঢ় চিনির সিরার মধ্যে রেখে ফল সংরক্ষণ খুবই প্রচলিত। সমুদ্র ও নদী থেকে মাছ ধরে লবণের মধ্যে সংরক্ষণও বহু প্রাচীন কথা।

অনেক খাদ্যবস্তু তাপ প্রয়োগে নষ্ট হতে পারে। এসব খাদ্যবস্তুকে তাই কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুরগীর ডিমের কথা বলা যেতে পারে। ডিম পাড়বার আগেই মুরগীর ডিমের মধ্যে মুরগীর দেহ থেকে বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া প্রবেশ করতে পারে। ক্লস্ট্রিডিয়াম (clostridium) স্যাল-মোনিলা ( salmonilla ), সিউডোমোনাস ( pseudomonas ) ইত্যাদি গণের ব্যাকটিরিয়া মুরগীর ডিমের খোসা তৈরি হবার আগেই মুরগির দেহ থেকে ডিমের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এদের ক্রিয়ার ফলে ডিম পচে যায়। কিন্তু ডিমকে যদি শূন্য তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটর ( refrigerator )-এ রাখা যায়, তবে এসব ব্যাকটিরিয়া ডিমের অভ্যন্তরে সক্রিয় হতে পারে না। ফলে ডিম ভাল থাকে।

পানি ছাড়া জীবাণুরা সক্রিয় থাকতে পারে না। জীবাণুদের দেহের শতকরা ৮০ ভাগ হল পানি। জীবাণুদের এনজাইমের ক্রিয়ার জন্য এনজাইম অণুদের পানিতে ভাসমান অবস্থায় থাকতে হয়। তাই যেসব খাদ্যবস্তুর মধ্যে যথেষ্ট পানি থাকে না, তার মধ্যে জীবাণুরা সহজে বৃদ্ধি পেতে পারে না। তাই অনেক খাদ্যবস্তুকে বিশুষ্ক করে রাখা হয়। ফলমূল শুকিয়ে সংরক্ষণ অতি প্রাচীন প্রথা। কিন্তু বর্তমান যুগে ডিম দুধ ইত্যাদি বাতাসবিহীন স্থানে শুকিয়ে গুঁড়ো অবস্থায় সংরক্ষণ বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছে।

অনেক সময় খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের জন্য খাদ্যবস্তুর সাথে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করা হয়। যেমন বেনজয়িক অ্যাসিড (Benzoic acid), সালফার ডাইঅক্সাইড ( sulphur dioxide ) ইত্যাদি। অনেক রাসায়নিক দ্রব্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে আগে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করলেও বর্তমানে আর ব্যবহার করা হয় না।

অনেক সময় খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের জন্য আলট্রাভায়লেট রশ্মি (ultraviolet ray), সূক্ষ্ম শব্দ-তরঙ্গ (supersonic vibration) ও তাড়িত প্রবাহ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যেহেতু এসব পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষ তাই এরা এখনো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে পারেনি।

## ২। খাদ্য-বিষণ (Food poisoning)

খাদ্যের মাধ্যমে অনেক রোগ বিস্তার লাভ করে। যেমন ওলাওঠা (Cholera) ও আন্ত্রিক জ্বর ( Typhoid ) ইত্যাদি খাদ্য-মাধ্যমে সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই খাদ্যদ্রব্য মারফত যাতে এসব রোগজীবাণু বিস্তার লাভ করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। কিন্তু খাদ্যের মধ্যে এমন অনেক জীবাণু থাকতে পারে যারা নানাপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য (toxin) উৎপাদন করে। এসব বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা দূষিত খাদ্য ভক্ষণ করলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে এমন কি বিষাক্ত খাদ্য ভক্ষণের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থের জন্য খাদ্য বিষাক্ত হওয়াকে সাধারণতঃ বলা হয় খাদ্য-বিষণ। যেসব জীবাণুর জন্য খাদ্য বিষাক্ত হতে পারে তাদের মধ্যে ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম (clostridium botulinum) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম, বটুলিয়াম নামক এক প্রকার অতি বিষাক্ত পদার্থ ক্ষরণ করে। যার ফলে বটুলিনামযুক্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে মানুষ মারা যায়। বটুলিনাম বিষ মানুষের শ্বাস-প্রণালী নিয়ন্ত্রক স্নায়ুমণ্ডলী অবশ করে দেয়। ফলে শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম সাধারণ অবস্থায় মাটিতে থাকে এবং মানুষের কোন রোগ উৎপাদন করে না। কিন্তু খাদ্যবস্তু, বিশেষ করে সংরক্ষিত খাদ্যবস্তুর মধ্যে বায়ুবিহীন অবস্থায় ( anaerobic ) দ্রুত বংশবিস্তার করে ও বিষাক্ত পদার্থ ক্ষরণ করে। যেহেতু ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম স্পোর উৎপাদক, তাই অল্প উত্তাপে এদের মৃত্যু ঘটে না।



ক্লস্ট্রিডিয়াম ছাড়া আরো যেসব গণের ব্যাকটিরিয়া বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে খাদ্য বিষাক্ত করতে পারে তাদের মধ্যে স্যালমোনেলা (Salmonella), গণের ব্যাকটিরিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্যালমোনেলা গণের ব্যাকটিরিয়া যে বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে তার দ্বারা, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি বিষাক্ত হয়ে থাকে। এভাবে বিষাক্ত হওয়া খাদ্য ভক্ষণ করলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঘন ঘন বমি ও পাতলা পায়খানা হয়। যদিও এভাবে বিষাক্ত হওয়া খাদ্যে মানুষের সচরাচর মৃত্যু ঘটে না, কিন্তু এ রকম খাদ্য খেলে মানুষকে অসুস্থ হয়ে খুবই কষ্ট পেতে হয়।

## ৩। খাদ্যবস্তু প্রস্তুতে জীবাণু ব্যবহার

খাদ্যবস্তু প্রস্তুতে জীবাণুর ব্যবহার খুবই প্রাচীন। যখন জীবাণু সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা ছিল না, তখনও মানুষ না জেনে বিভিন্ন জীবাণুকে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের কাজে লাগিয়েছে। যেমন দই তৈরি। বর্তমানে শাক-সব্জি, শস্য ইত্যাদির সাথে ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া ও লবণ-পানি যোগ করে আচারজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। লঘু লবণ-পানিতে এসব ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া মরে না। ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া এসব সব্জির মধ্যেকার শর্করা পদার্থ ভেঙ্গে যে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদন করে তার ফলে অম্ল স্বাদের সৃষ্টি হয়। এভাবে অম্ল স্বাদযুক্ত সব্জি প্রস্তুতকে বলা হয় পিকল (pickle)।

শুধু মানুষের নয়। গবাদি পশুর খাদ্যদ্রব্যও ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে রূপান্তরিত করে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত করা যায়। এভাবে ঘাস-পাতা সংরক্ষণকে বলা হয় এনসাইলেজ ( ensilage )। এনসাইলেজ করা ঘাস-পাতা খেলে গরুর দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ঘাস-পাতাকে উঁচু টাওয়ারের মধ্যে অথবা মাটির মধ্যে টুকরো টুকরো করে কেটে কাঁচা অবস্থায় চেপে রাখা হয়। এভাবে রাখবার ফলে ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়ামদের ক্রিয়ায় শর্করা পদার্থ ভেঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই অ্যাসিড অন্যান্য জীবাণু, যা সহজে ঘাস-পাতা সহজেই পচিয়ে নষ্ট করে, তাদের বৃদ্ধি পেতে দেয় না।

### ক্যানিং

কৌটায় খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করাকে বলা হয় ক্যানিং। কৌটায় ফল সংরক্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ। কৌটার মধ্যে ফল রেখে তাতে সাধারণতঃ গাঢ়



banglainternet.com

চিনির দ্রবণ যোগ করা হয়। এতে চিনির পরিমাণ থাকে শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ। এত ঘন দ্রবণে অধিকাংশ জীবাণু বৃদ্ধি পেতে পারে না। কারণ বাইরে অভিস্রাবণ চাপ (osmotic pressure) বেশি হওয়ার জন্য জীবাণু কোষ থেকে পানি বাইরে বেরিয়ে আসে। ফলে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ে অথবা মারা যায়। তাদের কোষের প্রোটপ্লাস্টে সংকোচন ঘটে। চিনির ঘন দ্রবণ যোগ করার পর সাধারণতঃ ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৫ থেকে ১৫ মিনিটকাল গরম করা হয়। কারণ কিছু ছত্রাক, যেমন অ্যাসপারজিলাস ( Aspergillus ) ও পেনিসিলিয়াম (Penicillium) খুব গাঢ় চিনির রসের মধ্যেও হতে পারে। কিন্তু এভাবে গরম করলে তারা মরে যায়। গরম করবার পর কৌটার মুখ সীসা দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাইরের বাতাস যাতে প্রবেশ করতে না পারে। তরিতরকারী ও শাকসব্জি কৌটায় সংরক্ষিত করতে হলে চিনির সিরার বদলে লবণ-দ্রবণ যোগ করতে হয়। দ্রবণে লবণের পরিমাণ হতে হয় শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ। অনেক সময় অ্যাসিড যোগ করে ফল-মূল সংরক্ষিত করা হয়। যেসব অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে অ্যাসিটিক অ্যাসিড (সেরকা) প্রধান। আমাদের দেশে ফল-মূল কৌটায় সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। কারণ, কৌটা সহজলভ্য নয়। কৌটার খরচা পড়ে বেশি। ফলের মধ্যে আম কৌটায় সংরক্ষণ করে লাভবান হওয়া সম্ভব। উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে, অনেক আম পচে নষ্ট হয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

# দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের জীবাণুতত্ত্ব

দুগ্ধ, বিশেষ করে গো-দুগ্ধ খাদ্য হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গরুর বাঁটে দুগ্ধ থাকে প্রায় জীবাণুমুক্ত। দুগ্ধ জীবাণুযুক্ত হয় পরে। দুগ্ধ দোহনের পর দুগ্ধ জীবাণুযুক্ত হতে থাকে পাত্র, উড়ে পড়া ধূলিকণা, গোবর, গো-চনা ও গরুর গায়ে লেগে থাকা ময়লা থেকে। গো-দুগ্ধে প্রথমে এমন কিছু থাকে যা জীবাণু জন্মাতে বাধা দেয়। কিন্তু পরে এই বাধাদানকারী দ্রব্যের বিনাস ঘটে ও নানা প্রকার জীবাণু দুগ্ধে বংশবিস্তার করতে থাকে। এসব জীবাণুর উপর দুগ্ধের ভালমন্দ নানাভাবে নির্ভর করে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের জীবাণুদের দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে : **অবাঞ্ছিত ও বাঞ্ছিত।**

অবাঞ্ছিত জীবাণুদের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু, যা দুগ্ধের মারফত বিস্তার লাভ করতে পারে। যেমন ক্ষয়রোগ ( Tuberculosis ), ডিপথেরিয়া (Diphtheria), ব্রুসেলোসিস (Brucellosis), কিউ-ফিভার (Q-fever), সোর থ্রোট (sore throat) ইত্যাদির জীবাণু। মানুষের রোগ উৎপাদন করে না, কিন্তু দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের মান কমায়, এ রকম জীবাণুরাও অবাঞ্ছিত জীবাণুর পর্যায়ে পড়ে যেমন, ক্লস্ট্রিডিয়াম গণের (genus) অধিকাংশ ব্যাক-টিরিয়া। এরা গ্যাস উৎপাদন ও দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে দুগ্ধজাত দ্রব্যের স্বাদ ও চাহিদা নষ্ট করে। ক্লস্ট্রিডিয়াম গণের ব্যাকটিরিয়া সাধারণতঃ গোবর ও মাটি থেকে দুগ্ধে এসে মেশে। অনেক ব্যাকটিরিয়া প্রোটিন দ্রাবক এনজাইম (engyme ) উৎপন্ন করে। এই এনজাইমের প্রভাবে দুগ্ধের মূল প্রোটিন কেসিন (casin) ভেঙ্গে অন্য দ্রব্যে পরিণত হয়। ফলে দুগ্ধের প্রোটিনের অপচয় ঘটে ও সেই দুগ্ধ দ্বারা দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় না। অনেক ব্যাকটিরিয়া দুগ্ধে আঠালো পদার্থ সৃষ্টি করে। অনেক ব্যাকটিরিয়া আছে যাদের প্রভাবে দুগ্ধের স্বাভাবিক রঙের পরিবর্তন ঘটে। যেমন, সেরাটিয়া (Serratia) গণের ব্যাকটিরিয়া থাকলে দুগ্ধ রক্তবর্ণ ধারণ করে।

বাঞ্ছিত জীবাণু বলতে সাধারণতঃ বোঝায় বিভিন্ন ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক-টিরিয়াকে। এদের বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতের কাজে লাগান হয়। দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতের সময় এদের দুগ্ধে যোগ করা হয়। কিন্তু ল্যাকটিক অ্যাসিড

banglainternet.com

ব্যাকটিরিয়া দুগ্ধে আগে থেকে থাকলে তা দুগ্ধের মান কমিয়ে দেয়। ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া দুগ্ধ শর্করা বা ল্যাকটোজ ভেঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে। ফলে দুগ্ধের মূল প্রোটিন কেজিন জমে যায়। ফলে সেই দুগ্ধ পান করা চলে না। এসব ক্ষেত্রে ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়াকেও বলা চলে অবাঞ্ছিত।

**ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া**

ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া তিনভাগে বিভক্ত করা চলে। যারা দণ্ডাকৃতি তাদের ফেলা হয় ল্যাকটোব্যাসিলাস (lactobacillus) গণে। যারা গোলাকার তাদের বিভক্ত করা হয় সাধারণতঃ দুটি গণে। যারা গোলাকার ও দ্রুতবিভক্ত হয়ে মালার আকারে একটার সাথে আর একটা যুক্ত হয়ে থাকে এবং ল্যাকটোজ ভেঙ্গে কেবলমাত্র ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদন করে তাদের ফেলা হয় স্ট্রেপটোকক্কাস (streptococcus) গণে। কিন্তু যেসব গোলাকার ব্যাকটিরিয়া ল্যাকটোজ ভেঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অঙ্গার-অম্ল গ্যাস (carbon dioxide) উৎপাদন করে তাদের ফেলা হয় লিউকনোস্টক (leuconstoc) গণে। যেসব ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া কেবলমাত্র ল্যাকটোজ ভেঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড বানায় তাকে বলা হয় হোমোফারমেন্‌টেটিভ ( homofermentative ), আর যারা ল্যাকটোজ ভেঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিড ও অঙ্গার-অম্ল গ্যাস (carbon dioxide) উৎপাদন করে তাদের বলা হয় হেটেরোফারমেনটেটিভ (heterofarmentative) ব্যাকটিরিয়া। ল্যাকটো ব্যাসিলাস গণে দণ্ডাকৃতি হেমো ও হেটেরো উভয়বিধ ব্যাকটিরিয়াকেই ফেলা হয়। কিন্তু যেসব কক্কাই ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদন করে তাদের হেমো ও হেটেরো ফারমেনটেটিভ হিসাবে স্ট্রেপটোকক্কাস ও লিউকনোস্টক গণে বিভক্ত করা হয়। ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া বাতাসের মুক্ত অক্সিজেনে বৃদ্ধি পেতে ও বংশবিস্তার করতে পারে। যদিও এদের দেহক্রিয়ার জন্য মুক্ত অক্সিজেন (free oxygen) প্রয়োজন করে না।

দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য সব গণের ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করা হয়। তবে লিউকনোস্টক গণের ব্যাকটিরিয়ার চাইতে ল্যাকটো-ব্যাসিলাস ও স্ট্রেপটোকক্কাস গণের ব্যাকটিরিয়া বেশী ব্যবহার করা হয়। যেসব ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি প্রধান :

(ক) **স্ট্রেপটোকক্কাস ল্যাকটিস** (Streptococcus lactis) : গ্রামপজেটিভ গোলাকৃতি ব্যাকটিরিয়া, তাড়াতাড়ি বিভক্ত হবার সময় সাধারণতঃ একটার



সাথে আর একটা লেগে থাকে। মালার মত দেখায়। ৪০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পেতে পারে। শতকরা ৪ ভাগ লবণযুক্ত আবাদ মাধ্যমে বৃদ্ধি পেতে পারে। মাখন ও পনির তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়।

(খ) **স্ট্রেপটোকক্কাস ক্রিমোরিস** (Streptococcus cremoris) : গোলাকার। লম্বা মালার আকারে থাকতে পারে। গ্রাম-পজেটিভ। শতকরা ২ ভাগ লবণ সহ্য করতে পারে কিন্তু ৪ ভাগ পারে না। ৪০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাড়তে পারে না। মাখন ও পনির বানাবার আগে দুধে যোগ করা হয়।

(গ) **স্ট্রেপটোকক্কাস থারমোফিলাস** (Streptococcus thermophilus) : গোলাকার। লম্বা মালার আকারে থাকতে পারে। গ্রাম-পজেটিভ। ৪০° থেকে ৪৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। শতকরা ২ ভাগ লবণ সহ্য করতে পারে না। দই ও বিশেষ ধরনের পনির বানাবার কাজে ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) **ল্যাকটোব্যাসিলাস বুলগারিকাস** ( Lactobacillus bulgaricus ) : লম্বা চিকন ব্যাকটিরিয়া। একসাথে শিকলের মত লেগে থাকতে পারে। গ্রাম-পজেটিভ। সাধারণতঃ ৪৫° থেকে ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তমরূপে বংশবিস্তার করতে পারে। ইউরোপ ও তুরস্কে দই প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করা হয়। বুলগেরিয়ার এক প্রকার টক দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতের কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(ঙ) **ল্যাকটোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস** (Lactobacillus acidophilus) : ল্যাকটোব্যাসিলাস বুলগারিকাসের মত। কিন্তু সাধারণতঃ ছোট মালার (short chain) আকারে থাকে। খুব বেশী অ্যাসিড উৎপাদন করে। দই ও বিভিন্ন প্রকার টক দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়। পেটের পক্ষে উপকারী বলে মনে করা হয়।

(চ) **ল্যাকটোব্যাসিলাস ল্যাকটিস** ( Lactobacillus lactis ) : খুব লম্বাকৃতি। কখনও কখনও লম্বা সুতার মত দেখায়। ৪০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভালভাবে বংশবিস্তার করতে পারে। দই প্রস্তুত করবার জন্য ব্যবহার করা যায়।

**মিথেলিন ব্লু-পরীক্ষা** : কোন্ দুগ্ধ ভাল আর কোন্ দুগ্ধ ভাল নয় তা বিচারের জন্য দুগ্ধে কি পরিমাণ ব্যাকটিরিয়া আছে তা জানা প্রয়োজন। বিভিন্নভাবে দুগ্ধে ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা পরিমাপ করা যায়। তবে সাধারণতঃ দুগ্ধে ব্যাকটিরিয়া-সংখ্যা গণনা না করে দুগ্ধের ভাল-মন্দ বিচারের জন্য মিথেলিন ব্লু (methyline blue) দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। মিথেলিন ব্লু আলকাতরা থেকে

banglainternet.com

প্রস্তুত এক প্রকার নীলবর্ণ পদার্থ। দুগ্ধে পরিমাণ মত এই রঞ্জক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়।* তারপর ৩৭° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া হয়। ব্যাকটিরিয়া মিথেলিন ব্লুকে শেষ পর্যন্ত বিজারিত করে বর্ণবিহীন করে তোলে। যে দুগ্ধে ব্যাকটিরিয়া সংখ্যায় যত বেশী থাকে সেই দুগ্ধ তত দ্রুত শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। দুগ্ধে মিথেলিন ব্লু বর্ণবিহীন হতে যত সময় লাগে তার উপর ভিত্তি করে দুগ্ধকে চারভাগে ভাগ করা হয়। যে দুগ্ধ সাদা হতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে তাকে সাধারণতঃ মনে করা হয় খুব ভাল দুগ্ধ বলে। যে দুগ্ধ বর্ণহীন হতে ৬ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে, তাকে মনে করা হয় ভাল দুগ্ধ বলে। যে দুগ্ধ বর্ণহীন হতে ২ ঘণ্টার কম সময় লাগে তাকে মনে করা হয় খারাপ বলে। যে দুগ্ধ মাত্র ২০ মিনিটে সাদা হয় তাকে ধরা হয় খুবই খারাপ দুগ্ধ হিসাবে।

**পাস্তুরাইজেশন:** পাস্তুরাইজেশন (Pasteurization) বলতে বোঝায় দুগ্ধকে ৬২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়, ৩০ মিনিটকাল অথবা ৭২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড উত্তপ্ত করে ঠাণ্ডা করা। এইভাবে দুগ্ধকে উত্তপ্ত করে ঠাণ্ডা করবার ফলে দুগ্ধের অধিকাংশ জীবাণু মারা যায়। দুগ্ধ দীর্ঘ সময় ভাল থাকে।

### ৫। জীবাণুর সাহায্যে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন

**(ক) দই:** দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে আমাদের দেশে দই, মাখন ও ঘি-র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দই বলতে বোঝায় ল্যাকটিক অ্যাসিড-এর প্রভাবে জমে যাওয়া দুধের প্রধান প্রোটিন পদার্থ, কেজিনকে। দই-এ কেজিন জমে দুধের পানি থেকে পৃথক হয়ে পড়ে না। বরং একটি অপেক্ষাকৃত থলথলে পিণ্ড উৎপাদন করে। দই প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করা হয়। লেখক পরীক্ষা করে দেখেছেন, উত্তম ধারার ল্যাকটোব্যাসিলাস ল্যাকটিস (Lactobacillus lactis) ও স্ট্রেপটোকক্কাস থারমোফিলাস (Streptococcus thermophilus)-এর মিশ্রণে প্রস্তুত সাজা (starter) দুগ্ধে যোগ করে ৩৭° তাপমাত্রায় ৬/৭ ঘণ্টা রেখে ভাল দই প্রস্তুত করা চলতে পারে। সাধারণতঃ বাজারের দইয়ে ল্যাকটোব্যাসিলাস ও স্ট্রেপটোকক্কাস

---

* ০.৫ গ্রাম মিথেলিন ব্লু ১ লিটার পানিতে গুলে স্টক সলিউশন প্রস্তুত করা হয়। দুধে যোগ করবার আগে এই সলিউশন থেকে ১ মিলিমিটার দিয়ে ৯ মিলিলিটার পানিতে যোগ করা হয়। এখান থেকে ১ মিলিলিটার নিয়ে ১০ মিলিমিটার দুধে যোগ করা হয়। এরপর দুধের উপরিভাগে অল্প প্যারাফিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যাতে বাতাস না যেতে পারে।

banglainternet.com



গণের ব্যাকটিরিয়ার সাথে ক্যানডিডা সিউডোট্রপিক্যালিস ভার ল্যাকটোজা (Candida pseudotropicalis var lactosa) নামক ঈস্ট থাকতে দেখা যায়। লেখক আরো লক্ষ্য করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দই খারাপ জমবার কারণ ক্লস্ট্রিডিয়াম গণের ব্যাকটিরিয়া। এসব ব্যাকটিরিয়া মাটি ও গোবর থেকে উড়ে এসে দুগ্ধের সাথে মেশে। এরা যে গ্যাস উৎপাদন করে তা দই-এর মধ্যে ছোট বড় ছিদ্র তৈরি করে অথবা যথাযথ জমতে দেয় না। অনেক সময় ব্যাসিলাস (Bacillus) গণের ব্যাকটিরিয়াও দই জমতে অসুবিধা করতে পারে। এই গণের অনেক ব্যাকটিরিয়া বিশেষ এনজাইমের সাহায্যে কেজিনকে গলিয়ে ফেলে। ফলে কেজিন জমে ভাল দই হতে পারে না। ভাল দই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন ভালো সাজা ও ভাল দুধ।

**(খ) মাখন:** দইয়ের স্নেহ-পদার্থ থেকে মাখন তৈরি হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুধ জমিয়ে দই করবার পর সেই দই মন্থন করে মাখন তৈরি করা হয়। অন্যান্য দেশে দুধের সাথে ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া যোগ করবার পর দুধ জমে দই হবার আগেই দুগ্ধ মন্থন করা হয়। ল্যাকটিক অ্যাসিড দুধের স্নেহ পদার্থের ছোট কণাদের একত্র হয়ে বড় মাখন-দানায় পরিণত হতে সাহায্য করে। এছাড়া অনেক ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া অ্যাসিটোইন (acetoin) নামক পদার্থ খুব সামান্য পরিমাণে উৎপাদন করে। এই অ্যাসিটোইন পরে বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত ( oxidize ) হয়ে ডাইঅ্যাসিটাইল (diacetyle) নামক পদার্থে পরিণত হয়। ডাইঅ্যাসিটাইল মাখনকে বিশেষ ধরনের সৌরভ দান করে। যার ফলে মাখনের বাজার-মূল্য বাড়ে।

**(গ) পনির:** পনির বা চিজ (Cheese) আর একটি দুগ্ধজাত উত্তম খাদ্য। আমাদের দেশে পনির খাওয়া এখনও যথেষ্ট চালু হয়নি। পনির তৈরির জন্য প্রথমে দুগ্ধের প্রধান প্রোটিন পদার্থ কেজিনকে জমিয়ে ছানায় পরিণত করা হয়। কেজিন যখন জমে ছানায় পরিণত হয় তখন তার মধ্যে দুগ্ধের স্নেহ পদার্থও আটকা পড়ে। এই কেজিন ও স্নেহ পদার্থকে পাতলা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে চিপে জলীয় অংশ ফেলে দেওয়া হয় তারপর এই জমাট অংশকে সাধারণতঃ ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে গাঁজান হয়। এই গাঁজানোর ফলে পনির প্রস্তুত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া দিয়ে সামান্য গাঁজন-ক্রিয়া (fermentation) সম্পন্ন করে বিভিন্ন প্রকার চিতি (mould) যোগ করে গাঁজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। যেসব চিতি এই গাঁজন ক্রিয়ায়

ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে পেনিসিলিয়াম (penicillium) গণের (genus) ছিত্রা প্রধান।

পনির তৈরির জন্য দুগ্ধকে জমিয়ে ছানা (curd) করবার কাজে সাধারণতঃ রেনিন নামক এনজাইম ব্যবহার করা হয়। রেনিন গরু বাছুরের পাকস্থলী থেকে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে স্যাওড়া গাছের রসেও এই এনজাইম-এর অনুরূপ এনজাইম থাকে। তাই স্যাওড়া গাছের (Streblus asper) রসের সাহায্যেও পনির তৈরির জন্য ছানা প্রস্তুত সম্ভব।*

দুগ্ধজাত দ্রব্যের জীবাণু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, উন্নত মানের দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন তত সহজ হচ্ছে। যেমন আমাদের দেশে এখন আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ময়মনসিং-এর কুলিয়ারচর নামক জায়গায় উন্নত মানের পনির প্রস্তুত হচ্ছে যা কিছুদিন আগেও হত না।

দুগ্ধ খুবই মূল্যবান খাদ্য। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য দেশে যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল।

* অম্ল পদার্থের সাহায্যে দুধ জমিয়েও ছানা প্রস্তুত করা যায়। আমাদের দেশে মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য যে ছানা প্রস্তুত করা হয় তা সাধারণতঃ অম্ল বস্তুর সাহায্যে করা হয়। এই ছানা ও রেনিন দিয়ে প্রস্তুত ছানা ঠিক এক নয়।

banglainternet.com

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়

# জনস্বাস্থ্য

### ১। পানি সরবরাহ

জনস্বাস্থ্যের সমস্যার অন্যতম মূল কথা হল সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ। সংক্রামক ব্যাধি যত জিনিস মারফত ছড়ায় তার মধ্যে পানি-সরবরাহ অন্যতম। তাই পানির বিশুদ্ধতা জনস্বাস্থ্য বিভাগের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। পানির মাধ্যমে একাধিক রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। পানির মাধ্যমে যেসব রোগ-জীবাণু বিস্তার লাভ করে তাদের মধ্যে কতকগুলির নাম নীচে দেওয়া হল :

**পানির দ্বারা সংক্রমিত রোগ**

| রোগের নাম | জীবাণুর নাম | জীবাণুর বর্ণনা |
|---|---|---|
| টাইফয়েড বা আন্ত্রিক জ্বর | স্যালমোনিলা টাইফোজা (Salmonilla typhosa) | গ্রাম-নেগেটিভ। দণ্ডাকৃতি কোন স্পোর হয় না। |
| প্যারা টাইফয়েড | স্যালমোনিলা প্যারাটাইফি (S. paratyphi) | |
| কলেরা বা ওলাউঠা | ভিবরিও কমা (Vibrio comma) | গ্রাম-নেগেটিভ। বক্র দণ্ডাকৃতি। স্পোর হয় না। |
| ব্যাকটিরিয়া ঘটিত আমাশয় | সিগিলা ডিসেন্ট্রি (Shigella dysenteriae) | গ্রাম-নেগেটিভ। দণ্ডাকৃতি স্পোর হয় না। |
| অ্যামিবাঘটিত আমাশয় | এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা (Entamaeba histolytica) | প্রোটোজোয়া। |

### পানি পরীক্ষা

পানিতে পৃথক পৃথকভাবে রোগ-জীবাণু খুঁজে দেখা কষ্ট সাপেক্ষ ব্যাপার। যেসব রোগ পানির মারফত ছড়ায় তারা সাধারণতঃ পানিতে মিশে যখন পানি মল দ্বারা দূষিত হয়। মানুষের মলের মধ্যে ইসচেরিচিয়া কোলি (Escherichea coli) নামক ব্যাকটিরিয়াম প্রচুর পরিমাণে থাকে। কোন পানি পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় সেই পানিতে ইসচেরিচিয়া কোলি খুব বেশী সংখ্যায় আছে,

তবে ধরে নেওয়া চলে ঐ পানি মানুষের মল দ্বারা দূষিত হয়েছে।* আর মানুষের মলে যেহেতু নানা প্রকার রোগজীবাণু থাকতে পারে, তাই ঐ পানি পান করা উচিত নয়। জনস্বাস্থ্য বিভাগের তাই অন্যতম কাজ, শহরের পানি সরবরাহে কি পরিমাণ **ইসচেরিচিয়া কোলি** ব্যাকটিরিয়াম থাকছে তার হিসাব রাখা।

ইসচেরিচিয়া কোলি (Escherichea coli) ব্যাকটিরিয়াম পানিতে আছে কিনা তা সহজেই প্রমাণ করা যায়। এই ব্যাকটিরিয়ামকে খুব সাধারণ আবাদ মাধ্যমে উৎপাদন করা চলে। ইসচেরিচিয়া কোলি ব্যাকটিয়াম **এরোব্যাকটার এরোজেনস্** ( Aerobacter aerogenes ) নামক ব্যাকটিরিয়ামের সাথে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত।** তাই এই দুই ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে পার্থক্য করবার প্রয়োজন হয়। ল্যাকটোজ পেপটোন পানিতে ৩৭° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ইসচেরিচি কোলি বৃদ্ধি পেতে পারে কিন্তু এরোব্যাকটার এরোজেনস্ পারে না। এছাড়া বিশেষ ধরনের আবাদ-মাধ্যমের সাহায্যেও এই দুইটি প্রজাতির ব্যাকটিরিয়ার পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। ল্যাকটোজ পেপটোন ও চিনা ঘাস (Agar) দিয়ে তৈরি আবাদ-মাধ্যমের ( culture medium ) সাথে যদি ইয়োসিন ( eosin ) ও মিথেলিন ব্লু (Methyline blue) নামক দুইটি রঞ্জক দ্রব্য যোগ করা যায় ও তার মধ্যে ইসচেরিচিয়া কোলি চাষ করা হয় তবে ইস্চেরিচিয়া কোলির উপনিবেশ নীল চকচকে ( blue black ) রঙ ধারণ করে। কিন্তু এরোব্যাকটার এরোজেনস্-এর উপনিবেশ ধারণ করে হালকা পাটল বর্ণ (pink)। এই দুটি পদ্ধতি ছাড়া জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা পানিতে ইসচেরিচিয়া কোলি ব্যাকটিরিয়ামের উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্যে আর একটি বিশেষ পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষাকে বলে **ভোগেস প্রোসকাওর** পরীক্ষা (Voges Proskauer Test)। ভোগেস-প্রোসকাওর পরীক্ষার জন্য ৩৭° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তরল আবাদ-মাধ্যমে উৎপন্ন ৪ দিনের পুরাতন ব্যাকটিরিয়ামের আবাদের উপর শতকরা ১০ ভাগ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ (solution) ঢেলে দিয়ে ঝাঁকান হয়। ব্যাকটিরিয়াম এই পরীক্ষার জন্য গ্লুকোজ পেপটন পানিতে উৎপন্ন করা হয় এবং ১০ মিলিমিটার পরিমাণ তরল আবাদ মাধ্যম এই পরীক্ষার জন্য

* সাধারণতঃ ১০০ মিলিমিটার পানিতে একের অধিক ইসচেরিয়া কোলাই ব্যাকটিরিয়া থাকলে সেই পানিকে খারাপ পানি বলে ধরা হয়।

** এই বিশেষ ব্যাকটিরিয়াম ঘাস-পাতা থেকে পানিতে মেশে। মানুষের মল থেকে নয়।

banglainternet.com



ব্যবহার করা হয়। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে ঝাঁকালে ইসচেরিচিয়া কোলির ক্ষেত্রে কোন বর্ণের উদ্ভব হয় না কিন্তু এরোব্যাকটার এরোজেন্সের ক্ষেত্রে পাটল রঙের উদ্ভব হয়।

## ২। দূষিত পানি অপসারণ

জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের যেমন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হয় তেমনি শহরের আবর্জনা বিশেষ করে মলমূত্রের নর্দমার ময়লা পানি নিষ্ক্রমণ ব্যাপারেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কারণ নর্দমার ময়লা পানি ঠিকমত নিষ্ক্রান্ত না হলে জনস্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটে। বড় বড় শহরের নর্দমার ময়লা আবর্জনাময় পানিকে বিভিন্ন প্রকার জৈব পচন পদ্ধতি (biological dicomposition) সাহায্যে আবর্জনামুক্ত করা হয়। একাধিক উপায়ে ময়লা পানিকে আবর্জনা ও মল-মুক্ত করা চলে। এর মধ্যে একটিকে বলা হয় **অ্যাকটি-ভেটেড স্লাজ-পদ্ধতি**। এই পদ্ধতিতে ময়লা পানিকে প্রথমে লোহার ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে অপেক্ষাকৃত শক্ত ভাসমান পদার্থ মুক্ত করা হয়। তারপর সেখান থেকে একটা বড় চৌবাচ্চায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই চৌবাচ্চায় বায়ু প্রবাহের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। ( চিত্র—৮ )। এই অবস্থায় বায়ুজীবী জীবাণু ( aerobic microbes )-দের ক্রিয়ার ফলে জৈব পদার্থের একটি অংশ অজৈব পদার্থে পরিণত হয়। এখানে ময়লা পানির মধ্যকার অপেক্ষাকৃত নরম জৈব পদার্থ বায়ুজীবী জীবাণুদের ক্রিয়ায় ভেঙ্গে পড়ে। ময়লা পানিকে এরপর আর একটি চৌবাচ্চায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পানির গাঢ় ময়লা বা স্লাজ ( slag)-কে থিতাতে দেওয়া হয়। এই স্ল্যাজের ঠ আবার বায়ুজীবী জীবাণুদের দ্বারা যে চৌবাচ্চায় পচন-ক্রিয়া সংগঠিত হয় ( চিত্র-৮ ) তাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে যেসব জীবাণু থাকে তাদের সহযোগে পচন-ক্রিয়া দ্রুততর করবার জন্যই স্লাজের এই অংশকে পাম্প করে বায়ুজীবী পচনক্রিয়ার চৌবাচ্চায় পাঠান হয়। স্লাজের আর একটি অংশ যা অপেক্ষাকৃত ভারী তাকে মাটির নীচে একটি চৌবাচ্চায় স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে অবায়ুজীবী জীবাণুদের সাহায্যে পচন-ক্রিয়া ঘটান হয়। স্লাজের সবটুকু অংশ পচে অজৈব আকরিক পদার্থে ( mineral ) পরিণত হয় না। একটা অংশ থেকে যায়। যাকে তুলনা করা চলে কতকটা হিউমাস (Humus)-এর সাথে। স্লাজের এই অংশকে সাররূপে ব্যবহার করা চলে।

অবায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া যখন মাটির নীচে চৌবাচ্চায় পচন-ক্রিয়া সংঘটিত করে, তখন প্রচুর কারবন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন ($CH_4$) গ্যাস উৎপন্ন হয়।

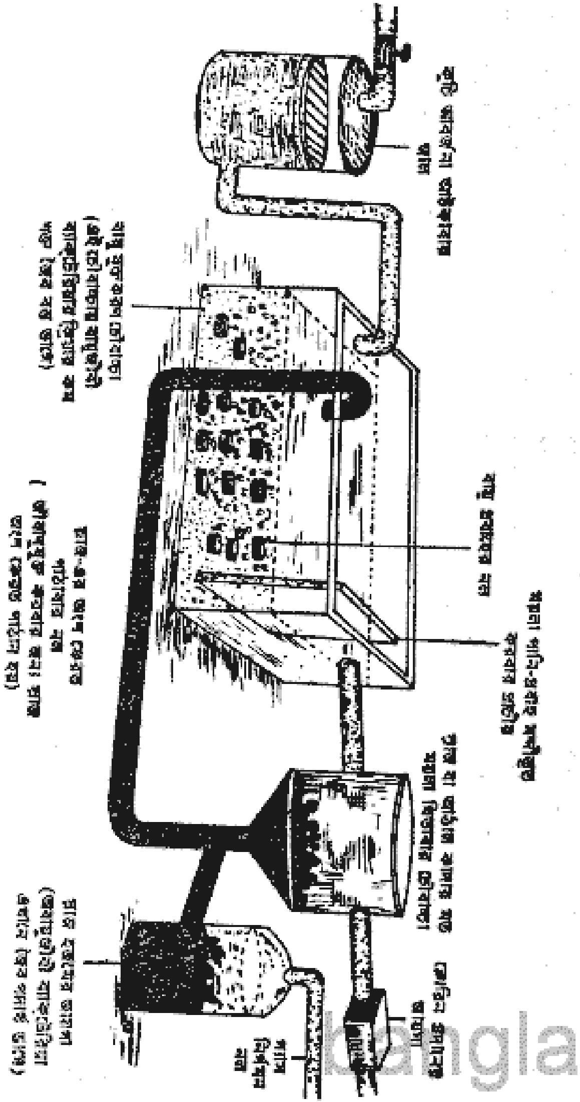

চিত্র ঃ ৮

মিথেন গ্যাস খুবই দাহ্যবস্তু। (জলাভূমিতে যে আলেয়া দেখা যায়, তার কারণ



মিথেন গ্যাস বাতাসের সংস্পর্শে এসে জ্বলে ওঠে)। এই মিথেন গ্যাসের সাহায্যে মেশিন চালিয়ে দূষিত পানি ও স্লাজকে স্থানান্তরিত করা হয়।

স্লাজ থিতিয়ে যাবার পর যে পানি পাওয়া যায় তা হয় প্রকৃত প্রস্তাবে আবর্জনা মুক্ত। এই পানিকে রোগজীবাণু মুক্ত করবার জন্য অনেক সময় ক্লোরিন যোগ করা হয়। এভাবে ময়লামুক্ত এই পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে গাছের খাদ্য-উপাদান থাকে। এই পানিকে তাই সেচের কাজে লাগান যায়। কিন্তু যেহেতু রোগজীবাণু এই পানিতে থাকতে পারে, তাই শাক-সব্জির খেতে এই পানি ব্যবহার না করাই ভাল।

জৈববস্তুকে ঠিকমত পচাবার জন্য উপযুক্ত জীবাণু লাগে। অনেক সময় জৈব পচন ঘটিয়ে দূষিত পানি পরিষ্কার কেন্দ্রে, পচন চৌবাচ্চায় উপযুক্ত জীবাণু যোগ করতে হয়। সাধারণতঃ কি পরিমাণ দূষিত পানির জন্য কি পরিমাণ বায়ু সরবরাহ দরকার তারও হিসাব করা হয়। জৈব পচনের জন্য বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকা দরকার, তাকে বলা হয় **জৈবিক অক্সিজেন চাহিদা** (biological oxygen demand সংক্ষেপে (BOD)। কোন অঞ্চলের দূষিত পানির নমুনাকে একটি বোতলে ২০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ছিপি এঁটে ৫ দিন রাখবার পর দেখা হয় বোতলে কি পরিমাণ অক্সিজেন অবশিষ্ট আছে। এ থেকে হিসাব করা চলে গড়পড়তায় কোন অঞ্চলে দূষিত পানির আবর্জনাকে পচাতে হলে চৌবাচ্চায় কি পরিমাণ বায়ু প্রবাহের প্রয়োজন।

## বায়ুবাহিত জীবাণু

বাতাসে জীবাণুরা প্রধানতঃ ধূলিকণার উপর থাকে। যে বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ যত বেশী সেই বাতাসে তত বেশী সংখ্যায় জীবাণু থাকা সম্ভব। বাতাস নানাপ্রকার রোগজীবাণু বহন করে। এদের মধ্যে ডিপথেরিয়া জীবাণু (Corynebactirium diptheriae), ক্ষয় রোগের জীবাণু (Mycobacterium tuberculosis), নিউমোনিয়ার জীবাণু (Streptococcus pneumoniae) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভাইরাসজনিত রোগ, যেমন বসন্ত, হামজ্বর, মাম্পস ইত্যাদিও বাতাসের মারফত ছড়ায়। বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ তাই স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম উপায়। বড় বড় শহরে, যেখানে অনেক লোক থাকে সেখানে বাতাসকে ধূলিকণা ও জীবাণুমুক্ত করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ আজকাল আরম্ভ হয়েছে। সাধারণভাবে স্কুল-কলেজে, প্রেক্ষাগৃহে, যেখানে অনেক লোক একত্রে থাকে সেখানে যদি বায়ু চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান যায় তবে রোগ-ব্যারাম

banglainternet.com

কম হয়। হাসপাতালের ও বাড়িতে রোগীর ঘরের মেঝেতে যদি তৈলাক্ত পদার্থ দেওয়া যায়, তবে ধুলো উড়া বন্ধ হয়ে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা কমে যায়। হাসপাতালে রোগীর বিছানা খুব কাছাকাছি না রেখে দূরে দূরে রাখলে রোগ সংক্রমণ অনেক কম হয়।

এক সময় ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায় বহু লোক সংক্রামক রোগে প্রাণ হারাতো। ১৮৩২ সালে বিলাতের লিডস্ শহরে কলেরায় ৭০০ লোক প্রাণ হারায়। ১৮৫৪ সালে অক্সফোর্ড শহরে কলেরা ভয়ংকর মহামারী আকারে দেখা দেয়। কিন্তু এসব আজ অতীতের ঘটনা। রোগজীবাণু সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নতি হবার ফলে বহু রোগই আজ উন্নত দেশগুলিতে হয় না। হলেও তার আগের ভয়ঙ্কর রূপ আর নাই।

একটা হিসাবে প্রকাশ, বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়পড়তায় ১৫ হাজারের মত লোক কলেরায় প্রাণ হারায়।* বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের অভাব, মল অপসারণের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা ও জনসাধারণের উপর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকাই এর কারণ। বাংলাদেশের মানুষ নানাবিধ পেটের পীড়ায় ভোগে এই একই কারণে।

* ২৪ জুলাই, ১৯৬৮, পাকিস্তান অবজারভার

ষড়বিংশ অধ্যায়

# মৃত্তিকা ও জীবাণু

সাধারণভাবে বলা যায়, মাটি খুব সূক্ষ্ম উপলকণা (mineral matters) পানি, বাতাস, মৃত জৈব পদার্থ ও জীবন্ত বস্তুর দ্বারা গঠিত। সব মাটিতে সব উপাদানের পরিমাণ সমান নয়। বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকায় উপলকণা, পানি, বাতাস জীবন্ত ও মৃত জৈব বস্তুর পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। আর তার ফলে মাটির চরিত্রও হয়ে থাকে বিভিন্ন। মাটিতে অজৈব উপলকণা হল নানা প্রকার শিলার (rock) ক্ষয়প্রাপ্ত ও রূপান্তরিত অবস্থা। মাটিতে জৈব বস্তু মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদ-দেহ থেকে উৎপন্ন হয়। মাটিতে জীবন্ত বস্তু বলতে বোঝায় গাছের মূল, বিভিন্ন ছোট বড় নানারকম মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকা ক্ষুদ্র প্রাণী ও অসংখ্য জীবাণু। আসলে মাটি, যাকে কেন্দ্র করে কৃষিকাজ চলে, তার একটা বড় অংশই জীবাণুদের ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে গঠিত হয়। জীবাণুর ক্রিয়ার উপর নানাভাবে ভূমির উর্বরতা নির্ভর করে। কৃষিবিদ্যার (agriculture) অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল মৃত্তিকার যথাযথ ব্যবহার মারফত কৃষির উন্নতি বিধান। মৃত্তিকার মধ্যস্থিত জীবাণুদের উপর যেহেতু গাছের জীবন নানাভাবে নির্ভর করে তাই মৃত্তিকা জীবাণুতত্ত্বের (soil microbiology) গুরুত্ব উন্নত কৃষিবিদ্যার ক্ষেত্রে খুবই বেশী। আমরা এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ মৃত্তিকাস্থিত চিতি (mould) ও ব্যাকটিরিয়া (bacteria) সম্পর্কে আলোচনা করবো।

## ১। চিতি (Mould)

আমরা আগে উল্লেখ করেছি (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), চিতি বলতে সাধারণতঃ বোঝায় সেসব ছত্রাকদের যাদের আয়তন আণুবীক্ষণিক অথবা প্রায় আণুবীক্ষণিক। এরা সাধারণতঃ মৃতজীবী (saprophyte)। অর্থাৎ মৃত জৈব বস্তু থেকে আহার্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। চিতিরা সাধারণতঃ অম্লাত্মক (acidic) পরিবেশ পছন্দ করে। তাই অম্লপ্রধান মৃত্তিকায় এদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। চিতিরা সকলেই বায়ুজীবী (aerobic)। অর্থাৎ এরা বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন শ্বাস-ক্রিয়ার জন্যে গ্রহণ করে। বাতাসের মুক্ত অক্সিজেনের সাহায্যে এরা দেহের অভ্যন্তরে শর্করা পদার্থের জারণ (acidation) ঘটিয়ে যে তাপ পায় সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে থাকে। চিতিরা যেহেতু বায়ুজীবী তাই

banglainternet.com

সাধারণতঃ মাটির উপরি স্তরে এরা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মাটির উপরি স্তরে এদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মাটিতে যেসব ছিতি খুব সহজেই উৎপন্ন হতে পারে তারা প্রধানতঃ পেনিসিলিয়াম (Penicillium), মিউকর (Mucor), অ্যাসপারজিলাস (Aspergillus) ও রাইজোপাস (Rhizopus) গণভুক্ত (genus)। জমিতে জৈব পদার্থ (organic matter) যোগ করবার পর মাটিতে ছিতির সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যায়। জৈবপদার্থ পচনের প্রথম পর্যায়ে ছিতির ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী। ছিতি মাড় জাতীয় পদার্থ (starch), সেল্যুলোজ (cellulose) নানা প্রকার আঠাল পদার্থ (gums) ও কাঠের প্রধান উপাদান লিগনিন্ (lignin) নামক জৈব পদার্থের পচনে অংশ গ্রহণ করে।*

অনেক গাছের শিকড়ের সঙ্গে ছত্রাকরা বিশেষ প্রকার সম্বন্ধ সৃষ্টি করে। এই সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয় মাইকোরাইজা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছত্রাক ও উদ্ভিদ শিকড়ের এই সম্বন্ধকে মনে করা যায় পরস্পরের পক্ষে উপকারী বলে। এক্ষেত্রে গাছ ছত্রাকের কাছ থেকে যেমন প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ পেতে পারে তেমনি ছত্রাকও গাছের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু লাভ করতে পারে। মাইকোর্-রাইজা (micorrhiza) কে মনে করা চলে ছত্রাক ও গাছের শিকড়ের মিথোজীবিতা (symboisis) বলে।**

মাটিতে গাছের রোগ উৎপাদক অনেক ছত্রাক থাকতে পারে। যেমন ফিউজেরিয়াম (Fusarium) গণের ছত্রাকরা। এরা সাধারণতঃ গাছের শিকড়কে আক্রমণ করে ও বিষাক্ত পদার্থ (toxin) ক্ষরণ করে গাছের ক্ষতিকর রোগ উৎপাদন করে। মাটির মধ্যেকার অনেক ছিতি আবার বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) পদার্থ সৃষ্টি করে, যারা রোগ উৎপাদক ছত্রাকের উপর কাজ করে। এসব অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থের প্রভাবে এসব রোগ উৎপাদক ছত্রাক বৃদ্ধি পেতে পারে না অথবা মারা যায়। মাটিতে যেসব ছত্রাক এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ উৎপাদন করে তাদের মধ্যে ট্রাইকোডারমা (Trichoderma) গণের (genus) ছত্রাকদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাটিতে সবুজ সার প্রয়োগ করলে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদক ছিতির সংখ্যা বৃদ্ধি

*. সেল্যুলোজ ভাঙবার কাজে সেল্যুলোমোনাস (Cellulomonas) গণের ব্যাকটিরিয়াও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

**. মাইকোররাইজা সম্পর্কে এখানে যা বলা হল তা সাধারণের মত। অনেকে মনে করেন আসলে গাছের শিকড়ে হওয়া এসব ছত্রাক বাস করে পরভোজী (parasite) হিসাবে। তবে সাধারণতঃ এসব ছত্রাক গাছের শিকড়ের মারাত্মক কোন ক্ষতি করে না।

banglainternet.com



পায়। ফলে মাটিতে সবুজ-সার (green manure) প্রয়োগ করলে গাছের রোগ কম হতে দেখা যায়।*

২। ব্যাকটিরিয়া (Bacteria)

মাটিতে যেসব ব্যাকটিরিয়া থাকে তার মধ্যে দণ্ডাকৃতি (rod-shaped) ব্যাকটিরিয়াম প্রধান। এদের অধিকাংশই ফ্ল্যাজেলাযুক্ত। তাই মাটির মধ্যেকার পানিতে এরা সহজেই বিচরণ করে বেড়াতে পারে। সাধারণতঃ যে মাটি যত উর্বর সেই মাটিতে ততবেশী ব্যাকটিরিয়া থাকতে দেখা যায়।

মাটিতে ব্যাকটিরিয়া আলাদা আলাদাভাবে সাধারণতঃ থাকে না। থাকে এক সাথে গায়ে গায়ে উপনিবেশ সৃষ্টি করে। মাটির মধ্যে অজৈব ঔপলিক (mineral) ও জৈবপদার্থ একত্র হয়ে যে আঠাল মিশ্রণের উদ্ভব হয় তা ব্যাকটিরিয়া বৃদ্ধি ও বংশবিস্তারের জন্য উপযুক্ত। মাটিতে ব্যাকটিরিয়ামদের জন্ম-মৃত্যু সাধারণতঃ নির্ভর করে খাদ্য বস্তুর প্রাপ্তির উপর। এছাড়া ভূমির তাপমাত্রা ও পি এইচ (pH), কোন মাটিতে ব্যাকটিরিয়া সংখ্যা বিশেষভাবে নিরূপণ করে।**

মাটির মধ্যেকার অনেক ব্যাকটিরিয়া স্পোর (spore) সৃষ্টি করে। স্পোর-এর সাহায্যে এসব ব্যাকটিরিয়া প্রতিকূল অবস্থায় মাটির মধ্যে টিকে থাকতে পারে।

গাছের শিকড়ের চারপাশের এলাকাকে বলা হয় রাইজোস্ফিয়ার (rhizosphere) বা মূলাঞ্চল। রাইজোস্ফিয়ার-এর মাটিকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় এই অঞ্চলের মাটিতেই জীবাণুর সংখ্যা সবচাইতে বেশী। গাছের শিকড়ের খুব কাছের মাটিতে সিউডোমোনাস (Pseudomonas) ও অ্যাক্রোমোব্যাকটার (Achromobacter) গণের ব্যাকটিরিয়াকে খুব বেশী পরিমাণে হতে দেখা যায়। এরা সবাই গ্রামনেগেটিভ (gram negative)। গ্রাম পজেটিভ (gram positive) ব্যাকটিরিয়া রাইজোস্ফিয়ার-এ থাকে সবচাইতে কম।

বিভিন্ন গাছের শিকড়ের কাছের মাটিতে বিভিন্ন প্রজাতির (species) ব্যাকটিরিয়া হতে দেখা যায়। এসব ব্যাকটিরিয়া গাছের শিকড় থেকে নির্গত

* সবুজ-সার বলতে বোঝায় ধনচা, শন-পাট ইত্যাদি গাছকে সবুজ কাঁচ অবস্থায় লাঙল দিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করা। এসব গাছ পচে জৈবসার উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ উচ্চ জমিতে শন-পাট ও নীচু জমিতে ধনচে গাছের সাহায্যে সবুজ সার তৈরি করা হয়। নীচু জমিতে ধনচে গাছ ব্যবহার করা হয়, কারণ ধনচে গাছ পচাতে অনেক বেশী পানির প্রয়োজন করে।

** কোন মাটির pH যদি ৫·৫ নীচে হয় তবে সেই মাটিতে ব্যাকটিরিয়ামদের সক্রিয়তা কমে আসে।

নানা প্রকার জৈবপদার্থ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। অন্যদিকে এসব ব্যাকটিরিয়া মাটির মধ্যেকার বিভিন্ন পদার্থকে পানিতে দ্রবণযোগ্য করে তোলে। ব্যাকটিরিয়া মাটির মধ্যেকার ফসফরাস, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ ঘটিত অদ্রবণীয় যৌগিক পদার্থের পানিতে দ্রবণীয় পদার্থে রূপান্তরিত করে ভূমির উর্বরতা বিধান করে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়াছে সিউডোমোনাস ( Pseudomonas ) মাইক্রোকক্কাস ( Micrococcus ) ও অন্যান্য আরো অনেক গণের ব্যাকটিরিয়া ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট $[Ca_3(PO_4)_2]$-কে ডাই অথবা মনোবেসিক ফসফেটে রূপান্তরিত করতে পারে।

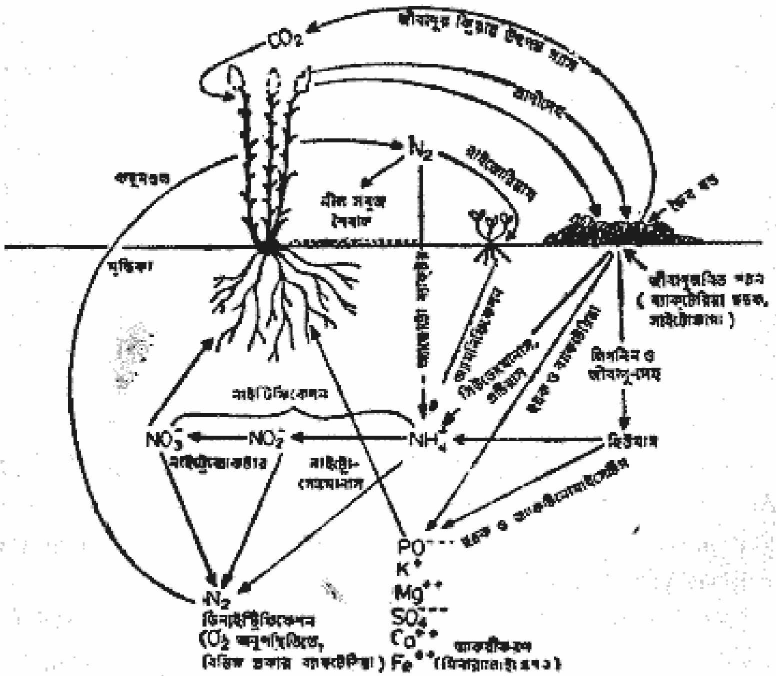


রেখাচিত্র ৯ : মৃত্তিকা ও জীবাণু

মনোবেসিক ফসফেট পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়। ব্যাকটিরিয়া ও রাইজোস্ফিয়ার-এর অন্যান্য জীবাণু সাধারণতঃ যে অম্ল (acid) ক্ষরণ করে তার প্রভাবেই ফসফেটের এই রূপান্তর ঘটে। গাছ মাটি থেকে খাদ্যবস্তু প্রধানতঃ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় গ্রহণ করে। ব্যাকটিরিয়া গাছের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুকে পানিতে দ্রবীভূত হতে সাহায্য করে ভূমির উর্বরতা সাধন করে। ব্যাকটিরিয়া জমির ফলন-শক্তি আরো নানাভাবে বৃদ্ধি করে (চিত্র-৯)।

banglainternet.com



## হিউমাস সংগঠন

মাটিতে গাছপালাদের দেহ পচে যে কাল অথবা গাঢ় বাদামী রঙের জৈব বস্তু উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় হিউমাস (humus) বা পচা সার। মাটিতে জৈব পদার্থ জীবাণুদের ক্রিয়ায় ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। যখন জমিতে কোন জৈব পদার্থ যোগ করা হয়, যথা সবুজ-সার, তখন তার মধ্যেকার রসে দ্রবীভূত শর্করা পদার্থ (sugars) প্রথম গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটিরিয়া, যথা ল্যাকটো ব্যাসিলাস ও করেনি ব্যাকটিরিয়াম দ্বারা আক্রান্ত হয়। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়া, যথা কলিফর্ম-রাও এই ক্রিয়ায় অংশ নেয়। এর পরে আক্রান্ত হয় হেমিসেলুলোজ (hemicellulose), সেলুলোজ (cellulose), স্নেহ (fat) ও প্রোটিন পদার্থ। কিন্তু দ্রবীভূত শর্করা পদার্থের চাইতে জটিল পদার্থ পচতে সময় লাগে বেশী। কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত লাগাতে পারে গাছের দেহের বিভিন্ন জটিল শর্করা (complex carbohydrate) স্নেহ ও প্রোটিন পদার্থ পচতে, অর্থাৎ ভেঙ্গে অপেক্ষাকৃত সহজ পদার্থে পরিণত হতে। এই সময় মাটিতে জীবাণুদের সংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন জৈব পদার্থ থেকে পুষ্টি লাভ করে জীবাণুরা এই সময় দ্রুত বংশবিস্তার করে। কিন্তু গাছের দেহের সবচেয়ে শক্ত জৈব পদার্থ কাঠের প্রধান উপাদান লিগনিন (lignin)-এর অধিকাংশই এই জৈব পচন-ক্রিয়ার ( biological dicomposition ) ফলে পরিবর্তিত হয় না। এই লিগনিন, পচে যাওয়া জৈব বস্তুর কিছু অংশ ও জীবাণুদেহ মিলে তৈরি হয় হিউমাস (চিত্র-৯)। হিউমাস নানাভাবে জমির উর্বরতা বর্ধন করতে পারে। হিউমাস মাটিতে প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে। জমিকে শুকিয়ে চাষের অনুপযোগী হতে দেয় না। হিউমাস মাটিতে অম্লতা ও ক্ষারতা (acidity and alkalinity) মাত্রা বাড়তে দেয় না, একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বজায় রাখে। হিউমাস জমির সংগঠন ভাল করে। বেলে মাটির কণাকে হিউমাস একত্রে ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলে বেলে মাটি দোআঁশ মাটির (loam) মত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে কাদা মাটিতে হিউমাস মাটির খুব ছোট কণাগুলিকে একত্র করে বড় কণায় পরিণত করে। ফলে মাটির সংগঠন অপেক্ষাকৃত ফাঁপা (porous) হয়ে ওঠে এবং জমি চাষের ও উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিশেষ উপযোগী হয়। অর্থাৎ হিউমাস বেলে মাটিকে অপেক্ষাকৃত কম ফাঁপা ও কাদামাটিকে ফাঁপাল করে। ফলে জমির উর্বরতা বেড়ে যায়। কারণ এসব জমিতে গাছের শিকড় সহজে বাড়তে পারে। বাতাস ও প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদন (food element) সহজে গ্রহণ করতে পারে। হিউমাস যেহেতু

মাটিতে প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে তাই গাছের খাদ্য-উপাদান সহজে ধুয়ে গিয়ে মাটিকে অনুর্বর করে তুলতে পারে না।

হিউমাস জটিল জৈব পদার্থ, সহজে পচে না। কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন জীবাণুর ক্রিয়ায় পচে। লিগনিন পদার্থ ভাঙতে সবচেয়ে বেশী সময় লাগে। কিন্তু ছত্রাক ও অ্যাকটিনোমাইসেটিস (actinomycetes)-এর এনজাইম প্রভাবে তা-ও ভাঙে। তাই শেষ পর্যন্ত হিউমাস ভেঙে বিভিন্ন অজৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। হিউমাস ভেঙে নাইট্রেট, ফসফেট, পটাস ও গাছের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যে অজৈব পদার্থের উদ্ভব হয়, তা ভূমির উর্বরতা সাধন করে। গাছের শিকড় সাধারণতঃ পানিতে দ্রবীভূত অজৈব খাদ্য-উপাদান গ্রহণ করে। জৈব পদার্থ জীবাণুদের ক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত অজৈব বস্তুতে পরিণত না হলে মাটিতে এসব বস্তুর পরিমাণ কমে যেত। ফলে উচ্চতর উদ্ভিদদের জীবনধারণ সম্ভব হত না। জীবাণুদের ক্রিয়ার উপর তাই উদ্ভিদ-জগৎ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আর উদ্ভিদ-জগতের কাছ থেকেই শেষ পর্যন্ত প্রাণী-জগৎ তার প্রয়োজনীয় সকল প্রকার খাদ্য-বস্তু পেয়ে থাকে।

## নাইট্রোজেন-চক্র

বাতাসের শতকরা ৭৮ ভাগ হল নাইট্রোজেন গ্যাস ( $N_2$ )। কিন্তু অধিকাংশ উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তাদের দেহের প্রোটিন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না। সাধারণতঃ গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রেট অবস্থায় ($NO_3$)। মাটিতে প্রোটিন পদার্থ প্রথমে ভেঙে পলিপেপটাইড (polypeptide)-এ পরিণত হয়। এই পলিপেপটাইড ভেঙে শেষে অ্যামনিয়ার ($NH_3$) উদ্ভব ঘটায়। প্রোটিন থেকে ভিন্ন জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে অ্যামনিয়া উদ্ভবকে বলা হয় **অ্যামনিফিকেশন** (amonification) বা অ্যামনিয়াকরণ। এই অ্যামনিয়া আবার জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে নাইট্রাইট-এ ($NO_2$)৩ এবং নাইট্রাইট আবার জীবাণুর ক্রিয়ায় নাইট্রেট-এ ($NO_3$) পরিণত হয়। অ্যামনিয়া থেকে জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রেট উদ্ভবকে বলা হয় **নাইট্রিফিকেশন** (nitrification) বা নাইট্রেটকরণ। এভাবে জমিতে জৈব পদার্থ ভেঙে নাইট্রেটের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে মাটিতে অনেক জীবাণু আছে যারা বাতাসের নাইট্রোজেন সরাসরিভাবে গ্রহণ করতে পারে। এই নাইট্রোজেন থেকে এরা এদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করতে পারাকে বলা হয়



**নাইট্রোজেন ফিক্সেশন** ( nitrogen fixation ) বা নাইট্রোজেন ধৃতি। মাটিতে যখন মুক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে অথবা থাকে না, তখন অনেক জীবাণু নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থ ভেঙে তাদের দেহক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ-শক্তি লাভ করে থাকে। সাধারণতঃ জমিতে বদ্ধ জল থাকলে এই পদ্ধতি ঘটে। এভাবে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থ ভাঙবার সময় নাইট্রোজেন গ্যাস ছাড়া পায়।

নকশা-১

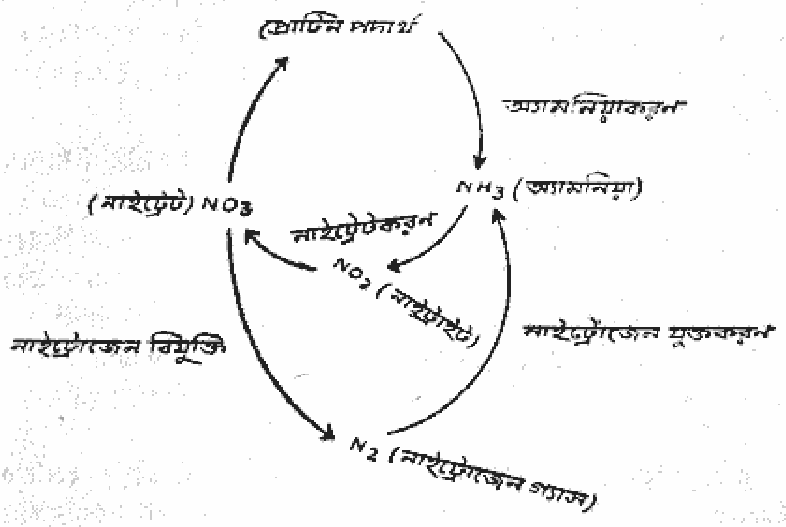


নাইট্রোজেন চক্র (NITROGEN CYCLE)

এই নাইট্রোজেন গ্যাস ছাড়া পাওয়াকে বলা হয় **ডি-নাইট্রিফিকেশন** (denitrification) বা নাইট্রোজেন বিমুক্তি। এর ফলে জমি অনুর্বর হয়ে ওঠে। প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন থেকে প্রোটিন পদার্থের উদ্ভব ও সেই প্রোটিন পদার্থ থেকে অ্যামনিয়া, নাইট্রেট ও নাইট্রাইট ও শেষে জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে মুক্ত নাইট্রোজেন-এর উদ্ভবকে বলা হয় নাইট্রোজেন-চক্র (নকশা-১)।

মাটিতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু অংশ গ্রহণ করে নাইট্রোজেন-চক্রে। প্রোটিন ভেঙে অ্যামনিয়া উদ্ভব করবার প্রক্রিয়ায় বায়ুজীবী ( aerobic ) ও অবায়ুজীবী (anaerobic ), উভয়বিধ ব্যাকটিরিয়া অংশ গ্রহণ করে। যেসব এনজাইম

banglainternet.com

এই প্রোটিন ভেঙ্গে শেষ পর্যন্ত অ্যামনিয়া উদ্ভব হবার রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে তারা সবাই জীবাণুদেহের বাইরে ক্ষরিত হয়। এসব এনজাইম-এর মধ্যস্থতায় প্রোটিন অণু ধীরে ধীরে পানির সাথে যুক্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এই ধরনের ভেঙ্গে পড়াকে বলা হয় হাইড্রোলাইসিস (hydrolysis) বা আর্দ্র-বিশ্লেষ। এই পদ্ধতি আমাদের পাক-যন্ত্রে প্রোটিন হজম প্রক্রিয়ার অনুরূপ। তাই এই পদ্ধতিকে অনেক সময় উল্লেখ করা হয় এনজাইমিক ডাইজেশন (enzymic digestion) বা হজম-ক্রিয়া বলে। প্রোটিন ভাঙবার কাজে যেসব জীবাণু অংশ গ্রহণ করে তার মধ্যে **সিউডোমোনাস** (Pseudomonas) ও **প্রোটিয়াস** (Proteus) গণের ব্যাকটিরিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাটিতে সিউডোমোনাস গণ-এর ব্যাকটিরিয়ারা অবশ্য বহুবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

অ্যামনিয়া থেকে নাইট্রাইট উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ **নাইট্রোসোমোনাস** (Nitrosomonas) গণের ব্যাকটিরিয়ামদের ক্রিয়া। আর নাইট্রাইট থেকে নাইট্রেট উদ্ভব হয় প্রধানতঃ **নাইট্রোব্যাকটার** (Nitrobacter) গণের ব্যাকটিরিয়া। এসব ব্যাকটিরিয়া এদের পুষ্টির জন্য জৈব পদার্থের প্রয়োজন করে না। এরা মাটিতে অজৈব বস্তু থেকে খাদ্য-উপাদান গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ এরা সকলেই অটোট্রোফিক (Autotrophic) বা অজৈবভোজী। এরা অ্যামনিয়া থেকে নাইট্রাইট ও নাইট্রেট উৎপাদনের সময় যে তাপ-শক্তি ছাড়া পায় তা থেকে এদের প্রয়োজনীয় কর্ম-শক্তি লাভ করে।

**নাইট্রোসোমোনাস** (Nitrosomonas) ও **নাইট্রোব্যাকটার** (Nitro bacter) গণের ব্যাকটিরিয়া দণ্ডাকৃতি ও গ্রাম-নেগেটিভ। নাইট্রোসোমোনাস গণের ব্যাকটিরিয়ামদের এক মাথায় একটা করে ফ্যাজেলা থাকে কিন্তু নাইট্রোব্যাকটারদের থাকে না।

নাইট্রোজেন বিযুক্তির প্রক্রিয়াতেও একাধিক প্রজাতির ব্যাকটিরিয়া অংশ গ্রহণ করে থাকে। এদের মধ্যে সিউডোমোনাস (Pseudomonas) ব্যাসিলাস (Bacillus) ও মাইক্রোকক্কাস (Mycrococcus) গণের ব্যাকটিরিয়া হল প্রধান। নাইট্রোজেন বিযুক্তকরণের ক্ষেত্রে সালফার ব্যাকটিরিয়াও অংশ গ্রহণ করে। সালফার ব্যাকটিরিয়ামদের মধ্যে **থায়োব্যাসিলাস ডিনাইট্রিফিক্যান্স** Thiobacillus (denitrificans)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রজাতির ব্যাকটিরিয়ামরা গন্ধকের সাথে নাইট্রেট-এর রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায় এবং এই পদ্ধতিতে শেষে নাইট্রোজেন গ্যাস ($N_2$) ছাড়া পায়।



## নাইট্রোজেন ধৃতি

আমরা নাইট্রোজেন চক্রের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি অনেক ব্যাকটিরিয়া বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে জৈব পদার্থ উৎপন্ন করতে পারে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় নাইট্রোজেন ধৃতি বা নাইট্রোজেন ফিক্সেশন (Nitrogen fixation)। জমির উর্বরতা বর্ধনে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব ব্যাকটিরিয়া নাইট্রোজেন ধৃতি পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করে তাদের দুটি দলে বিভক্ত করা চলে। প্রথম দলটিকে বলা যায় মুক্ত দল। দ্বিতীয় দলকে বলা যায় মিথোজীবী (symbiotic)। প্রথম দলের ব্যাকটিরিয়া দুইটি গণে পড়ে : **অ্যাজোটোব্যাকটার ও ক্লস্ট্রিডিয়াম**। এই দুইটি গণের ব্যাকটিরিয়া মাটির মধ্যে স্থায়ীভাবে বাস করে। মাটির মধ্যে থেকেই এরা বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেনকে কাজে লাগায়। মুক্ত নাইট্রোজেন থেকে এদের মধ্যে প্রথমে অ্যামনিয়া উৎপন্ন হয়। অ্যামনিয়া থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড (যথা, গ্লুটামিক অ্যাসিড) ও অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন পদার্থ উৎপন্ন হয়। অ্যাজোটোব্যাকটার ও ক্লস্ট্রিডিয়াম গণের ব্যাকটিরিয়া দণ্ডাকৃতি। অ্যাজোটোব্যাকটার গণের ব্যাকটিরিয়া বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন ছাড়া বাঁচে না। অর্থাৎ এরা বায়ুজীবী (aerobic)। কিন্তু ক্লস্ট্রিডিয়াম গণের ব্যাকটিরিয়া বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন ছাড়াই বাঁচে। এরা অবায়ুজীবী (anaerobic)। অ্যাজোটোব্যাকটার গণের সকলেই নাইট্রোজেন ধৃতি ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু ক্লস্ট্রিডিয়াম গণের অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়াই নাইট্রোজেন ধৃতি ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। ক্লস্ট্রিডিয়াম গণের ব্যাকটিরিয়াদের মধ্যে ক্লস্ট্রিডিয়াম পাস্তুরিয়েনাম (Clostridium pastutianum) নাইট্রোজেন ধৃতি সব চাইতে কার্যকর।*

মিথোজীবী নাইট্রোজেন ধৃতি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাকটিরিয়া সব এক গণে ফেলা হয়। এখন এই গণকে বলা হয় **রাইজোবিয়াম** (Rhizobium)। রাইজোবিয়াম গণের ব্যাকটিরিয়া মাটিতে থাকে। কিন্তু যখন সিম জাতীয় গাছের (Leguminous) শিকড়ের সংস্পর্শে আসে তখন তারা তাদের আক্রমণ করে ও শিকড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। শিকড়ের যে অংশে এরা প্রবেশ করে তার চার ধারের কোষগুলি দ্রুত বিভক্ত হতে থাকে ও শিকড়ের ঐ অংশ আবের মত ফুলে ওঠে। এই ফুলে ওঠা অংশকে বলা হয় নডিউল (Nodule) বা

* ব্যাকটিরিয়া ছাড়া নীল-সবুজ শৈবাল, নস্টক (Nostoc); অ্যাকটিনোমাইসেটিস, নোকারডিয়া (Nocardia); ও ছত্রাক, ফোমা (Phoma) নাইট্রোজেন যুক্তকরণ শক্তিসম্পন্ন।

banglainternet.com

দানা। দানার মধ্যে এসব ব্যাকটিরিয়া গাছের দেহ থেকে শর্করা পদার্থ গ্রহণ করে। অন্যদিকে এসব ব্যাকটিরিয়া দেহ থেকে ক্ষরিত নাইট্রোজেনঘটিত জৈব পদার্থ গাছ গ্রহণ করে। এভাবে গাছ ও ব্যাকটিরিয়া পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হয়। যেহেতু ব্যাকটিরিয়া ও গাছ উভয়ে এ ক্ষেত্রে এই যোগাযোগের ফলে লাভবান হয় তাই এই যোগাযোগকে বলা হয় মিথোজীবিতা (symbiosis)।

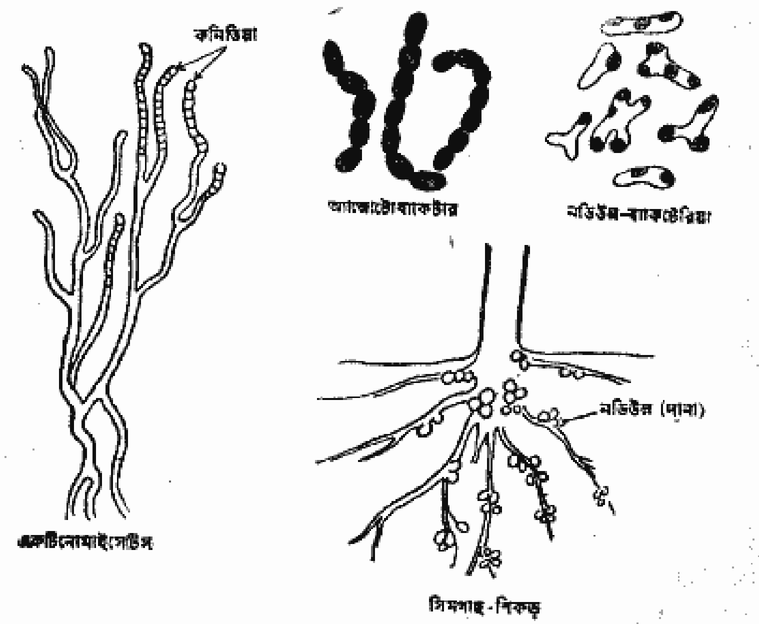


রেখাচিত্র ১০ : অ্যাজোটোব্যাকটার, সিমগাছ ও নডিউল ব্যাকটেরিয়া; অ্যাকটিনোমাইসেটিস

রাইজোবিয়াম গণের ব্যাকটিরিয়ামদের জন্য সিম জাতীয় গাছ, যে জমিতে নাইট্রোজেন কম থাকে সেই জমিতেও জন্মাতে পারে। রাইজোবিয়াম গণের ব্যাকটিরিয়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে যে পরিমাণ যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, তার সবটা সিম গাছের প্রয়োজনে লাগে না। এই নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ মাটির সাধারণ উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

সব রাইজোবিয়াম সব রকম সিম জাতীয় গাছের শিকড়ে হতে পারে না। তাই মাটিতে উপযুক্ত ব্যাকটিরিয়া না থাকলে সেই জমিতে কোন বিশেষ সিম জাতীয় গাছের চাষ করা যায় না, যদি না মাটিতে যথেষ্ট নাইট্রেট থাকে। আজকাল তাই অনেক দেশে মাটিতে উপযুক্ত রাইজোবিয়াম ব্যাকটিরিয়া যোগ



করা হয় চাষের সুবিধার জন্য। উপযুক্ত রাইজোবিয়াম গণের ব্যাকটিরিয়া কৃত্রিম উপায়ে আবাদ মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়। পরে এদের মাটির সাথে মিশিয়ে থলিতে করে বাজারে বিক্রি করা হয়। কৃষকরা এসব ব্যাকটিরিয়া ক্রয় করে জমিতে প্রয়োগ করে। চীনাবাদাম চাষ করবার জন্য একরকম ব্যাকটিরিয়া, মটরশুটি চাষ করলে আবার আর একরকম ব্যাকটিরিয়া এমনি-ভাবে বিভিন্ন প্রকার রাইজোবিয়াম গণের ব্যাকটিরিয়া যোগ করে এসব ফসলের আবাদ এখন অনেক সহজ হয়েছে।

রাইজোবিয়ামের আকার সাধারণতঃ দণ্ডাকৃতি। যখন এরা মাটির মধ্যে থাকে তখন দেহের চতুষ্পার্শ্বস্থ ফ্লাজেলার সাহায্যে নড়াচড়া করে বেড়ায়। কিন্তু যখন এরা গাছের শিকড়ের মধ্যে প্রবেশ করে তখন নানা আকার ধারণ করে। অনেককে দেখায় এক্স ( x ) ও ওয়াই ( y ) অক্ষরের মত। অনেকে আবার পরিণত হয় গোকার ক্লাই-এ।

কি করে বাতাসের নাইট্রোজেনকে ব্যাকটিরিয়া কাজে লাগায় তা নিয়ে এ যাবৎ অনেক গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এখনো এ বিষয়ে অনেক কিছুই জানা যায়নি। তবে এসব ব্যাকটিরিয়া যখন গাছের শিকড়ে থাকে তখন হিমোগ্লোবিন নামক পদার্থ উৎপাদন করতে পারে। মনে হয় হিমোগ্লোবিন নাইট্রোজেন ধৃতিতে সাহায্য করে।

## নীল-সবুজ শৈবাল কর্তৃক নাইট্রোজেন ধৃতি

নীল-সবুজ শৈবালরা অনেকে বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে অ্যামনিয়া উৎপাদন করতে পারে এবং শেষে এই অ্যামনিয়া থেকে তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎপাদন করে। যেসব নীল-সবুজ শৈবাল বাতাসের নাইট্রোজেনকে কাজে লাগাতে পারে, তাদের মধ্যে অ্যানাবিনা ভেরিবিয়েলিস (Anabaena variabilis ), অ্যানাবিনা জিলেটিনোজা ( A. gelatinosa ) ও অ্যানাবিনা নেভিকুলোয়ডেস ( A. naviculoides )-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পি, কে, দে-র (P. K. De) মতে ধান খেতে নীল-সবুজ শৈবাল বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে যে অ্যামনিয়া ও পরে প্রোটিন পদার্থ উৎপাদন করে, তা ধান খেতের উর্বরতা বজায় রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।* দে ও সুলেমান

* De, P. K. (1936): The Problems of Nitrogen Supply of Rice. Fixation of Nitrogen under waterlogged conditions. Indian J. Agric. Sc. 6: 123—1245.

banglainternet.com

-এর কাজ থেকে মনে হয় নীল সবুজ শৈবাল বাংলাদেশের অবস্থায় ধান চাষের বিশেষ সহায়ক।*

অনেক দেশেই এখন ধান খেতের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য নীল-সবুজ শৈবালদের বাছাই করে জমিতে যুক্ত করা হচ্ছে। বিশেষ করে জাপানে। দে' ও সুলেমান নীল-সবুজ শৈবাল নিয়ে কাজ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের কাজ, ধানখেতে নীল-সবুজ শৈবালের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রথম সবার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

### ইউরিয়া গাঁজন

প্রোটিন ছাড়া যেসব নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব-পদার্থ মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তা হল ইউরিয়া। ইউরিয়া প্রাণী দেহ থেকে মূত্রের সঙ্গে নির্গত হয়। গো-চনা উত্তম সার। কারণ, গো-চনার যথেষ্ট ইউরিয়া (urea) থাকে। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে ইউরিয়া প্রস্তুত করে, সার হিসাবে তা জমিতে প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও ইউরিয়া সার প্রস্তুতের কারখানা আছে। প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন) ও বাতাসের নাইট্রোজেনের সাহায্যে ইউরিয়া প্রস্তুত করা যায়।

মাটিতে ইউরিয়া সার প্রদান করলে জীবাণুর ক্রিয়ায় ইউরিয়া পরিণত হয় অ্যামনিয়াম কার্বনেটে, $(NH_4)_2CO_3$। এই অ্যামনিয়াম কার্বনেট থেকে অন্য আর এক প্রকার জীবাণুর ক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম নাইট্রাইট, $Ca(NO_2)_2$ উৎপন্ন হয়। পরে আর এক প্রকার জীবাণু এই নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে, $Ca(NO_3)_2$ রূপান্তরিত করে।

যারা ইউরিয়াকে প্রথমে অ্যামনিয়াম কার্বনেটে রূপান্তরিত করে তারা ইউরিয়াজ (urease) নামক এক প্রকার এনজাইম উৎপাদন করে। ইউরিয়াজ এনজাইমের মধ্যস্থতায় ইউরিয়া থেকে অ্যামনিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হওয়াকে বলা হয় ইউরিয়া গাঁজন :

$$\underset{\text{ইউরিয়া}}{CO(NH_2)_2} + 2H_2O = \underset{\text{অ্যামনিয়াম কার্বনেট।}}{(NH_4)_2CO_3}$$

অ্যামনিয়াম কার্বনেট একটি উদ্বায়ী (volatile) বস্তু। সহজেই মাটি থেকে উবে যেতে পারে। এ-ছাড়া অ্যামনিয়াম কার্বনেট ভেঙ্গে একটা অংশ

* De, P. K. & M. Sulaiman (1950) : Influence of Algal growth in the Rice fields on yield of Crop. Indian J. Agric. Sci., 20 : 327–342.

banglainternet.com



দ্রুত অ্যামনিয়ায় পরিণত হয়। এভাবে নাইট্রোজেনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের অপচয় ঘটে। ইউরিয়ার সঙ্গে সুপারফসফেট (superphosphate of lime) প্রদান করলে, অ্যামনিয়াম কার্বনেট থেকে সহজেই ক্যালসিয়াম নাইট্রেট উৎপাদিত হতে পারে। ফলে ইউরিয়া সারের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

অনেক ব্যাকটিরিয়াম ইউরিয়া গাঁজনে অংশ নেয়। এদের মধ্যে সারসিনা ইউরিয়া (Sarcina ureae), মাইক্রোকক্কাস ইউরিয়া (Micrococcus ureae) ও ব্যাসিলাস পাস্তুরি (Bacillus parsteurii)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মৃত্তিকার উর্বরতা বিধানে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৃত্তিকার উর্বরতা বিধানে জীবাণুদের ভূমিকা প্রথম প্রমাণ করে দেখান ওলন্দাজ জীবাণুবিদ বেইজারিঙ্ক (Beijarrink)। তিনি প্রথমে (১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে) সিমগাছের শিকড়ে ব্যাকটিরিয়া কর্তৃক নাইট্রোজেন ধৃতির কথা প্রমাণ করে দেখান। এরপরে আর একজন বৈজ্ঞানিক মৃত্তিকায় জীবাণুদের ভূমিকা নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করেন, তিনি হলেন ভিনোগ্রাদস্কি (Winogradsky)। তিনি জাতিতে ছিলেন রুশ। কিন্তু তাঁর গবেষণা জীবনের মূল্যবান অংশ কাটে ফ্রান্সে। তিনি প্রথম (১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে) প্রমাণ করে দেখান কি করে জীবাণুক্রিয়ার ফলে মাটিতে অ্যামনিয়া নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবশেষে নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। বেইজারিঙ্ক (১৮৫১-১৯৩১) ও ভিনোগ্রাদস্কি (১৮৫৬-১৯৫৩) বলা চলে মৃত্তিকা জীবাণুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

# সামুদ্রিক জীবাণু

পৃথিবীপৃষ্ঠের চারভাগের প্রায় তিন ভাগ হল সমুদ্র। সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবন নানাভাবে সামুদ্রিক জীবাণুদের উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ সামুদ্রিক মাছ শৈবাল খেয়ে বাঁচে। শৈবালদের অধিকাংশই আণুবীক্ষণিক, যেমন ডায়াটম। এরা সমুদ্রের পানির উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে। সাধারণতঃ এ রকম ভাসমান ক্ষুদ্র শৈবালপুঞ্জকে বলা হয় ফাইটোপ্লাংকটন (Phytoplankton)। যেসব শৈবাল আণুবীক্ষণিক তাদের সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় ন্যানোপ্লাংকটন (Nanoplankton) হিসাবে। ডায়াটম, ডাইনো ফ্ল্যাজেলেট প্রভৃতি ন্যানোপ্লাংকটনের অন্তর্গত। ব্যাকটিরিয়া সাধারণতঃ থাকে সমুদ্রে ভাসমান শৈবালদের সঙ্গে। ব্যাকটিরিয়া জৈব বস্তু ভেঙ্গে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন করে তা এসব শৈবাল সালোক-সংশ্লেষণে কাজে লাগায়। ব্যাকটিরিয়া জৈববস্তুকে পচিয়ে যে নাইট্রেট, ফসফেট ও পটাস উৎপাদন করে, শৈবালপুঞ্জ তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। সামুদ্রিক প্রাণীরা শৈবাল খেয়ে বেঁচে থাকে। তারা যখন মারা যায় তখন ব্যাকটিরিয়া আবার তাদের পচিয়ে তোলে। ফলে শৈবালের উপযোগী খাদ্য উৎপাদন ছাড়া পায়। অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়া ও শৈবালের মধ্যে সৃষ্টি হয় নানাভাবে পরস্পর নির্ভরতার সম্পর্ক। জীবাণুদের ক্রিয়ার ফলে মাটির মত সমুদ্রের বজায় থাকে খাদ্য-চক্র (food-cycle)। চলে জৈব-বস্তু থেকে অজৈববস্তু এবং অজৈববস্তু থেকে জৈববস্তু উৎপাদন।

## সামুদ্রিক ব্যাকটিরিয়ামের বিতরণ (Distribution)

সব সমুদ্রের পানিতে ব্যাকটিরিয়া সমান সংখ্যায় থাকে না। যেসব সমুদ্র স্থলভাগের অভ্যন্তরে অবস্থিত ( Inland sea ), তাদের পানিতে ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা মুক্ত সমুদ্র ( open sea) থেকে হয় অনেক বেশী। বালটিক সাগরের পানিতে যে পরিমাণ ব্যাকটিরিয়া থাকে তা মুক্ত সমুদ্রের পানির চাইতে সংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণ। তাছাড়া একই সমুদ্রের পানিতে সর্বত্র ব্যাকটিরিয়া সংখ্যা এক থাকে না। ব্যাকটিরিয়া সংখ্যা বিশেষভাবে পানির গভীরতার উপরেও নির্ভরশীল। সমুদ্রের উপরিভাগে যত সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া থাকে, সমুদ্রের পানির গভীরে তা থাকে না। সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে



যত নীচে যাওয়া যায় ব্যাকটিরিয়া-সংখ্যা তত কমে আসতে থাকে। ২০০ মিটার নীচে ব্যাকটিরিয়া সংখ্যা দাঁড়ায় খুব কম।

## সামুদ্রিক ব্যাকটিরিয়ামের বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

সমুদ্রে যেসব ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায় তারা অধিকাংশই দণ্ডাকৃতি ; ফ্ল্যাজেলাযুক্ত ও গ্রাম-নেগেটিভ। সমুদ্রের পানিতে অ্যাক্রোমব্যাকটার (Achrcom-bacter) ও সিউডোমোনাস (Pseudomonas) গণের ব্যাকটিরিয়া সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু এরা আকৃতির দিক থেকে মাটির মধ্যে ও নর্দমার পচা পানিতে এই দুই গণের যেসব ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায়, তার চাইতে সাধারণতঃ হয় ছোট। সমুদ্রের পানিতে স্পোর উৎপাদক (spore froming) ব্যাকটিরিয়া থাকে খুবই কম। কেবল সাগর সৈকতে কাদার মধ্যে স্পোর উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া যথেষ্ট সংখ্যায় থাকতে পারে। গোলাকার (cocci) ব্যাকটিরিয়াও সমুদ্রের পানিতে খুব কম থাকে।

সমুদ্রের পানিতে যেসব ব্যাকটিরিয়া থাকে তাদের অধিকাংশই সহজে প্রোটিন ভেঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে (protiolytic) অধিকাংশ সামুদ্রিক ব্যাকটিরিয়া বর্ণ উৎপাদক (chromogenic)। অনেক সামুদ্রিক ব্যাকটিরিয়া আলোক-উৎপাদক। এদের দেহের এনজাইম প্রক্রিয়ায় প্রায় উত্তাপবিহীন এক প্রকার আলোক সৃষ্টি হয়। এদের এই আলোক সৃষ্টির ক্ষমতা কতকটা জোনাকি পোকার মত ( নক্শা ২ )। এই ধরনের আলোক উৎপাদনকে বলা হয় **জৈব-আলোক** বা **বায়লুমিনেসেন্স** (bioluminescence)।

সমুদ্রের পানিতে সাধারণতঃ শতকরা ৩'৩ থেকে ৩'৬ ভাগ লবণ দ্রবীভূত থাকে। এই লবণের শতকরা ৪৫ ভাগ হল সাধারণ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)। সমুদ্রের পানিতে যেসব ব্যাকটিরিয়া থাকে তারা তাদের বৃদ্ধি ও বংশবিস্তারের জন্য কৃত্রিম আবাদ-মাধ্যম (culture media) এই পরিমাণ লবণের প্রয়োজন করে। সমুদ্রের পানিতে যে ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায় তারা সাধারণতঃ ১২-২৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যথাযথভাবে বংশবিস্তার করতে পারে। সমুদ্রের পানিতে খুব কম ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গিয়েছে যারা ৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যথাযথভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। সমুদ্রের পানিতে যেসব ব্যাকটিরিয়া থাকে তাদের যখন কৃত্রিম আবাদ-মাধ্যমে চাষ করা হয় তখন তাদের থেকে যেসব উপনিবেশের সৃষ্টি হয় তারা সাধারণতঃ-ভূভাগ থেকে প্রাপ্ত অনুরূপ ব্যাকটিরিয়ার উপনিবেশ থেকে হয়ে থাকে অনেক ছোট ছোট। সামুদ্রিক

banglainternet.com

মৎস্যের দেহ থেকে অনেক ব্যাকটিরিয়া পৃথক করা হয়েছে। এরা সাধারণতঃ থাকে মাছের ফুলকা ও পরিপাক অন্ত্রের মধ্যে। এরা সবাই দণ্ডাকৃতি ও গ্রাম-নেগেটিভ। সামুদ্রিক মাছের অন্ত্রের মধ্যে যেসব ব্যাকটিরিয়া থাকে তারা

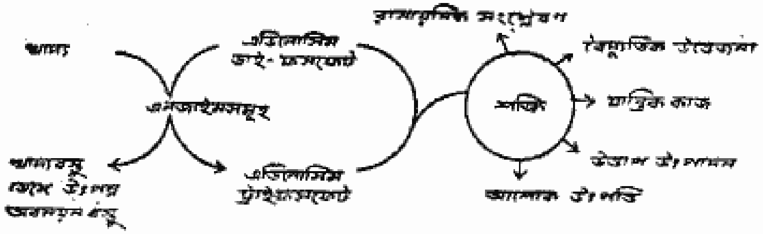


ব্যাকটিরিয়া-দ্বারা আলোক উৎপত্তি

অনেকে মাছের হজম-ক্রিয়ায় সাহায্য করে। অনেক ব্যাকটিরিয়া সেলুলোজ (cellulose) ভেঙ্গে দ্রবণীয় শর্করা (soluble sugars) উৎপাদন করে মাছকে সেলুলোজ হজমের কাজে সাহায্য করে।

সমুদ্রে ব্যাকটিরিয়া সাধারণতঃ সমুদ্রের পানির উপরিভাগে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের একেবারে তলদেশে পঙ্কের মধ্যেও ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গিয়েছে। এসব ব্যাকটিরিয়া অবায়ুজীবী (anaerobic)। যেসব অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় তার স্তর আদিম সামুদ্রিক শিলার দ্বারা গঠিত। অনেকে অনুমান করেন, ব্যাকটিরিয়ামদের ক্রিয়ার ফলে এসব অঞ্চলে অতি প্রাচীনকালে সামুদ্রিক জীবদের মৃতদেহ ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে পেট্রোলিয়াম-এর উদ্ভব হয়েছে।

সমুদ্রে ব্যাকটিরিয়া নানা প্রকার ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করে। গ্যালিওনেলা (Gallionella) গণের ব্যাকটিরিয়া মরিচার আকারে লোহের তলানি (sediment) সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশের সমুদ্রের পানি নিয়ে এখন বিশেষ কোন গবেষণা হয়নি। চাটগাঁ বন্দরের কাছে সমুদ্র থেকে পানি সংগ্রহ করে লেখক ও তার ছাত্র কিছু কাজ করেন। তাঁরা দেখতে পান এই পানিতে দুইটি প্রজাতির দণ্ডাকৃতি গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়া খুব বেশী পাওয়া যায়। এদের একটি হল সিউডোমোনাস মেরিনোগ্লুটিনোসা (Pseudomonas marinoglutinosa) ও অপরটি হল অ্যাক্রোমব্যাকটার অ্যাকোয়ামেরিনাস (Achromobacter aquamarinus)।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

# শিল্প-জীবাণুতত্ত্ব

## ১। শিল্প-জীবাণুতত্ত্বের সংজ্ঞা

শিল্প-জীবাণুতত্ত্বের (Industrial Microbiology) লক্ষ্য হল, কিভাবে বিভিন্ন জীবাণুর সুচারু ব্যবহার করে অর্থকরী দ্রব্যের উৎপাদন করা চলে তার উপায় উদ্ভাবন। শিল্প-জীবাণুতত্ত্বের জন্ম হবার আগে থেকেই মানুষ নানা প্রকার অর্থকরী দ্রব্য জীবাণুর সাহায্যে উৎপাদন করে আসছে। যেমন, সেরকা সুরাসার বা অ্যালকোহল ইত্যাদি। কিন্তু এসব জিনিস মানুষ উৎপাদন করেছে প্রধানতঃ কুটির-শিল্পের আকারে। যন্ত্রবিদ্যার উন্নতির ফলে বর্তমানে বৃহৎ আকারে এদের উৎপাদন পন্থা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। এ-ছাড়া জীবাণু সম্পর্কে নবতর জ্ঞান জীবাণুর সাহায্যে অন্যান্য বহু অর্থকরী দ্রব্য, যথা গ্লুকোনিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, অ্যান্টিবায়োটিক, ভাইটামিন ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের পথ উন্মুক্ত করেছে ও করছে।

যেসব দ্রব্য রাসায়নিক উপায়ে উৎপাদন খুবই ব্যয়-সাপেক্ষ এমন অনেক পদার্থ জীবাণুদের সাহায্যে অনেক কম খরচায় উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

## ২। শিল্প-জীবাণুতত্ত্বের সমস্যা

শিল্প-জীবাণুতত্ত্বের সমস্যা অনেক। পরীক্ষাগারে জীবাণুদের এক টেস্ট-টিউব থেকে অন্য টেস্টটিউবে স্থানান্তর অনেক সহজ। কোন বিশেষ জীবাণুর বিশুদ্ধতা বজায় রাখা পরীক্ষাগারে খুব কঠিন নয়। কিন্তু শিল্পে জীবাণুদের ব্যবহার করার সময় জীবাণুদের বিশুদ্ধতা রক্ষা একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। কারণ, শিল্পের ক্ষেত্রে সহজেই একটি জীবাণুর আবাদে (culture) বাতাস ও ধূলোবালি থেকে অন্য জীবাণু যুক্ত হতে পারে ও প্রয়োজনীয় জীবাণুর বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। এই সমস্যা এড়াবার জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। সাধারণতঃ শিল্পে জীবাণুকে কোন আবাদ-মাধ্যমে খুব বেশী করে যোগ করা হয়। যাতে অন্যান্য জীবাণু সহজে ঐ মাধ্যমে বৃদ্ধি পেতে ও বংশবিস্তার করতে না পারে। জীবাণুদের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য উত্তাপ, পিএইচ (pH) ইত্যাদি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, যার ফলে প্রয়োজনীয় জীবাণুটি ছাড়া অন্যান্য অবাঞ্ছিত জীবাণু সহজে জন্মাতে না পারে। যদি জীবাণু

banglainternet.com

বায়ুজীবী (aerobic) হয়, তবে আলাদা করে বায়ু সঞ্চরণের ব্যবস্থা করতে হয়। এই বাতাস যাতে জীবাণুমুক্ত হয়, তার জন্য কাঠ-কয়লা অথবা কাচ থেকে প্রস্তুত উল (glass-wool) মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় বাতাসকে প্রবাহিত করতে হয়। এছাড়া জীবাণু কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন জিনিস অপসারণ সমস্যাও এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ জীবাণুজাত দ্রব্যে যথাযথভাবে সরিয়ে নিতে না পারলে, জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ পরিস্রাবণ (filtration) ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির ( centrifugal force ) সাহায্যে জীবাণু-উৎপাদিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে আলাদা করা হয়। প্রয়োজনীয় অর্থকরী দ্রব্য পৃথক করবার পর দেখা দেয় অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দূরীকরণ সমস্যা। এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপর নির্ভর করে বৃহদাকারে জীবাণুর সাহায্যে কোন অর্থকরী দ্রব্যের উৎপাদন। জীবাণুর সাহায্যে কোন অর্থকরী দ্রব্যের উৎপাদন করতে হলে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয় কিভাবে অপেক্ষাকৃত সস্তা জিনিসকে কাজে লাগান যায়। কারণ, অপেক্ষাকৃত সস্তা জিনিসকে গাঁজিয়ে কোন অর্থকরী দ্রব্য উৎপাদন করতে না পারলে তা বিক্রি করে ব্যবসায় লাভ করা অসম্ভব। শিল্প-জীবাণুতত্ত্বে তাই জীবাণু, জীবাণুকে যে মাধ্যমে উৎপাদন করা হবে, এবং যেভাবে উৎপাদন করা হবে এই তিনটি ব্যাপারে বিশেষভাবে গবেষণা চালান হয়। শিল্প-জীবাণুতত্ত্বের সমস্যা কেবল মাত্র জীবাণুবিদের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। শিল্প-জীবাণুতত্ত্বের অনেক সমস্যাই হল উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সমস্যা। আর তাই জীবাণুবিদের শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতে হয় যন্ত্রবিদের (engineer) উপর।

### ৩। বৃহদাকারে বিশুদ্ধ আবাদ

শিল্প জীবাণুতত্ত্বের একটা বড় সমস্যা হল যে জীবাণুর সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তুর উৎপাদন করা হবে, তার বিশুদ্ধতা বজায় রাখা। অর্থাৎ তার সঙ্গে যাতে অন্য জীবাণু এসে মিশ্রিত হতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা। যখন গাঁজন প্রক্রিয়ার জন্যে বড় বড় গাঁজন আধারে (fermentation tank) কোন বিশেষ জীবাণু যোগ করা হয়, তখন তা যোগ করা হয় খুব অধিক মাত্রায়। যাতে গাঁজন মাধ্যমের (fermentation medium) মধ্যে তারা দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে এবং অন্য জীবাণুরা এসে মিশলেও তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পারে। টেস্ট টিউবে জীবাণুর বিশুদ্ধ আবাদ (pure culture) বিশেষভাবে রক্ষা করা হয়। সেখান থেকে তা নিয়ে যোগ করা হয় ফ্লাস্কে,



উপযুক্ত খাদ্য মাধ্যমে। ফ্লাস্ক (flask) থেকে নিয়ে যোগ করা হয় ৯ লিটার ধারণক্ষম বিশেষ পাত্রে, আবাদ-মাধ্যমে। সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় ২৭০ লিটার ধারণক্ষম বিশেষ ধরনের আর একটি পাত্রে, যাকে সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় বীজ পাত্র ( seed-vessel)। সেখান থেকে তাদের যোগ করা হয় ৬ হাজার লিটারের আর একটি বড় বীজ-পাত্রে। সেখান থেকে সাধারণতঃ যোগ করা হয় অতিকায় গাঁজন আধারে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি ঘটান হয় ধাপে ধাপে। প্রতিবারে জীবাণুদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা হয় প্রায় ৩০ গুণ। তার পরে তাদের যোগ করা গাঁজন মাধ্যমে, বিরাট বিরাট গাঁজন আধারে। এভাবে উৎপন্ন করা জীবাণু, যা শেষে গাঁজন মাধ্যমে যোগ করা হয়, তাকে সাধারণতঃ বলা হয় স্টার্টার (starter)। আমরা বাংলায় বলতে পারি সাঁজা। সাঁজা উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, যাতে বাইরে থেকে কোন অবাঞ্ছিত জীবাণু তার সঙ্গে সহজে এসে যুক্ত হতে পারে। পরবর্তী পর্যায়গুলিতে অত অধিক সাবধানতা অবলম্বন না করলেও চলে।

### অ্যাসিটোন বিউটানল উৎপাদন

গাঁজন প্রক্রিয়ার মাধমে প্রয়োজনীয় জৈব যৌগ উৎপাদন সম্পর্কে বিভিন্ন কৌশল প্রথম আবিষ্কৃত হয় বিলাতে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়। অ্যাসিটোন (acetone) বিস্ফোরক (explosive) তৈরির কাজে লাগে। কিন্তু বিলাতে দেখা দেয় অ্যাসিটোনের অভাব। তাই চেষ্টা হয় জীবাণুর সাহায্যে সস্তা জৈব বস্তু গাঁজিয়ে অ্যাসিটোন উৎপাদনের। বৃটেন একাজে লাভ করে বিশেষ সাফল্য। বৃটেনে বিশেষ ব্যাকটিরিয়াম, ক্লসট্রিডিয়াম অ্যাসিটোবিউটাইলিকাম ( clostridium acetobutylicum ) এর সাহায্যে বৃহৎ আকারে বিউটাইল অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন ও সেই সঙ্গে ইথেনল উৎপাদন করা হতে থাকে।*

---

* এই পদ্ধতির উদ্ভব করেন ইহুদী বিজ্ঞানী ভাইজমান (Weizman)। তিনি তদানীন্তন বৃটিশ সরকারকে বলেন, তিনি বৃটেনের যত অ্যাসিটোন লাগবে, তার উৎপাদন ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। কিন্তু তিনি এটা করে দেবেন বিশেষ একটি শর্তে। শর্তটি হল প্যালেস্টাইন ইহুদীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি দিতে হবে। পরে ভাইজমান ইজরাইল-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে বৃত হন। ভাইজমান, তাঁর আবিষ্কারের জন্য প্রচুর বিত্তের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু বিত্তের চাইতে অনেক বড় ছিল তার স্বজাতিপ্রীতি।

অ্যাসিটোন বিউটানল গাঁজন প্রক্রিয়ায় সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় শস্য থেকে প্রাপ্ত স্টার্চ (starch) অথবা চিটাগুড় (molasses)। এর সঙ্গে দেওয়া হয় শতকরা ৬ ভাগ অ্যামোনিয়াম সালফেট। গাঁজন মাধ্যমে পানি যোগ করে সিদ্ধ করা হয়। এভাবে সিদ্ধ করবার ফলে তার মধ্যে যে জীবাণু থাকে তাদের অধিকাংশই মরে যায়। গাঁজন মাধ্যম আংশিকভাবে জীবাণু মুক্ত হয়। সিদ্ধ করার সময়, মাধ্যমের মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে তাও বহুলভাবে চলে যায়। ক্লসট্রিডিয়াম অ্যাসিটোবিউটাইলিকাম অবায়ুজীবী (anaerobic) ব্যাকটিরিয়া। তাই এভাবে অক্সিজেন দূর করে তার সাহায্যে গাঁজন ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। অধিক অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এই ব্যাকটিরিয়া নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। গাঁজনের (fermentation) ফলে গাঁজন মাধ্যমে শতকরা ২ ভাগ বিটানল অ্যাসিটোন-ইথানল মিশ্রণ উৎপন্ন হয়। এই মিশ্রণের শতকরা ৬৫ ভাগ বিটানল (butanol); ৩০ ভাগ হল অ্যাসিটোন; আর শতকরা ২ ভাগ হল ইথানল (ethanal)। এই মিশ্রণের আংশিক পাতন (fractional distillation) ঘটিয়ে, বিটানল, অ্যাসিটোন ও ইথানল পৃথক করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটেনে গাঁজন প্রক্রিয়ার বিশেষ উন্নতি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গাঁজন প্রক্রিয়ার আরো উন্নতি সাধিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, পেনিসিলিন উৎপাদনকে কেন্দ্র করে।

### পেনিসিলিন উৎপাদন

পেনিসিলিন উৎপাদনের প্রথমে পেনিসিলিয়াম নোটাটাম (Penicillium notatum) ব্যবহার করা হত। পরে ব্যবহার করা হতে থাকে পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম (P. chryosogenum) নামক ছিতি (mould)। পেনিসিলিন উৎপাদন করতে যেয়ে আবিষ্কৃত হয় ছিতিকে নিমজ্জিত অবস্থায় আবাদ (submerge culture) করার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ছিতিদের বিরাট বিরাট গাঁজন আধারে (fermentation tank) জীবাণুমুক্ত (sterilized) গাঁজন মাধ্যমে আবাদ করা হয়। গাঁজন মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ বাতাস জোরে প্রবাহিত করা হয় এবং বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যে গাঁজন মাধ্যমকে আলোড়িত করা হতে থাকে। ছিতি বায়ুজীবী (aerobic)। বাতাস প্রবাহিত করবার ফলে গাঁজন মাধ্যমের সর্বত্র অক্সিজেনের মাত্রা মোটামুটি প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকে। গাঁজন মাধ্যমকে আলোড়িত করবার ফলে গাঁজন মাধ্যমের সব অংশ ছিতির সংস্পর্শে আসে ও গাঁজন প্রক্রিয়া সুসমভাবে নিষ্পন্ন হয়।

banglainternet.com



অনেক ব্যাকটিরিয়া আছে, যারা পেনিসিলিনাজ (penicillinase) নামক এনজাইম উৎপাদন করে। এই এনজাইম খুব অল্প মাত্রায় থাকলেও পেনিসিলিনের আর্দ্র বিশ্লেষণ (hydrolysis) ঘটে। তাই পেনিসিলিন উৎপাদন ব্যবস্থায় গাঁজন মাধ্যমকে অন্যান্য জীবাণুমুক্ত রাখবার জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। প্রথমে বড় বড় ফ্লাস্কে-নির্বীজ উপায়ে এগারযুক্ত (agar) শক্ত আবাদ-মাধ্যমে চাষ করা হয়। সেখান থেকে যথেষ্ট সংখ্যক স্পোর নিয়ে ছোট ফারমেনটারে যোগ করা হয়। এখানে স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে দু'তিন দিন পরে যে ছিতি উৎপন্ন হয়, তাদের বড় গাঁজন আধারে (large fermenter) স্থানান্তরিত করা হয়। এসব গাঁজন আধারের ধারণ ক্ষমতা হয় ১৫ থেকে ২০ হাজার গ্যালন (১ গ্যালন=৪'৫ লিটার)। প্রতি মিনিটে এদের মধ্য দিয়ে ২ হাজার গ্যালনের অধিক জীবাণুমুক্ত বায়ু প্রবাহিত করা হয়। এর জন্য যে বিপুল পরিমাণে ফেনার উদ্ভব হয়, তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেনা নিবারক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

সব গাঁজন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন-মাত্রা নির্ভর করে প্রধানত গাঁজন মাধ্যম ও গাঁজনের জন্য ব্যবহৃত জীবাণুর উপর। প্রথমে পেনিসিলিন উৎপাদনের হার ছিল প্রতি লিটার গাঁজন মাধ্যমে ০'০১ গ্রাম। কিন্তু এখন এই মাত্রা বর্ধিত হয়ে দাঁড়িয়েছে ১ গ্রামের উপর। এ রকম বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে উপযুক্ত গাঁজন মাধ্যম উদ্ভব করতে পারবার এবং উন্নত হারে পেনিসিলিন উৎপাদন ক্ষম ছিতি নির্বাচিত করতে পারবার ফলে। ছিতির স্পোর (spore) বা বীজ কণাদের মধ্যে এক্সরে, আলট্রাভায়োলেট রে ও মাস্টার্ড গ্যাসের সাহায্যে মিউটেশন (mutation) ঘটান হয়। তারপর এসব স্পোর থেকে উৎপন্ন ছিতিদের মধ্যে থেকে বাছাই করা হয় উচ্চ পেনিসিলিন উৎপাদক জাত।

পেনিসিলিন উৎপাদন করতে যেয়ে যেসব কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়, তা পরবর্তীতে প্রয়োগ করা হয় অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য। অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য আর কোন মূল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন আজকের বিশ্বে অন্যতম লাভজনক ব্যবসা। পেনিসিলিন উৎপাদন শিল্প জীবাণুতত্ত্বের সাফল্যের এক চূড়ান্ত নিদর্শন।

### গাঁজন প্রক্রিয়াজাত শিল্পের ভবিষ্যৎ

গাঁজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ অ্যালকোহল, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত করে আসছে স্মরণাতীতকাল থেকে। কিন্তু গাঁজন প্রক্রিয়া ছিল

কুটির শিল্পের অঙ্গ। আর জীবাণুদের সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকায় তা ছিল সাধারণ অভিজ্ঞতার ব্যাপার। কিন্তু এখন গাঁজন প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে বড় বড় কারখানায় বৃহদাকারে সংঘটনের বিষয়। যেসব জৈববস্তু রাসায়নিক উপায়ে সস্তায় উৎপাদন করা যায়, তাদের উৎপাদন করা হয় রাসায়নিক উপায়ে। কিন্তু অনেক জৈববস্তু গাঁজন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন লাভজনক। আর তা উৎপাদন করা হয় গাঁজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে। অ্যালকোহল, একাধিক জৈব অম্ল, ভাইটামিন, হরমোন, পৃথিবীর নানা দেশে উৎপাদিত হচ্ছে গাঁজন প্রক্রিয়ায়। ভবিষ্যতে আরো বহু জিনিস উৎপাদনের সম্ভাবনাও আছে।

## পাট জাগ দেওয়া

পাট ( **Corchorus capsularis** ও **C. olitorius** ), শন-পাট ( **Crotalaria juncia**) এবং অতসী ( **Linum usitatissinum** ) প্রভৃতি গাছ থেকে আমরা যে আঁশ পেয়ে থাকি, তারা সবাই স্ক্লেরেনকাইমা ( **sclerenchyma** ) কোষ দ্বারা গঠিত। পাটের ক্ষেত্রে এসব কোষ থাকে ফ্লোয়েম (**phloem**) কলায়। এসব কোষ দেখতে হয় লম্বা এবং দুই প্রান্ত অপেক্ষাকৃত চিকন। এদের কোষ প্রাচীর হয় খুব পুরু এবং শক্ত। এতে থাকে সেলুলোজ ও লিগনিন (**lignin**)। পাটের ক্ষেত্রে এসব কোষ গড়পড়তা লম্বায় হয় ২ দশমিক ৩ মিলিমিটার এবং এদের ব্যাস হয় গড়পড়তা ১৭ মাইক্রোমিটারের কাছাকাছি। এসব কোষ প্রথমে থাকে জীবন্ত, কিন্তু পরে পরিণত হয় মৃত কোষে। এরা গাছের কাণ্ডকে প্রধানত শক্তি যোগায় সোজা হয়ে থাকতে। উদ্ভিদবিদ্যায় আঁশ বলতে বোঝায় এক একটি স্ক্লেরেনকাইমা কোষকে। কিন্তু চলতি কথায় যাকে বলা হয় পাটের আঁশ তাতে পাশাপাশি থাকতে পারে ৫০টির মত স্ক্লেরেনকাইমা কোষ। চলতি কথায় যাকে বলা হয় পাটের আঁশ তা হল আসলে আঁশের বাণ্ডিল। বাণ্ডিলের মধ্যে স্ক্লেরেনকাইমা কোষগুলির এক প্রান্ত অন্য স্ক্লেরেনকাইমা কোষের আর এক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এ রকমভাবে যুক্ত হয়ে গড়ে ওঠা আঁশের বাণ্ডিল লম্বায় হতে পারে ১৮ থেকে ৩০ মিটারের মত। পাটের আঁশে থাকে শতকরা ৬৪ ভাগ আলফা-সেলুলোজ ($\alpha$-**cellulose**), শতকরা ২৪ ভাগ হেমি-সেলুলোজ ( **hemicellulose** ) এবং শতকরা ১২ ভাগ লিগনিন।* পাট যখন পানিতে ভিজিয়ে জাগ দেওয়া হয় তখন প্রথম পচে ক্যামবিয়াম ( **cambium** )

* W. A. Bell (1960) : The Chemistry and structure of Jute. Science News 54. PP. 39 56.

banglainternet.com



কোষ। এর ফলে পাটকাঠি থেকে পাটের ছাল (**bark**) আলগা হয়ে পড়ে। এর পরে পচে পাতলা কোষ প্রাচীর যুক্ত ফ্লোয়েম কলার (**phloem** ) কলার পাতলা কোষ প্রাচীর যুক্ত কোষসমূহ। পরে পচে কর্টেক্স (**cortex**) অঞ্চলের কোষ। এর ফলে পাটের আঁশ ছালের অন্যান্য কোষ থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। পাটের আঁশ বা আঁশের বাণ্ডিল (**fibre bundles**) অন্য কোষসমূহ থেকে আলাদা না হলে তাদের ছাড়ান যায় না। পাট জাগ দেবার সময় বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যাতে ছালের অন্যান্য কোষ, যা আঁশের চারপাশে যুক্ত হয়ে তা পচে নরম হয়ে যায় কিন্তু পাটের আঁশ ঠিক থাকে। পানিতে পাটের কাণ্ড প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ভিজিয়ে রাখলে পাটের আঁশও পচতে আরম্ভ করে। এর ফলে পাটের আঁশ নরম হয়ে যায়। তা সহজেই ছিঁড়ে যেতে থাকে।

পাট পচনের প্রথম ভাগে অংশগ্রহণ করে বায়ুজীবী ( **aerobic** ) ব্যাসিলাস ( **Bacillus** ) গণভুক্ত ( **genus** )- ব্যাকটিরিয়া। যেমন ব্যাসিলাস পলিমিকসা (**Bacillus polymyxa**)।* বায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া পচন প্রক্রিয়া চালাতে থাকবার সময় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে আসে। পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে আসবার পর সক্রিয় হয়ে ওঠে। ক্লসট্রিডিয়াম (**clostridium**) গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়া। পাট পচানো পানি থেকে ক্লসট্রিডিয়াম পেকটিনোভোরাম (**Clostridium pectinovorum**) নামক ব্যাকটিরিয়া যথেষ্ট সংখ্যক পাওয়া যায়।** ক্লসট্রিডিয়াম প্রধানত পেকটিন ভাঙতে থাকে। এর ফলে বিউট্রিক ও অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপাদিত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট কার্বন-ডাইঅক্সাইডও উৎপাদিত হয় বা পানির উপর ফেনার সৃষ্টি করে। দীর্ঘ সময় পাট পানিতে পচালে সেলুলোজ আক্রমণকারী ব্যাকটিরিয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের আক্রমণে পাটের আঁশ পচে নরম হয়ে যেতে থাকে। এবং পেকটিন ভেঙেও স্ক্লেরেনকাইমা (**Sclerenchyma**) কোষ পৃথক হয়ে যেতে থাকে।***

আমাদের দেশে পাট জাগ দেওয়া সাধারণ ব্যাপার। নদী, পুকুর, খাল-বিলের পানিতে পাট জাগ দেওয়া হয়। এ বিষয় বিশেষ কোন সতর্কতা গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু বেলজিয়াম (**Belgium**) অতসীর আঁশ ছাড়াবার

* Ali, M. M. (1958) : Aerobic Bacter Involved in jute Applied Microbiology Vol. 6 ; PP. 87—89.

** Bergey's Manual, 7th edition. P. 692.

*** অনেক ক্লসট্রিডিয়াম সেলুলোজ ভাঙতে পারে যেমন , Clostridium werneri.

জন্য সুনিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার বড় বড় চৌবাচ্চায় অতসী জাগ দেওয়া হয়। পানিতে যোগ করা হয় বাছাই করা জাতের ব্যাকটিরিয়াম। আমাদের দেশে এভাবে পাট জাগ দেওয়া সম্ভব নয় নানা কারণে। কারণ অতসী আঁশের চাইতে পাটের বাজারদর অনেক কম। এভাবে পাট জাগ দেওয়া কৃষকের পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারীভাবে দিতে হলেও যা খরচ পড়বে তাতে হয়ত পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিক্রি করে লাভ করা যাবে না। কিন্তু পাট জাগ দেবার সময় কতকগুলি ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিষ্কার মৃদু স্রোত পানিতে পাট জাগ দিলে পাটের আঁশের রঙ ভাল থাকে। বিবর্ণ হয়ে যায় না। যে পানিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত লবণ কম থাকে তাতে পাট জাগ দিলে আঁশ ভাল হয়। পানিতে লোহা বেশি থাকলে পাটের আঁশে বিশেষ ধরনের দাগ পড়ে।

পাটগাছের কাণ্ডকে পানির মধ্যে ভারি কিছুতে বেঁধে ডুবিয়ে পচালে পাটের বাকল তাড়াতাড়ি পচে। জাগ দিতে সময় কম লাগে। কিন্তু এমন কিছুর সাহায্যে পাটের কাণ্ডকে পানির মধ্যে ডোবান উচিত নয়, তাতে ট্যানিন (tanin) বেশি থাকে। যেমন, আম কাঠ অথবা কলার গাছ। এতে ট্যানিন ও পানির লোহার মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে পাটের আঁশে সবুজ দাগ পড়তে পারে।

আমাদের দেশে অতসী প্রধানত তেলের জন্য লাগান হয়। খুব বড় আকারে এখন আর চাষ করা হয় না। অতসীর বীজ ঝেড়ে নেবার পর শুকনা কাণ্ড-গুলি রেখে দেওয়া হয় এবং পরের বছর শীতকালে তাদের পানির মধ্যে ২৪ ঘণ্টা পচানর পর শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙ্গে আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। অতসীর চাষ প্রধানত উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ।

শন পাটের চাষ প্রধানত সিরাজগঞ্জ এবং ফরিদপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় হয়। শন পাট পচানর জন্য অনেক সময় পানির অভাব হয়। শুকনা গাছ-গুলিকে তাই বর্ষাকাল পর্যন্ত রেখে দেবার প্রয়োজন করে। শন পাট সাধারণতঃ আটি করে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে পানিতে ভাল করে ডুবিয়ে জাগ দেওয়া হয়। তা না হলে আঁশ ছাড়াতে অসুবিধা হয়। জাগ দিতে বর্ষাকালে ২ থেকে ৩ দিন সময় লাগে। শন পাটের আঁশ পাটের আঁশ থেকে অনেক শক্ত, টেকসই এবং হালকা রঙের। এর আঁশে লিগনিন-এর পরিমাণ পাটের চাইতে অনেক কম থাকে।

## চিটা গুড় থেকে অ্যালকোহল উৎপাদন

banglainternet.com

আখের গাঢ় রস থেকে চিনি বের করে নেবার পর যে অংশ থাকে, তাকে বলা হয় চিটা গুড় (molasses)। চিটা গুড়ের মধ্যে অনেক পরিমাণে চিনি



থেকে যায়। কারণ, চিনির এই অংশ সহজে পৃথক করা যায় না। এই চিনিকে ঈস্ট বা খামিরের সাহায্যে গাঁজিয়ে অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়। চিটা গুড়ের সঙ্গে খামির যোগ করার আগে তা পানি মিশিয়ে পাতলা করে দেওয়া হয়। যাতে তাতে চিনির পরিমাণ শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ থাকে। খামিরের (Saccharomyces cerevisiae) এনজাইম ইনভার্টেজ (invertase) প্রথমে আখের চিনিকে ভেঙ্গে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজে রূপান্তরিত করে। এই গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজকে খামির জাইমেজ (zymase) এনজাইম সমষ্টির সাহায্যে ভেঙ্গে অ্যালকোহল ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড উৎপাদন করে।

$$(১)\quad \underset{\text{আখের চিনি}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_{2}O \xrightarrow{\text{ইনভার্টেজ}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুকটোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

$$(২)\quad C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{জাইমেজ}} 2CH_3CH_2OH + 2CO_2$$

চিটা গুড়ের সঙ্গে খামির যোগ করার আগে কিছু ইউরিয়া (urea) যোগ করা হয় (০.০০৫%)। ইউরিয়া খামিরকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন যোগায়। খামির সাধারণতঃ ৪.২ pH-এর কাছাকাছি ভাল হয়। তাই চিটা গুড়ের কিছু অ্যাসিড যোগ করে pH মাত্রা এর কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়। সাধারণতঃ চিটা গুড়ে সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করে pH মাত্রা ঠিক রাখা হয়। এই pH মাত্রায় যেমন খামির ভালভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, তেমনি আবার অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাকটিরিয়া হতে পারে না।

আমাদের দেশে দর্শনায় চিনির কলে চিটা গুড় থেকে অ্যালকোহল উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু অন্য চিনির কলেও এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব।

দর্শনায় চিনির কলে যে খামির ব্যবহার করা হয় তা আনা হয় ফ্রান্স থেকে। আমাদের দেশে তাল ও খেজুরের রস গাঁজিয়ে যে খামির তাড়ি উৎপাদন করে তা আর এই খামির একই প্রজাতি (species)। কিন্তু এই খামির 'বুনো' নয় বিশেষভাবে বাছাই করা। এর সাহায্যে অধিক পরিমাণে অ্যালকোহল উৎপাদন সম্ভব। প্রথমে খামিরকে উপযুক্ত খাদ্য মাধ্যমে আবাদ করা হয়। তারপর এই আবাদকে কারখানার বিশেষ পাত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকে ১ ভাগ খামির আবাদ (culture), ৫ ভাগ চিটা গুড়ে যোগ করা হয়। চিটা গুড় থেকে শতকরা ৫ ভাগ অ্যালকোহল

উৎপন্ন হয়। এই অ্যালকোহলকে বিশেষ ডিসটিলিং টাওয়ার (distilling tower) পাতিত (distill) করে বিশুদ্ধ অ্যালকোহল ও রেকটিফায়েড স্পিরিট (শতকরা ৯৫ ভাগ অ্যালকোহল ও পাঁচ ভাগ পানি) তৈরি করা হয়।

### সেরকা তৈরি

যা কিছু গাঁজিয়ে অ্যালকোহল পাওয়া যায়, তা থেকেই সেরকা প্রস্তুত করা চলতে পারে। সেরকাতে থাকে শতকরা ৩ থেকে ৬ ভাগ অ্যাসিটিক অ্যাসিড ( $CH_3COOH$ )। অ্যালকোহলকে জারিত ( oxidize ) করলে অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপাদিত হয়। এজন্য প্রয়োজন হয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া, মাইকোডারমা অ্যাসিটি (Mycoderma aceti)।

ব্যাকটিরিয়া মাইকোডারমা অ্যাসিটি তার শ্বাসক্রিয়ার জন্য অ্যালকোহল ব্যবহার করে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া প্রথমে অ্যালকোহলকে পরিণত করে অ্যাসিটালডিহাইড-এ। পরে অ্যাসিটালডিহাইডকে পরিণত করে অ্যালকোহলে ঃ

$$CH_3CH_2OH + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CH_3CHO + H_2O$$

অ্যালকোহল অ্যাসিটালডিহাইড

$$CH_3CHO + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CH_3COOH$$

অ্যাসিটালডিহাইড অ্যাসিটিক অ্যাসিড

ভালভাবে সেরকা উৎপাদন করলে যথেষ্ট বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা থাকতে হয়। নতুবা অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপাদিত না হয়ে অ্যাসিটালডিহাইড উৎপাদিত হতে থাকে। ভালভাবে সেরকা উৎপাদন করতে হলে, যে মদ থেকে সেরকা প্রস্তুত করতে হবে, তাতে শতকরা ১০ থেকে ১৩ ভাগের বেশি অ্যালকোহল থাকা উচিত নয়। কারণ অধিক অ্যালকোহল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর। অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া সবচেয়ে ভালভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে ৩৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। তাই গাঁজন প্রক্রিয়ার সময় এর কাছাকাছি তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয়।

আগে সেরকা তৈরি ছিল কুটির শিল্প। কিন্তু এখন অনেক দেশে কারখানায় সেরকা উৎপাদন করা হয় বিরাট বাণিজ্যিক ভিত্তিতে।

### পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান

banglainternet.com

আজকের বিশ্বে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের গুরুত্ব যথেষ্ট। বিভিন্ন উপায়ে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান করা হয়। এসব পদ্ধতির মধ্যে ব্যাকটিরিয়ার



ব্যবহার অন্যতম। পেট্রোলিয়াম-এর মধ্যে থাকে ইথেন ( $C_2H_6$ ) ও অন্যান্য হাইড্রোকার্বন। কিছু ব্যাকটিরিয়া আছে যারা ইথেন ও অন্যান্য হাইড্রোকার্বন (কার্বন ও হাইড্রোজেনের মিলনে সৃষ্ট যৌগ ) থেকে কার্বন গ্রহণ করে নিজেদের পুষ্টিবিধান করতে পারে। মাটিতে যদি খুব সামান্য পরিমাণে পেট্রোলিয়াম বাষ্প ( vapour ) থাকে, তবে তা থেকেও এরা কার্বন গ্রহণ করে নিজেদের পুষ্টিসাধন করতে পারে। এসব ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে তাই নিরূপণ করা যায়, মাটির মধ্যে পেট্রোলিয়াম বাষ্পাকারে আছে কিনা। যদি দেখা যায় আছে, তবে অনুমান করা হয়, ঐ জায়গার মাটির নীচে পেট্রোলিয়াম থাকা সম্ভব। আর সেই পেট্রোলিয়াম থেকেই আসছে ঐ বাষ্প। এসব ব্যাকটিরিয়াকে বিশেষ পাত্রে এমন আবাদ-মাধ্যমে যুক্ত করা হয়, যাতে কোন কার্বন উৎস থাকে না। তারপর ঐসব পাত্রকে মাটির মধ্যে গর্ত করে স্থাপন করা হয়। কয়েক দিন অতিবাহিত হবার পর ঐসব পাত্রকে উত্তোলিত করে দেখা হয়, তার মধ্যে ঐ বিশেষ ব্যাকটিরিয়াম বৃদ্ধি পেতে পেরেছে কিনা। যদি দেখা যায় বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে মনে করা হয়, ঐ স্থানের মাটিতে পেট্রোলিয়াম বাষ্প আছে।

কিন্তু কেবল ব্যাকটিরিয়ার উপর নির্ভর করে কোন জায়গায় মাটির নীচে পেট্রোলিয়াম থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ, মাটিতে অনেক ব্যাকটিরিয়া আছে যারা জৈব বস্তু পচিয়ে বিশেষ বিশেষ হাইড্রোকার্বন উৎপাদন করে। যা থেকেও এসব ব্যাকটিরিয়া কার্বন গ্রহণ করে বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। তাই পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের কাজে ব্যাকটিরিয়াসহ একাধিক পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

## গ্রন্থপঞ্জী


1. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Edited by R. E. Buchanan, N. E. Gibbons, Williams & Wilkins. Baltimore. 1974.
2. Microbiology; M. J. Pelczar, R. D. Reid, E. C. S. Chan. Mcgraw-Hill. Newyork. 1977.
3. Microbiology; B. D. Davis, R. Dalbecco, H. N. Eisen, H. S. Ginsberg. Harper & Row. Philadelphia. 1980.
4. Micro-organisms: Function, Form and Environment L. E. Hawker, A. H. Linton. Edward Arnold Ltd. London. 1971.
5. Industrial Microbiology: S. C. Prescott, C. G. Dunn Mcgrow-Hill. Newyork. 1959.


## নির্ঘণ্ট


**অ**

অটোট্রফিক ২৮, ২৯, ১৮২
অতসী ১৯৭, ১৯৮

**আ**

অ্যাকটিনোমাইসেটিস ৬০, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১৪৭, ১৫১, ১৮০
অ্যাক্রোমোব্যাকটার ১১৭
অ্যাজোটোব্যাকটার ৬৫, ১৮৩
অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট ৭৬
অ্যান্টিজেন ১২৬, ১২৭, ১৩১
অ্যান্টিবডি ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১
অ্যান্টিবায়োটিক ২৩, ৭৩, ১০০, ১১৬, ১৪৭, ১৫৩, ১৯৫
অ্যান্টিসেপটিক ৩৩
আলকোহল ২০০
অ্যাসপারজিলাস ১৩৬, ১৪০, ১৭৬
অ্যাসিড ফাস্ট ৪৭, ৬৬
অ্যাসিটোন ১৯৩
অ্যাসিটোন ইথানল ১৯৪
অ্যাসিটোন বিউটানল ১৯৩, ১৯৪

**ই**

ইউক্যারিওটা ১, ১২, ৫৯
ইউরিয়া গাজন ১৮৬
ইথেন ২০১
ইসচেরিচিয়া ১৬, ২৪, ২৬, ৬২, ১৬৯, ১৭০
ইসচেরিচিয়া কোলি ১৬৯, ১৭০, ১৭১

**ঈ**

ঈস্ট ৬৪, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৯৯

**এ**

এনজাইম ২, ৫, ৪৯, ৬১, ৬২, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৮৮, ১০৩, ১৬৮, ১৮২
এনজাইম ইনভার্টেজ ১৯৯
এন্টিবডি ৯৯

**ও**

ওয়াক্‌সম্যান ১০৮

**ক**

কক ৪০, ৪১, ১০৯
কক্কাই ১৪, ৫৯, ৬০, ৯৫, ১৬৪
কক্কাস ১৬৪
কনিডিওফোর ১০৫, ১৩৬, ১৪০
কিমোসিনথেটিক ৬, ২৯
কুল ৯৯, ১০০
কোষ প্রাচীর ১০৫
ক্লসট্রিডিয়াম ৩৪, ৬৬, ৯১, ১৫৯, ১৬১, ১৬৭, ১৮৩, ১৯৭
ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম ১৬০
ক্লোরোফিল ১২০, ১৩২
ক্লোরোমাইসেটিন ১৫২

**খ**

খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ ১৬০
খাদ্য বিষণ ১৬০


banglainternet.com

খামির ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৯৯

**গ**

গাঁজন প্রক্রিয়া ৮২, ১৪৫, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬
গ্যালিওনেলা ১৯০
গ্রাম রঞ্জন ৪৫, ৪৬
গ্লাইকোলাইসিস ৮৩, ৮৪
গ্লুটামিক অ্যাসিড ৮৯, ৯০, ১৮৩

**চ**

চিতি ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৯, ১৬৭, ১৭৫, ১৯৪

**ছ**

ছত্রাক ৪১, ১২০, ১৩২, ১৩৪, ১৩৭, ১৪২

**জ**

জীবাণু ৩, ৩৩, ৪৪, ৪৭, ৪৯, ৯১, ৯৬, ১৩৮, ১৬৩
জীবাণুতত্ত্ব ৩, ৫, ৪০, ৪৩, ৪৬, ৪৮, ১১০, ১৫৭, ১৭৫
জীবাণুযুদ্ধ ১১৪, ১১৫
জিল নেলসন রঞ্জক ৪৭

**ট**

ট্রাইকোডারমা ১৭৬
টেট্রাসাইক্লিন ১৫২

**ড**

ডিজইনফ্যাকট্যান্ট ৩৩, ৩৪
ডিপথেরিয়া ১২৭, ১২৮, ১৬২, ১৭৩

**থ**

থায়োব্যাসিলাস ডিনাইট্রিফিক্যান্স ১৮২

**দ**

দই ১৬৬, ১৬৭

**ধ**

ধনুষ্টংকার ১১৩, ১২৮

**ন**

নাইট্রোজেন চক্র ১৮০, ১৮১ ১৮৩
নাইট্রোজেন ধৃতি ১৮১, ১৮৩, ১৮৫
নাইট্রোজেন ফিক্সেশন ১৮১, ১৮৩
নাইট্রোব্যাকটার ১৮২
নাইট্রোসোমোনাস ১৮২
নিওমাইসিন ১৫২
নিউক্লিয়াস ৪, ১৬, ৪৪

**প**

পাস্তুরাইজেশন ১৬৬
পেনিসিলিন ৪৬, ৭৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫৩,
পেনিসিলিনাজ ১৫৪, ১৯৫
পেনিসিলিয়াম ১৩৪, ১৩৬, ১৪০ ১৬২, ১৬৭, ১৭৬
পেনিসিলিয়াম নোটাটাম ১৯৪
পেকটো ব্যাকটিরিয়াম ৬২
প্রোক্যারিওটা ১, ২, ৫৯
প্রোক্যারিওটিক ১৫১
প্রোটোজোয়া ১১৬, ১১৭





প্রোটোপ্লাস্ট ১৫, ১৭, ৭৫, ১৬২
প্রোটিয়াস ১৮২

**ফ**

ফটোসিনথেসিস ৮৭
ফাইটোপ্লাংকটন ১৮৮
ফারমেনটেশন ৭৩, ৮২
ফ্যাগোসাইট ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩৩
ফ্ল্যাজেলা ১৭, ৬১, ৬২, ৬৪, ৭০

**ব**

বটুলিনাম ১৬০
বায়োলুমিনেসেনস ১৮৯
ব্যাকটিরিয়া ৩, ৬, ৭, ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ৫১, ৫৮, ৬২, ৬৪, ৮৫, ৯৯, ১১২, ১৭৭, ১৯৭, ২০১
ব্যাকটিরিয়াম ১৯৩
ব্যাকটিরিওফাজ ৩, ৯৬, ৯৭, ৯৯ ১০০, ১০৪
ব্যাসিলাস ৬৬, ১৫৩, ১৬৭
বেইজারিংক ১৮৭

**ভ**

ভাইটামিন ৪৭, ৫৪, ১৯৬
ভাইরাস ৩, ৪৮, ৯৬, ১০০ ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১২৯
ভিনোগ্রাদস্কি ৪১, ১৮৬
ভিবরিও ৫৯
ভিবরিও কমা ১১১
ভোগেস প্রোসকাওর পরীক্ষা ১৭০

**ম**

মাইকোররাইজা ১৭৬
মাইসেলিয়াম ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৯, ১৪০
মাইক্রোকক্কাস ২০, ৬৩, ১৭৮ ১৮২
মাইক্রোব্যাকটিরিয়াম ৬৫
মাখন ১৬৬, ১৬৭
মিউকর ১৩৪, ১৭৬
মিথেলিন ব্লু-পরীক্ষা ১৬৫
মিথোজীবিতা ৯৯, ১৭৬, ১৮৪

**র**

রাইজোপাস ১৩৪, ১৭৬
রাইজোবিয়াম ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫
রাইজোস্ফিয়ার ১৭৭, ১৭৮
রানীক্ষেত ১১৬
রিকেটসিয়া ৭, ৬০
রিন্ডারপেস্ট ১১৮
রেনিন ১৬৮

**ল**

লাইসোজেনি ৯৮, ৯৯
ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া ১৯, ১৫৭, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৭
লিগনিন ১৭৯, ১৮০, ১৯৬

**স**

সারসিনা ৬২
সেরকা ২০০
সেরাটিয়া ২০, ১৬৩
সেলুলোজ ১৯৬


banglainternet.com

স্যাকারোমাইসেস ১৪৩
স্যালমোনেলা ৬২, ১৫৯, ১৬১
সিউডোপোডিয়া ১২৮
সিউডোমোনাস ৬১, ৬২, ১২১, ১৫৩, ১৫৯, ১৭৭, ১৭৮, ১৮২
সিগেলা ৬২
সেফালোস্পোরিন ১৫০ ১৫১
স্টার্টার ১৯৩
স্পাইরিলা ১৭, ৫৯
স্ট্যাফাইলোকক্কাস ২০, ৬০
স্টেরিলাইজেশন ৩৬
স্ট্রেপটোকক্কাস ২০, ৬৩, ১৬৪
স্ট্রেপটোমাইসিন ১১৭, ১৫১, ১৫২, ১৫৩
স্ট্রেপটোমাইসেস ১২৩, ১৩৮
স্পোর ৪১, ৭০, ১১০, ১৩২, ১৪০, ১৪৪, ১৬০, ১৯৫

**হ**

হরমোন ১৯৬
হাইড্রোজেন আয়ন ৩০, ৩১
হাইড্রোলেজ ৭৪
হাইড্রোলাইসিস ৭৪, ৭৭, ১৮২
হিউমাস ১৭৯, ১৮০
হিউমোরাল ইমিউনিটি ১২৯


# পরিভাষা

**A**

| | |
|---|---|
| Acellular animal | অ-কোষী প্রাণী |
| Aerobic | বায়ুজীবী |
| Algae | শৈবাল, শেওলা, অ্যালজী |
| Ammonifiction | অ্যামনিয়াকরণ |
| Anaerobic | অবায়ুজীবী |

**B**

| | |
|---|---|
| Blue-Green Algae | নীল-সবুজ শৈবাল |
| Bud | কলিকা |

**C**

| | |
|---|---|
| Catalyst | প্রভাবক |
| Cell | কোষ |
| Cell-Wall | কোষ-প্রাচীর |
| Class | শ্রেণী |
| Classification | শ্রেণীবন্ধন, শ্রেণীবিভাগ |
| Colony | উপনিবেশ, সংঘ |
| Culture | আবাদ, চাষ |

**D**

| | |
|---|---|
| Dilution | লঘুকরণ |
| Denitrification | নাইট্রোজেন বিযুক্তি |

**E**

| | |
|---|---|
| Energy | শক্তি, তেজ |
| Enzyme | জৈব-প্রভাবক |
| Evolution | বিবর্তন অভিব্যক্তি |

**F**

| | |
|---|---|
| Family | পরিবার |
| Fermentation | গাঁজন, গাঁজনক্রিয়া |
| Fungus | ছত্রাক |

**G**

| | |
|---|---|
| Genus | গণ |
| Growth | বৃদ্ধি |

**H**

| | |
|---|---|
| Heredity | বংশগতি |
| Host | পোষক |
| Hybrid | সংকর |
| Hybrid vigour | সংকর তেজ |

**I**

| | |
|---|---|
| Inoculating needle | বীজায়ন তার |
| Inoculation | বীজায়ন |

**K**

| | |
|---|---|
| Kingdom | সর্গ |

banglainternet.com

**L**

Life-cycle — জীবন-চক্র
Life history — জীবন-বৃত্তান্ত

**M**

Marine — সামুদ্রিক
Metabolism — বিপাক
Mesophiles — মধ্য উত্তাপ প্রিয়
Microbe — জীবাণু
Microbiology — জীবাণুতত্ত্ব
Microtatobiotes — জীবন-কণা
Mutation — পরিব্যক্তি
Mould — ছাতা, চিতি
Mycelium — ছত্রক-জালিকা

**N**

Nitrification — নাইট্রেটকরণ
Nitrogen fixation — নাইট্রোজেন ধৃতি বা যুক্তকরণ
Nucleus — কোষ-কেন্দ্র

**O**

Organism — জীব
Osmosis — অভিস্রবণ বা আস্রবণ
Oridation — জারণ

**P**

Parasite — পরজীবী
Photosynthesis — সালোক সংশ্লেষ বা সালোক সংশ্লেষণ
Protophyta — আদ্য-উদ্ভিদ, আদিম উদ্ভিদ
Protozoa — আদিম প্রাণী
Psychrophilic — ঠাণ্ডাপ্রিয়
Pure culture — বিশুদ্ধ আবাদ

**R**

Reduction — বিজারণ

**S**

Solution — দ্রবণ
Species — প্রজাতি
Sterile — নির্বীজিত
Sterilization — নির্বীজন
Surface tension — পৃষ্ঠটান
Symbsosis — মিথোজীবিতা

**T**

Thermophiles — উত্তাপপ্রিয়

**U**

Unicellular — এককোষী

**V**

Variety — প্রকার
Variation — প্রকারণ

**Y**

Yeast — ঈস্ট বা খামির

banglainternet.com

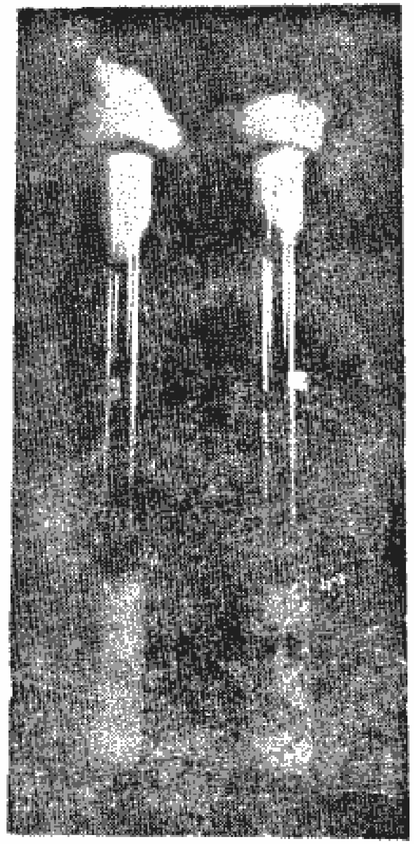

আলোকচিত্র ১ : টেস্টটিউবে ব্যাকটিরিয়া আবাদ। মাধ্যম দুধ। ডান ধারের টিউবে গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে। বাম ধারের টিউবে যে ব্যাকটিরিয়া আছে তা গ্যাস উৎপাদন করে না।

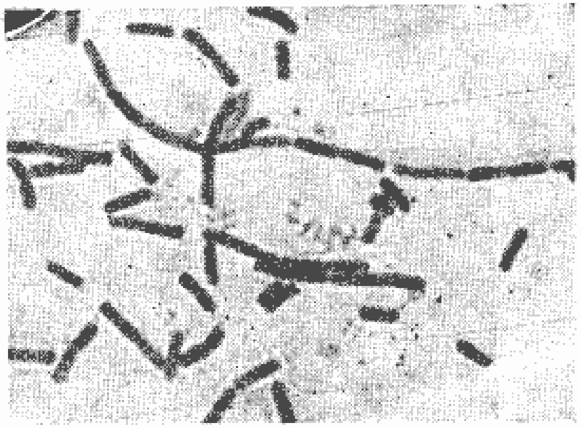

আলোকচিত্র ২ঃ দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া। ব্যাসিলাস (Bacillus) গণভুক্ত।

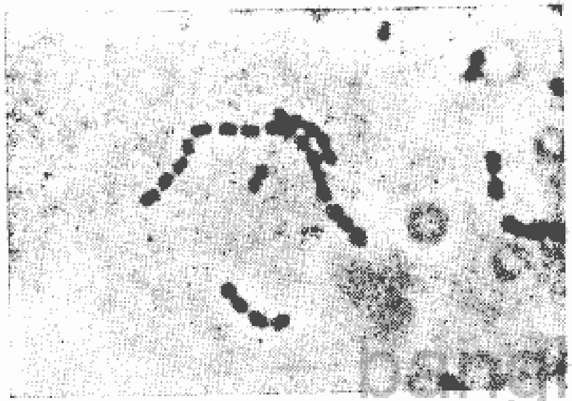

আলোকচিত্র ৩ঃ গোলাকৃতি ব্যাকটিরিয়া। স্ট্রেপটোকক্কাস (streptococcus) গণ (genus) ভুক্ত।



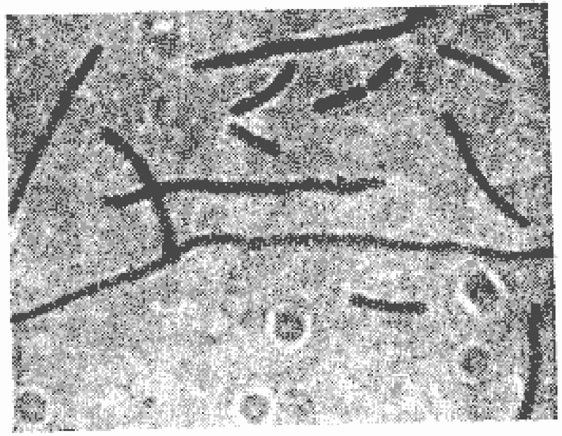

আলোকচিত্র ৪ঃ দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া। ল্যাকটোব্যাসিলাস (Lactobacillus) গণ ভুক্ত। বিভক্ত হতে সময় নেয় বলে অত লম্বাকৃতি হয়ে উঠে।

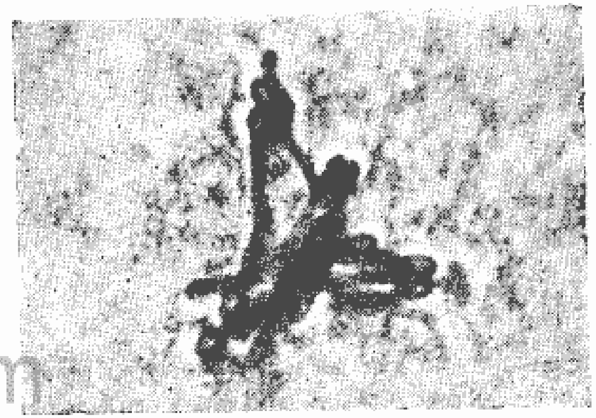

আলোকচিত্র ৫ঃ ক্লসট্রিডিয়াম (clostridium) গণভুক্ত ব্যাকটিরিয়াম। স্পোর (Spore) হবার জন্য এক মাথা বিশেষভাবে ফুলে উঠেছে।

banglainternet.com

আলোকচিত্র ৬ঃ বিউটাইরিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়াম (Butyric acid bacterium)। মধ্যে যে স্পোর উৎপন্ন হয়েছে।

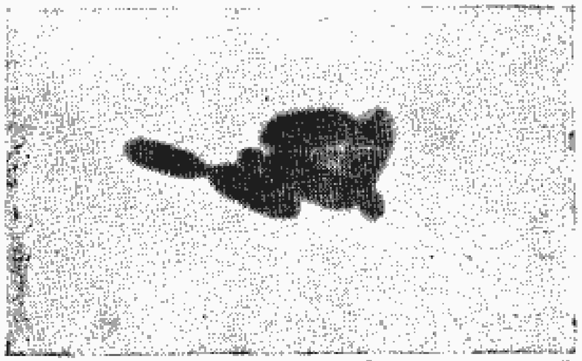

আলোকচিত্র ৯ঃ অসম্পূর্ণ খামির, ক্যানডিডা সিউডো ট্রপিক্যালিস (Candida Pseudotropicales)। দই থেকে প্রাপ্ত। এদের অ্যাসকোস্পোর (Ascospore) হয় না। ল্যাকটোজ (Lactose) থেকে কার্বনডাই অক্সসাইড ও অ্যালকোহল উৎপাদন করে।



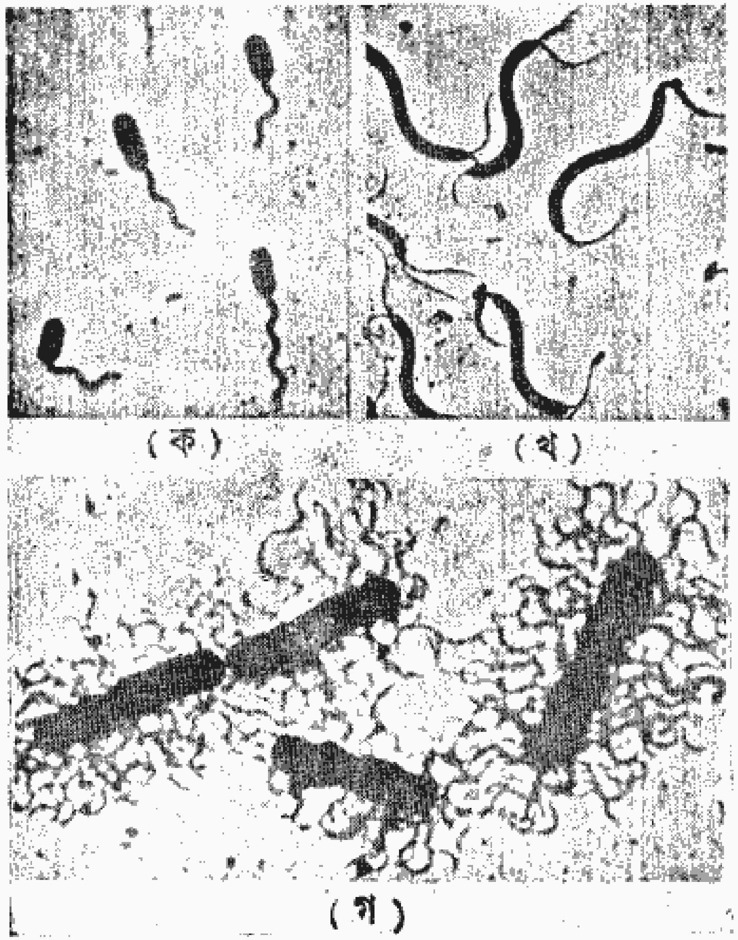


আলোকচিত্র ৭ঃ বিভিন্ন ধরনের ফ্লাজেলা (flagella) যুক্ত ব্যাকটিরিয়া। ক। সিউডো-মোনাস (Psendomonas)। এ-ক্ষেত্রে একটি মাত্র ফ্লাজেলাম (flagellum) যুক্ত। খ। স্পাইরিলাম (Spirillum)। উভয় মেরুতে ফ্লাজেলা গুচ্ছ যুক্ত। গ। ক্যারিওফানন (Caryophanon)। পেরিট্রিকাস ফ্লাজেলা (Peritrichous flagella) যুক্ত।

banglainternet.com

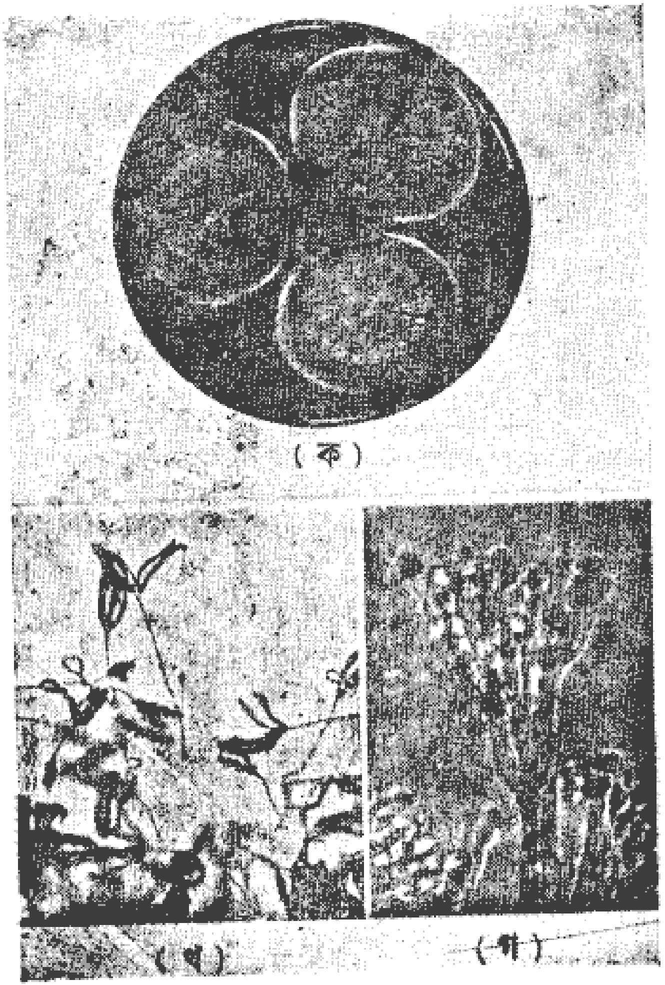


আলোক চিত্র —৮ঃ পেনিসিলিয়াম (Penicillium) গণভুক্ত ছত্রাক। ক। প্লেটিং থালায় আবাদ মাধ্যমে উৎপাদিত তিনটি বিশুদ্ধ উপনিবেশ (Colony)।
খ। নিম্ন বিবর্ধন ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্সের মধ্যে দিয়ে যেমন দেখায়।
গ। উচ্চ বিবর্ধন শক্তিসম্পন্ন মাইক্রোসকোপের লেন্সের মধ্যে দিয়ে কনিডিয়া (Conidia) এবং স্পোরোফোর ('Sporophore) দেখা যাচ্ছে।

banglainternet.com



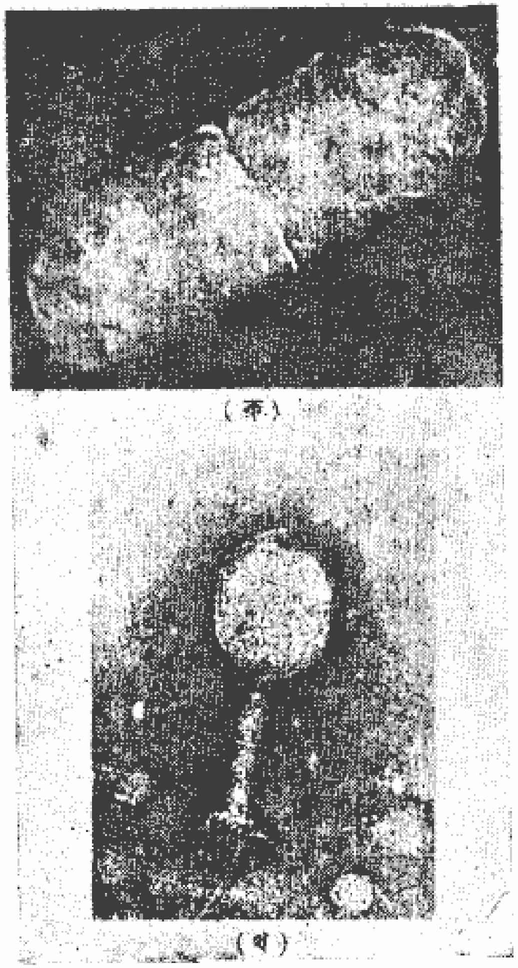


আলোকচিত্র--১০ঃ ক। একটি ইসচেরিচিয়া কোলাই (Escherichia coli) ব্যাকটিরিয়াম কোষ। $T_2$ ব্যাকটিরিও ফাজ (Bacteriophage)। যথাক্রমে ৪৫,০০০ এবং ২৯১০,০০ গুণ বড় করে দেখা। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে গৃহীত চিত্র। $T_2$ ফাজ কোলাই ব্যাকটিরিয়ামকে আক্রমণ করে।

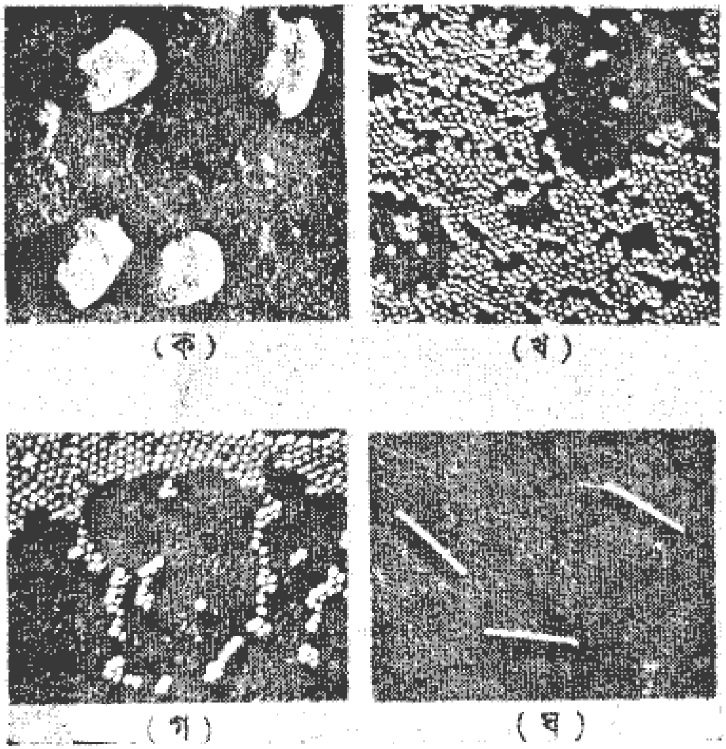


আলোক চিত্র —১১ঃ কয়েক প্রকার ভাইরাস। ক। গোবসন্তের ভাইরাস (Vaccinia) খ। পোলিও (Polio) ভাইরাস গ। টোমাটো গাছের "বুসিস্টান্ট" (Bushy stunt) ভাইরাস। ঘ। তামাক গাছের সাধারণ "মোজেইক" ভাইরাস (TMV)। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে গৃহীত চিত্র। ৫০,০০০ গুণ বড় করে দেখা।

banglainternet.com

## শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | লাইন | আছে | হবে |
|---|---|---|---|
| ২ | ৯ | প্রায় | পায় |
| ২ | ২০ | আবরণ | আচরণ |
| ২ | ২৪ | আবরন | আচরণ |
| ৩ | ৯ | বীক্ষণ | বীক্ষণ কাচের |
| ৪ | ৫ | রানে প্রুরোসে | রানে দ্যুরোসে |
| ৪ | ৭ | প্রুরোসে | দ্যুরোসে |
| ৪ | ১৭ | জীবজ | জীবন্ত |
| ৬ | ১৯ | জীবিত | জারিত |
| ৬ | ২১ | ক্লোরোফিল থাকে না | ক্লোরোফিল "a" থাকে না |
| ৫ | ১৩ | এ সাধারণ | এরা সাধারণ |
| ৮ | ২১ | করোকক্কালেস বা | করোকক্কালেসরা |
| ৮ | ২৩ | ট্রাইকোষ | ট্রাইকোম |
| ৯ | ১৩ | অনেকে এখনও | অনেকে এখন |
| ১০ | ১৫ | শৈবাল কথা | শৈবাল কথাটা |
| ১১ | ১৯ | ক্যারোটি | ক্যারোটিন |
| ১২ | ১ | ইউগ্নিসা | ইউগ্লিনা |
| ১২ | ১১ | সাধারণত সামুদ্রিক | সাধারণত সামুদ্রিক |
| ১২ | ১২ | গনিউলাস | গনিউল্যাক্স (Goniaulax) |
| ১৪ | ৮ | প্যান ব্যাকটিরিয়াম | পেচানো ব্যাকটিরিয়াম |
| ২৭ | ১০ | থ্রেয়োনাইন | থ্রেয়োনাইন |
| ২৭ | ১৫ | থ্রেয়োমাইন ও লিউসিস | থ্রেয়োনাইন ও লিউসিন |
| ৩০ | ২০ | জীবাণু ধারক | জীবাণুবারক |
| ৩৮ | ১৪ | ১৯৪ ডিগ্রী | মাইনাস ১৯৪ ডিগ্রী |
| ৪৮ | ১৩ | ধারা-প্রভাব। | ধারা-প্রবাহ। |
| ৪৮ | ১৫ | বিকশিত | বিকীর্ণ |
| ৪৮ | ৩০ | লিখবার | শিখবার |
| ৮১ | ৬ | (৮০০০ ক্যালোরি) | (—৮০০০ ক্যালোরি) |

| পৃষ্ঠা | লাইন | আছে | হবে |
|---|---|---|---|
| ৯৪ | ১ | অ্যাডিমাইন (Ademine) | অ্যাডিনাইন (Adenine) |
| ৯৫ | ২৪ | জীবন | জীন |
| ১০০ | ২০ | করতে পারে। | করতে পারে না। |
| ১০৫ | ৯ | করা হয়। | করা হয় |
| ১০৭ | ৩ | রোগও | বাদ যাবে |
| ১০৭ | ২৪ | অথবা | তখন |
| ১০৭ | ২৪ | আবরণ | আচরণ |
| ১১১ | ২৬ | হাইতে | হাইতি |
| ১৪০ | ৫ | একটিক | একাধিক |
| ১৪০ | ৬ | স্টেরিন মেটা | স্টেরিগমেটা |
| ১৫২ | ২ | অত বিপদ জনক | অ-বিপজ্জনক |